তিন পুরুষ

তিন পুরুষ

সমরেশ বসু

৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট । কলকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ আগস্ট ১৯৬২

প্রকাশক

প্রদীপ বসু

বুকমার্ক

৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট

কলকাতা ৭০০ ০৭৩

মুদ্রক

নবদ্বীপ বসাক

পাবলিসিটি কনসার্ন

৩ মধু গুপ্ত লেন

কলকাতা-৭০০ ০১২

প্রচ্ছদ

গৌতম বসু

তিন পুরুষ

ঘরের এক কোণে ছোট টুলের ওপর রাখা টেলিফোনটা বেজে উঠলো। টেলিফোনেব পাশে গদি-আঁটা বেতের মোড়া।

সুদীপ আর জয়তী, পরস্পরের মুখের দিকে তাকালো। দু'জনের চোখেই জিজ্ঞাসা। সুদীপের ভুরু কুঁচকে উঠেছে। বিরক্তি না। ওটাও জিজ্ঞাসারই একটা অভিব্যক্তি। বসেছিল একটা বেতের চেয়ারে। বুক খোলা সবুজ আধা হাত খাদির পাঞ্জাবি গায়ে। পরনে সাদা খদ্দরের পাজামা। কোলের ওপর কাঠের বোর্ড। বোর্ডে পিন্ দিয়ে গাঁথা হাতে তৈরি আঁকার কাগজ। ডান হাতে পেন্সিল। বাঁ হাতের দু' আঙুলের ফাঁকে ভাজা তামাকের ফিলটার লাগানো কমদামী জ্বলন্ত সিগারেট। কাগজের বুকে আপাতত যে-কটি রেখার দাগ পড়েছে, তার মধ্যে অস্পষ্ট একটি নারীর অবয়ব। জয়তীর, নিঃসন্দেহে। জয়তী কয়েক হাত দূরে, একটা পুরনো সোফায় বসে আছে। সুদীপের মুখোমুখি। পিছনে বেশ একটু এলিয়ে দেওয়া শরীরে অলস ভঙ্গি। ডান হাত তুলে ছড়িয়ে দিয়েছে সোফার পিঠে। মাথার চুল খোলা। কিন্তু শাড়ি যথেষ্ট বিন্যস্ত। পেন্সিলের রেখায় অস্পষ্ট অবয়বটির বুকে মাত্র দুটি বিপরীতমুখী বাঁকা রেখায়, রমণীর পরিচয় ভারি স্পষ্ট। জয়তীর চোখের দিকে তাকিয়ে, সুদীপের ঘাড় ঝাঁকানিতেও জিজ্ঞাসারই অভিব্যক্তি। জয়তী ভুরু কুঁচকে নিচের ঠোঁট ওল্টালো। অল্প একটু মাথাও নাড়লো।

টেলিফোন বেজে চলেছে। সুদীপের বাঁ দিকে একটা মাঝারি মাপের গোল টেবিল। পুরনো, কিন্তু সেগুন কাঠের তৈরি। শক্ত আর মজবুত। ও বোর্ড আর পেন্সিল টেবিলের ওপর রাখলো। সিগারেটে একটা টান দিতে গিয়ে, কবজির ঘড়ির দিকে দেখলো। সকাল প্রায় সাড়ে দশটা। টেবিলের ওপরেই ছাইদানি। সিগারেটে আর একটা টান দিয়ে, ছাইদানিতে গুঁজে দিল। বেতের চেয়ার ছেড়ে উঠে, টেলিফোনের দিকে এগিয়ে গেল। কয়েক পা এগোতেই, টেলিফোন আচমকা নীরব হয়ে গেল। সুদীপ থম্‌কে দাঁড়ালো। ঘাড় ফিরিয়ে অবাক জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো জয়তীর দিকে।

জয়তী হাসলো, "দেরি করছিলে। ছেড়ে দিয়েছে।"

"কত দেরি করেছি ?" সুদীপ বাঁ হাত তুলে আবার ঘড়ি দেখলো। ভরাট গলার স্বর বিব্রত, "তিরিশ সেকেণ্ডের বেশি দেরি করি নি। তা ছাড়া আজ তো রোববাব !"

জয়তী সোফার পিঠ থেকে ডান হাত নামালো। মুখে হাসি থাকলেও, চোখে অবাক জিজ্ঞাসা, "তো ?"

"রোববারে এত অধৈর্য হলে হয় ? ছুটির দিন না ?" সুদীপ নিজেকেই যেন কৈফিয়ৎ দিল। ফিরে গিয়ে বসলো নিজের চেয়ারে, "একটু ধরবে তো ?"

জয়তী খিলখিল শব্দে হেসে উঠলো। হাসতে গিয়েই সামনে একটু ঝুঁকে এলো। বুকের আঁচল সরে গেল বাঁযে। হাসির তবঙ্গ শরীর ভরে।

"ভুল বললাম নাকি কিছু ?" সুদীপ জয়তীর দিকে বিব্রত চোখে তাকিয়ে টেবিল থেকে সিগারেটেব প্যাকেট আর লাইটার তুলে নিল। "তুমি ভালোই জানো, সময় নিয়ে আমার খুবই মাথাব্যথা থাকে। রোববাবের সকালেও আমার হাতে ঘড়ি। অন্য কোনো কারণে নয়। অভ্যেস। সময় আমার কাছে খুব মূল্যবান। তবু আজ রোববার। একটু সবুর সইলো না ?"

জয়তীর হাসির উচ্ছ্বাস থেমে এলেও, সারা মুখে আর চোখে তা স্ফুরিত। সুদীপের বিব্রত চোখের দিকে তাকিয়ে বললো, "লোকটার খেয়াল থাকা উচিত ছিল, আজ রোববার। আজ ছুটি। আজ কোনো কারণেই বেশি তাড়াহুড়ো করতে নেই। মিনিমাম এক মিনিট তো অপেক্ষা করা উচিত ছিলই।"

সুদীপ ঘাড় ঝাঁকিয়ে কিছু বলতে গিয়ে থমকালো। সন্দিগ্ধ চোখে তাকালো জয়তীর চোখের দিকে। জয়তী দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট চেপে ধবলো। চোখ সরিয়ে নিল সুদীপের চোখ থেকে। সুদীপ তৎক্ষণাৎ ওর ভবাট গম্ভীর স্বরে অট্টহাস্যে ফেটে পড়লো। জয়তীর ভিতরে হাসির উচ্ছ্বাসটা দাঁতের দংশনে রুদ্ধ ছিল। সুদীপের অট্টহাসি সেই রুদ্ধ দবজাটা খুলে দিল। দু'জনের হাসি একটা সুরের তরঙ্গে বেজে উঠলো।

মাথার ওপরে ঘুরছে বিজলী পাখা। দক্ষিণের বড় দুটো জানালা দিয়েও হাওয়া আসছে। জানালার বাইবে বড় কৃষ্ণচূড়া গাছে, এই জ্যৈষ্ঠেও নতুন পাতার ফাঁকে ফাঁকে আগুনের ফুলকি। বাইরে অনেকক্ষণ থেকেই দোয়েল দম্পতীর ডাক—সাড়া শোনা যাচ্ছিল। ঘরের ভিতরের দ্বৈত হাসির শব্দেই যেন ওরা নির্বাক উৎকর্ণ হল।

"মুন্না, আমি ঠিক তা বলতে চাইনি।" সুদীপের হাসির বেগটা থেমে এলো। কথার স্বরে এখনও একটা কৈফিয়তের সুর, "আমি আসলে বলতে চেয়েছিলাম—"

জয়তী বাঁ হাতটা তুললো। ঘাড় ঝাঁকালো, "জানি। তুমি বলতে চাইছিলে, ছুটির দিনেও, কাজের দিনের মতো এত তাড়া কেন ? ভুল কিছু বলো নি।"

"তবু তুমি এমন হাসলে, আর এমন কথা বললে, যেন আমি একটা পাগল ছাড়া কিছু নই।" সুদীপ জয়তীর চোখে চোখ রেখে, ঠোঁটে সিগারেট চেপে ধরলো। ওর টেপা ঠোঁটে হাসিও লেগে আছে।

জয়তীরও ঠোঁটে চোখে হাসির ঝিলিক, "আমি সে জন্যে হাসি নি। আসলে, তুমি যা বলছিলে, তুমি নিজেই তা মেনে নিতে পারছিলে না। যতোই বলো না কেন, ছুটির দিনে তাড়াহুড়ো থাকা উচিত নয়, তবু টেলিফোনটা ধরতে না পেরে তোমার অস্বস্তিই হচ্ছিল। হচ্ছিল না ?"

"হুঁ।" সুদীপের দুচোখে হাসির দ্যুতি উজ্জ্বলতর হল। ঘাড় ঝাঁকিয়ে লাইটার জ্বেলে সিগারেট ধরালো, "মুন্না, তুমি আমাকে ভালোই জানো। সত্যি আমার অস্বস্তি হচ্ছিল। টেলিফোনটা আরও তাড়াতাড়ি ধরা উচিত ছিল। মনে হচ্ছিল, আমি অন্যায় করেছি।"

জয়তী মাথা নাড়লো, "অন্যায় কিছু করো নি। তোমার নীতিবোধটা বড় বেশি—কী বলবো ? বড় বেশি সেনসেটিভ্। আজ ছুটির দিন। নিশ্চয়ই তোমার অফিস থেকে টেলিফোনটা আসে নি। অবিশ্যি তোমার কাছে অনেকের অনেক দরকার থাকে। থাকলেও, সে-সব লোকের তো বোঝা উচিত, আজ রোববার। আজকের দিনটা রেহাই দেওয়া উচিত। আর নয় তো তোমার কোনো বন্ধুবান্ধব টেলিফোন করতে পারে। কিন্তু তারা ভালোই জানে, যতো বড় বাড়িই হোক, আর যতো লোকই বাড়িতে থাকুক, তুমি বলতে গেলে একলা মানুষ। তুমি বাথরুমে যেতে পারতে। বাইরে যেতে পারতে। দোতলায় এখন বোধহয় কেউ নেই। একতলা থেকে টেলিফোনের শব্দ শুনে কেউ যদি এসে ধরতো, তারও সময় লাগতো। সেটা বুঝেই হয়তো লাইনটা কেটে দিয়েছে। আর তুমি তো খুব একটা দেরি করো নি। তবু তোমার এত অস্বস্তি অন্যায়বোধ কেন ?"

"যাই হোক, টেলিফোনটা আমি আর একটু তাড়াতাড়ি ধরতে পারতাম।" সুদীপ সিগারেটে টান দিল, "বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে, জিতু একটু ভয় দেখিয়ে রেখেছে, ও বেলা বারোটা সাড়ে বারোটায় আসবে, দুপুরে আমার সঙ্গে খাবে। যতোক্ষণ ইচ্ছে জিরোবে। ও টেলিফোন করেনি। বন্ধুরা করে থাকলে আমাকে ক্ষমা করে দেবে। অবিশ্যি জানোই, আমার বন্ধুবান্ধব খুবই কম। তবে রোববারেও আমাকে কেউ কেউ টেলিফোন করে। খুব দরকারে পড়েই করে।" ও সিগারেটে টান দিয়ে, টেবিল থেকে পেন্সিল আর বোর্ডটা টেনে নিল। জয়তীকে দেখলো আপাদমস্তক, "তোমার বসার ভঙ্গিটা একদম বদলে গেছে।

শাড়িও আগের মতো নেই। এমন কি, চুলও কপাল আর গালের খানিকটা ঢেকে ফেলেছে।”

জয়তী ঘাড়ে ঝাঁকুনি দিল। খোলা চুলের গোছা কপাল আর গাল থেকে সরে গেল। একটু নাক কোঁচকালো, ঠোঁট বাঁকালো। বললো, “ওটা আর আঁকতে হবে না। যা আঁকতে বললাম তা আঁকলে না। তুমি মুখে খুব লিবারল, আসলে পিউরিটান।”

সুদীপ হাসলো। জয়তীর দিকে তাকিয়ে সিগারেটে টান দিল। লাল পাড় আর কোরা রঙ শাড়ির সঙ্গে, দু ইঞ্চি চওড়া হাতার লাল জামা ওর গায়ে। কালো ওকে বলা যায় না। কালোর চেয়ে কয়েক পোঁছ মাজা। সুদীপের চোখে, অনেকটা কচি আম পাতার মতো। মাথা ভরতি কালো চুল। পিঠময় ছড়ানো। কপাল ঈষৎ চওড়া। স্বাভাবিক সরু ভুরু। সরু চোখা নাক। আয়ত কালো চোখ। পুষ্ট ঠোঁট। মুখের গড়ন—চলতি কথায় যাকে বলে পান পাতার মতো। অর্থাৎ লম্বা না। কিন্তু ও লম্বায় প্রায় সাড়ে পাঁচ ফুট। সুগঠিত স্বাস্থ্যোজ্জ্বল একহারা শরীরে কেমন একটা অনম্রতা প্রথমেই চোখে পড়ে। অথচ ওর মুখে একটা শান্ত শ্রী আছে। বয়স সাতাশ-আটাশের কম না। দু'হাতে এক গুচ্ছ লাল বেলোয়ারি চুড়ি। আর কোনো অলঙ্কার নেই ওর শরীরে। নেই কোনো প্রসাধনের চিহ্ন। সুদীপ বললো, “লিবারল কি না জানিনে। তবে পিউরিটান আমি নই, তুমি।”

“আমি পিউরিটান?” জয়তী ফোঁস করে উঠলেও, ওর মুখে লজ্জার ছটা ফুটলো। তবু বললো, “আমি সবই বিসর্জন দিতে চেয়েছিলাম।”

সুদীপ হেসে সিগারেটে টান দিল, “তা চেয়েছিলে। কিন্তু আমার দিকে সামনে ফিরে থাকতে চাওনি। পেছন ফিরে বসতে চেয়েছিলে। অথবা পেছন ফিরেই কাত হয়ে শুতে চেয়েছিলে।”

“তা কী করবো। আমার লজ্জা করে না বুঝি?” জয়তী সুদীপের চোখের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বললো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চোখে চোখ রাখতে পারলো না। লজ্জার ভারে মুখ নত হল।

সুদীপ হাসলো। হাসির উচ্ছ্বাসটা ওর প্রায় অট্টহাস্যে ফেটে পড়তে যাচ্ছিল। কিন্তু নিজেকে ও দমন করলো। জোরে হেসে উঠলে, জয়তী আরও লজ্জা পেতো। বরং ওর ফর্সা মুখে আর চোখে ফুটলো মুগ্ধতা। সেই সঙ্গে আবেগও। কার্যত ওদের কথার মধ্যে কোনো বাস্তবতা ছিল না। সুদীপ নিজেকে শিল্পী বলে দাবী করে না। কোনো শিল্প শিক্ষালয়ে শিক্ষালাভ করেনি। গুরু ধরে নি। অবকাশের সময়ে ওটা ওর ভালো লাগার বিষয়। ভালো লাগাটা সময় কাটানোর

যেমন খুশি হিজিবিজি কাটা না। আঁকার সঙ্গে ওর ভিতরের একটা যোগ আছে। যে-যোগের সঙ্গে আছে প্রেমের ভাব। কিন্তু সেটা ওর এমনই একান্ত, যেখানে ঢোকবার দবজাটা অন্যের পক্ষে খুঁজে পাওয়া কঠিন। সেখানে আত্মপ্রকাশেব অনিচ্ছা গভীর। অথচ জয়তীর কাছে প্রকাশমান হওয়াটাই হয়ে ওঠে দুজনের কাছে দুজনের নিবিড়তর সঙ্গ লাভ। আর নগ্ন চিত্র চর্চা? কার্যত ওটা সত্যি অবাস্তব। জয়তীব ওটা একটা রমণী রহস্যের ছলনা। সুদীপেব কাছে শরীরের সকল আবরণ বিসর্জন দিতে ওর ভিতরের কোনো বাধা নেই। কিন্তু আঁকার ক্ষেত্রে ওর রমণীর লজ্জাটা মিথ্যা না। কথাটা যে ও কতবাব বলেছে, আর সুদীপ যে কতবার সম্মত হয়েছে—অথচ দুজনেই জানতো, বাস্তবে ওটা ঘটবে না। সেই জন্যই জয়তী কখনও কখনও সুদীপকে বিপাকে ফেলতে গিয়ে, কিছু আবরণ, কিছু নিরাবরণের প্রস্তাব দিয়েছে। জেনে শুনে, যে সুদীপ অবাধ্য ঘোড়ার মতো ঘাড় বাঁকিয়ে বসবে। এমন কি, আবরণেব ক্ষেত্রেও, বুকের আঁচল অবিন্যস্ত একপেশে হয়ে থাকবে, সেটাও মেনে নিতে পারে না।

"একস্ট্রিমিস্ট!" কথাটা বলার সময়ে জয়তীর স্বরে থাকে কপট অভিযোগের সুর, "হয় পুরোপুরি ছাড়ো, নয় তো আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকো।"

জয়তীর অভিযোগেব কাপট্য সুদীপের অজানা থাকে না। ও হেসে বলে, "শিল্প আর প্রেমের ক্ষেত্রে ওটা একস্ট্রিমিস্টেব কথা নয়। ওটাই খাঁটি কথা। খোলা বন্ধ, যেটাই হোক, দুটোরই মর্যাদা তোমাকে দিতে হবে। খুব বড় কথা বলে কোনো লাভ নেই মুন্না। আমাদের চল্‌তি প্রবাদ কথাতেই অনেক বড় কথা আছে। নাচতে নেমে ঘোমটা টানার কোনো মানে হয় না। আর ঘোমটার আড়ালে খ্যাম্‌টা নাচ, সেও ভারি বিচ্ছিরি। তোমাদেব—তোমার কাছেও আমি কখনও একজন বুর্জোয়া ভাববাদী, অথবা কখনও একস্ট্রিমিস্ট। কিন্তু আমাদের চলতি কথাগুলো এমনই সত্যি, তোমার তত্ত্বেও ওটা নির্ভেজাল। তাই নয়?"

"আমি এত তত্ত্ব-টত্ত্ব বুঝিনে।" জয়তীর এটা অকপট স্বীকারোক্তি, "সাম্যবাদ, শ্রেণীসংগ্রাম আর বিপ্লব, ওসবে আমার বিশ্বাস অবিচল। আমার বিশ্বাস, তোমারও তাই। তোমার মুশকিল হল, তুমি নিজেকে একেবারে সঁপে দিতে পারো না। বেশি নীতিবোধ আব জিজ্ঞাসা ভালো নয়। ওগুলো বিশ্বাসকে নষ্ট করে, বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বিপ্লবের শত্রুরা প্রশ্রয় পায়।"

সুদীপ হাত জোড় করে প্রায় আর্ত স্বরে বলে, "দোহাই মুন্না, অমন ভয়ংকর কথা বলো না। ভয়ে আমার বুক কেঁপে ওঠে। তত্ত্ব-টত্ত্ব না বোঝ, সত্যিটাকে বুঝতে চেষ্টা কর। তোমার অবিকল বিশ্বাসটা গলার জোর নয়, ধর্মান্ধতাও নয়। এমন কি ওটা শুধু দলের কথাও নয়। এটাই তোমার সত্যধর্ম। আর সত্যধর্ম যে

কী, আমার চেয়ে তুমি কিছু কম জানো না।"

"তোমাকে এত ভয় পেতে হবে না।" জয়তী হেসে অভয় দান করে, "তোমাকে আমি একটুও বুঝিনে, তা নয়। তোমার সঙ্গে ওসব নিয়ে আমার তর্ক করতে ইচ্ছে করে না। তর্ক জিনিসটাই আমার ভালো লাগে না। তার চেয়ে, আমাদের চল্‌তি প্রবাদের কথা যা বললে, আমি মাথা পেতে মেনে নিচ্ছি। ওটা বুঝতে তত্ত্বেব দরকার হয না। তত্ত্বের কথা কিন্তু তুমি বলেছো।"

জয়তীর তত্ত্ব আর বিশ্বাসের কথা যখন ওঠে, সুদীপের মন তখন একটা অশুভ নৈরাশ্যে ডুবে যায়। একটা কষ্ট আর ক্ষোভ, যুগপৎ মনকে অস্থির করে তোলে। যে শক্তিস্বরূপিণীর কাছে ও নিজেকে সঁপে দিয়েছে, তার ভিতরে অনুসন্ধিৎসু জিজ্ঞাসা থাকবে না, তা কেমন করে হয়। সংহারের স্বরূপ যদি সে না বোঝে, তার কল্যাণীরূপ প্রকাশ পাবে কেমন করে। এই জিজ্ঞাসার ভিতরেই ও জবাব খুঁজে পায়। সে-জবাবটা হল, জয়তীর শক্তির ওপর ওর বিশ্বাস।

সুদীপ সিগারেটে শেষ টান দিয়ে, অবশিষ্ট গুঁজে দিল ছাইদানিতে। জয়তী লজ্জায় তখনও মুখ তুলতে পারছিল না। সুদীপের চোখে তখনও মুগ্ধতা। গলার স্বরের খুশিতে কোনো চটুলতা নেই। হেসে বললো, "তা হলে যেটা হচ্ছিল, সেটাই হোক।"

"এরকম তো অনেক করলে।" জয়তী ওর লজ্জা কাটিয়ে, স্বাভাবিক হাসলো, "রঙে স্কেচে এঁকে এঁকে ড্রয়াব ভর্তি করে ফেললে। কী হয় ওতে ?"

সুদীপ জয়তীর চোখে চোখ বেখে হাসলো, "সেটাই তো কারোকে কোনোদিন বোঝাতে পারলাম না। এমন কি তোমাকেও না।"

"আমি তোমার মতো করে বুঝতে পারি নে।" জয়তী সুদীপের চোখ থেকে নিজেব চোখ সরিয়ে নিল, "কিন্তু আঁকার সময় তোমার তন্ময় মুখের দিকে তাকিয়ে, কোথায় যে ডুবে যাই, তাও বুঝতে পারি নে।"

সুদীপ কোনো জবাব দিতে পাবলো না। ওর চোখে আবার মুগ্ধতা নেমে এলো। জয়তী চোখ তুলে তাকালো পর্দা ঢাকা খোলা দরজার দিকে। তারপর এগিয়ে গেল জয়তীর সোফার কাছে। দাঁড়ালো একেবারে জয়তীর সামনে, প্রায় স্পর্শের সান্নিধ্যে। জয়তী মুখ তুললো। নিজে থেকেই বাঁ হাতটা তুলে দিল সুদীপের দিকে। টেলিফোনটা বেজে উঠলো।

"এবার আব ফস্‌কাতে দিও না।" জয়তী তুলে দেওয়া হাত দিয়ে সুদীপকে কোমরে হাত দিয়ে ঠেলে দিল।

সুদীপ হেসে এগিয়ে গেল টেলিফোনের দিকে, "দেখা যাক, কে।"

বড় ঘরটার প্রায় এক প্রান্তে, নিচু ছোট টুলের ওপর টেলিফোন। একাধিক

টেবিল, সোফা, বেতের গার্ডেন চেয়ার, কিছু সবুজ পাতার টব, কাঠিব মাদুব আব বিস্তর কাগজপত্র বই ছড়ানো ঘর ভবে। সুদীপ সাবধানে সব ডিঙিয়ে গিয়ে, নি-? হয়ে রিসিভাবটা তুলে নিল. "হ্যালো !"

"ছুবু, আমি বলছি।" ওপাব থেকে পুরুষের গম্ভীর স্বব শোনা গেল। সুদীপ স্বরটা শোনা মাত্রই অবাক হল। জিজ্ঞেস করলো, "তুমি ? একতলায তোমাব টেলিফোন থেকে বলছো ? নাকি— ?"

"হ্যাঁ, একতলা থেকেই বলছি।" ওপারের গম্ভীর স্বরে যেন ঈষৎ কৌতুকের ছটা, "আজ এবেলা বাইরে আব কোথায যাবো ? সকাল থেকে তো ভিড লেগেই ছিল। এখনও আছে। তবে এখনও যারা আছে, তারা বেলা দেড়টা দুটোর আগে কেউ উঠবে না। তোব সঙ্গে একটু কথা ছিল।"

সুদীপেব ভুরু কুঁচকে উঠলো. "আমাব সঙ্গে ?"

"কেন, তোর সঙ্গে আমার কোনো কথা থাকতে নেই ?" ওপারেব গম্ভীর স্বরে হাসির আভাস স্পষ্ট বোঝা গেল।

সুদীপ দাঁড়িয়েই কথা বলছিল। মুখ ফিরিয়ে একবার জয়তীব উৎসুক ভ্রূকুটি জিজ্ঞাসু মুখের দিকে দেখলো। হেসে বললো. "আমি তো মনে করি থাকা উচিত। তোমাব বলতে ইচ্ছে করলে, আমারও বলতে ইচ্ছে কবে। আগ্রহটা বোধহয় আমারই বেশি। কিন্তু তোমাব ইচ্ছে আগ্রহ তেমন দেখিনে বলেই—সে যাক গে। তুমি তো পাবতপক্ষে আমার সঙ্গে কথা বল না। তাই একটু অবাক হলাম। অবিশ্যি আমার সঙ্গে তোমার কথা আছে শুনে ভালোও লাগছে।"

"আমি এর আগে একবাব টেলিফোন করেছিলাম।" ওপাবের স্বর শোনা গেল, "মিনিট কুড়ি কিংবা আধ ঘণ্টা আগে হবে।"

সুদীপের মুখে ভ্রূকুটি বিস্ময়, "আগের টেলিফোনটা তুমি করেছিলে ? আমার মনটা খাবাপ হয়ে গেছলো। আমি একটু দেরি করে ফেলেছিলাম। টেলিফোনের কাছে পৌঁছুবার আগেই লাইন কেটে গেছিলো।"

"আমিই কেটে দিয়েছিলাম।" ওপাবের গম্ভীব স্বরে আবার একটু হাসির স্পষ্ট আভাস পাওয়া গেল, "হয়তো আরও একটু সময় ধরে রাখতাম। বুবু বললো, তোর ঘরে সেই মেয়েটা রয়েছে। তাই—।"

সুদীপ বাধা দিয়ে বলে উঠলো, "সেই মেয়েটা মানে কী ? সে তো তোমাদের দলেরই মহিলা ফ্রন্টের একজন জঙ্গী কর্মী। সমিতির জেলা কমিটির সভ্য। আগামী অ্যাসেম্বলির উপনির্বাচনে ওকে তোমরা প্রার্থী মনোনীত করার কথা ভাবছো—।"

"আহা, ছুবু, এত কথা বলছিস কেন ?" ওপারের গম্ভীর স্বরে সুর কিঞ্চিৎ

বিব্রত, "আমি তো খারাপ কথা কিছু বলি নি। নামটা মনে আসছিল না বলে, মেয়েটা বলেছি।"

সুদীপ ওপারের কথা শুনতে শুনতে জয়তীর মুখেব দিকে তাকিয়েছিল। ওর মুখে বিষণ্ণ হাসি। জয়তীর মুখেও হাসি, কিছুটা কুণ্ঠিত, লজ্জিত। ও বাঁ হাত নেড়ে, ফিসফিস্ করে বলছিল, "ছেড়ে দাও না। প্লিজ্ আমাকে নিয়ে কোনো কথা বলতে হবে না।"

সুদীপ জয়তীর কথাগুলো স্পষ্ট শুনতে না পেলেও, ও কী বলছে, তা অনুমান করতে পারছিল। কার সঙ্গে টেলিফোনে কথা হচ্ছে, তাও জয়তী বুঝতে পারছে। সুদীপ ডান হাত তুলে, জয়তীকে আশ্বস্ত কবলো, "নামটা ভুলে যাওয়া উচিত কি না, সেটা তুমিই বিবেচনা কবে দেখো। আব নাম ভুলে গিয়ে, কী ভাবে তুমি 'সেই মেয়েটা'র কথা বলছিলে, একটু ভেবে দেখো। স্নেহ ভালবাসার কথা বলছি না। মেয়েটিকে করুণা করার কথা তো আসেই না। একটু যদি প্রীতিসূচক··· যাক গে। আমি জানি, জয়তীকে তুমি পছন্দ কর না। আগামী অ্যাসেমবলি উপনির্বাচনে ওব প্রার্থী মনোনযনেরও তুমি বিরোধিতা করেছো····"

জয়তীব ফিস্‌ফিস্ স্বর এবাব কিঞ্চিৎ উচ্চগ্রামে বেজে উঠলো, "ছুবু, প্লিজ্ প্লিজ্।"

সুদীপেব তখন আর যেন থামবার উপায় ছিল না, "অবিশ্যি ওব কম বয়সের যুক্তি দিয়েছো তুমি, এসব তোমাদের দলের ব্যাপার। দলের ব্যাপারে বাইরের লোকের নাক গলানো তোমরা পছন্দ কর না।"

"না, কবি না। ওপারেব গম্ভীর স্বব অপ্রসন্ন কঠোর ও শক্ত শোনালো, "আমরা মনে কবি যে আমাদেব দলেব নয়, আমাদের কাজের সমালোচনা করার কোনো অধিকাব তাব নেই।"

সুদীপ শব্দ করে হাসলো, "এটা ঠিক গণতন্ত্রসম্মত নীতি নয়, তাও তুমি জানো। এসব হল তোমাদের বিশেষ একটা সময়েব বীতিনীতি। যখন তোমরা সংসদীয় নীতিতে বিশ্বাসী ছিলে না। এখন আর সে-কথা খাটে না। এখন তোমরা সংসদীয় নীতিতে বিশ্বাস কর। বিরাট তোমাদের পার্টি, সরকার তোমাদের হাতে। সংবাদপত্রগুলো তোমাদের দলের আর সরকারের নানা কাজের সমালোচনা করে। সংসদীয় গণতন্ত্রের খাতিরে, তোমাদের তা মেনে নিতেও হয়। একটা কথা বলে ফেলেছি বলে রাগ করছো কেন?"

"রাগ করছি, মেয়েটির জন্য।" ওপারের স্বরে একটা জ্বালা ধরা ঝাঁজ, "ওর উচিত হয় নি, তোকে এসব কথা বলা।"

সুদীপ হেসে উঠলেও, ওর গলার স্বরে বিস্ময়, "সে কী! মাত্র তিন দিন আগে

এ বিষয়ে সংবাদপত্রে খবর বেরিয়ে গেছে, তুমি পড়ো নি ? ও বলতে যাবে কেন ? তুমি আমাকে আর যা-ই মনে কর, মিথ্যুক নিশ্চয়ই মনে কর না। কী ?"

"না, তা মনে করি না।" ওপার থেকে গম্ভীর স্বরে কিঞ্চিৎ প্রসন্নতার আভাস পাওয়া গেল। কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড দেরিতে জবাবটা এলো, "তুই মিথ্যুক নোস, তবে বড্ড অর্থহীন অবাস্তব আজেবাজে কথা বলিস। আমি বিশ্বাস করছি, জয়তী তোকে ও বিষয়ে কিছু বলে নি।"

সুদীপের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, "তোমার পা ছুঁয়ে বলছি, সত্যি কৃতজ্ঞ বোধ করছি তোমার কথায়। আর আমার অর্থহীন অবাস্তব কথাবার্তা ? সে তো গুরুই ভালো জানেন, শিষ্যের রোগটা কোথায় ?"

"গুরু-শিষ্য ?" ওপার থেকে প্রাণ-খোলা হাসি ভেসে এলো, "সত্যি কি আমাকে গুরু মানিস নাকি ?"

সুদীপ মাথা নেড়ে হাসলো, "তুমিই তো জন্মকাল থেকে আমার গুরু ছিলে। কিন্তু কপাল খারাপ, গুরু আমার বুকের আসন থেকে নেমে গেছেন।"

"ছুবু, আমি নেমে গেছি, না তুই নামিয়ে দিয়েছিস ?" ওপারের গম্ভীর স্বরে আবেগ আর বিষণ্ণতা ফুটে উঠলো।

সুদীপের হাসিও ম্লান হয়ে উঠলো, "এ জবাবটা সময়ের হাতে ছেড়ে দাও।"

এপার ওপার, উভয় দিক থেকেই টেলিফোন কয়েক মুহূর্ত নির্বাক হয়ে রইলো। সুদীপ জয়তীর সাগ্রহ জিজ্ঞাসু মুখের দিকে তাকাতে ভুলে গেল। কেমন একটা কষ্ট ওর বুকে বিঁধছে। অথচ ও জানে, যে প্রসঙ্গে কষ্ট ওর বুকে বিঁধছে, তার কোনো মূল্য নেই সেখানে।

"ছুবু!" টেলিফোনের ওপার থেকে গম্ভীর স্বর শোনা গেল।

সুদীপ চকিত হয়ে উঠলো, "হ্যাঁ বল।"

"বলছিলাম, তোর সঙ্গে একটু কথা ছিল।"

"এখনই বলবে ?"

"টেলিফোনে বলবো না।"

"আমি তো আজ সারাদিনই বাড়ি আছি। ও বেলা— ।"

"না, ওবেলা আমার একটা মিটিং আছে।" ওপারের গম্ভীর স্বরে ব্যস্ততার আভাস পাওয়া গেল, "তা ছাড়া, এখনও যারা বসে আছে, তাদের সঙ্গে আমার তেমন জরুরি কথা কিছু নেই। জরুরি কথাটা তোর সঙ্গেই। তোদের দুজনকেই হয়তো বিরক্ত করছি— ।"

সুদীপ চকিতে একবার জয়তীর দিকে দেখলো। মাথা নেড়ে বললো, "আদৌ

নয়। আমরা দুজনে নিতান্তই ছুটির সকাল কাটাচ্ছি। তুমি কি দোতলায় আমার ঘরে আসবে? না, আমি তোমার কাছে যাবো?"

"আমিই যাবো তোর কাছে। নিচে বসে কথা বলা যাবে না।"

"তা হলে চলে এসো।"

"তোরা কথা বল। আমি মিনিট পনরো পরে যাচ্ছি।"

"আচ্ছা।"

সুদীপের আগেই ওপারের রিসিভার নামিয়ে দেওয়া হল। ও রিসিভার নামিয়ে জয়তীর দিকে তাকালো। জয়তীর চোখে মুখে এখনও সাগ্রহ জিজ্ঞাসা। সুদীপ ঘরের মধ্যে নানা কিছু ছড়ানো ছিটানোর মাঝখান দিয়ে, সাবধানে এগিয়ে গেল। ওর শরীরের উচ্চতা জয়তীর থেকে দু-এক ইঞ্চি বেশি হতে পারে। ওর ফর্সা মুখে, অল্প ছাঁটা কালো গোঁফ দাড়ি। মাথার চুল মাঝারি লম্বা। চওড়া কপাল, ভুরু জোড়া সরুই বলতে হবে। ওর চোখ দুটো জয়তীর থেকেও যেন বড়, কালো আর দৃষ্টি গভীর। নাক টিকলো। কোমল ওর মুখ। হঠাৎ ওর চোখের দিকে তাকালে মনে হয় কী একটা গভীর চিন্তায় ডুবে আছে। অথচ হাসলে, মেঘের কোলে চকিত রোদের ছটার মতো কিরণ বিচ্ছুরিত হয়। শরীরের গঠন একটু চওড়া। কিন্তু মেদহীন। পঁয়ত্রিশ ছুঁয়েছে ওর বয়স।

"উনি কি এখুনি আসছেন?" জয়তীর স্বরে সাগ্রহে সম্ভ্রমপূর্ণ জিজ্ঞাসা। ও উঠে দাঁড়ালো, "আমি তা হলে এখন যাচ্ছি।"

সুদীপ জয়তীর সামনে এসে দাঁড়ালো। জয়তীর কাঁধে বাঁ হাত রাখলো, "দশ মিনিট বসো। উনি মিনিট পনরো পরে আসবেন। কিন্তু---সত্যি, চিন্তিত হয়ে পড়ছি। আমার সঙ্গে তো আজকাল প্রায় কথাই বলেন না।"

"কোনো পত্র-পত্রিকায় আমাদের সরকার বা পার্টির সম্পর্কে ইদানীং কিছু লেখো নি তো?" জয়তীর জিজ্ঞাসায় উদ্বেগের সুর।

সুদীপ মাথা নাড়লো, "না। লিখেছি, কিন্তু ছাপতে দিই নি।"

"বাঁচা গেল।" জয়তী স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো। তাকালো সুদীপের চোখের দিকে। দৃষ্টিতে অস্বস্তি, "ছুবু, তোমাকে কতদিন বলেছি, উনি আমাকে যা-ই বলুন, তুমি প্রতিবাদ করতে যেও না। তোমার ভাই বুবু তো কোনোরকম প্রতিবাদ করে না?"

সুদীপ গম্ভীর হল, "যা-ই বলুন, মানে কী মুন্না? বুবু কেন প্রতিবাদ করে না, আমি জানি না। অবিশ্যি উনি সব জায়গায় সকলের সামনে, তোমার সম্পর্কে অবহেলা বা অসম্মানসূচক কিছু বলেন না। বলবার উপায় নেই বলেই বলেন না। কারণ, উনি ভালোই জানেন, পার্টির নেতৃত্বের একটা বড় অংশ তোমাকে

সমর্থন করে। কিছুটা হয়তো তাচ্ছিল্যের ভাব দেখান, কিন্তু সম্মান দিয়েই কথা বলতে হয়। অথচ আমি তো বুঝি, তুমি ওঁদের পার্টির যতো বড় নেত্রীই হও, উনি তোমাকে মন থেকে মেনে নিতে পারেন না। আসলে নিজেও জানেন না, উনি মনে মনে কী অসম্ভব রক্ষণশীল।"

"রক্ষণশীল?" জয়তীর অবাক ও অস্বস্তিকর জিজ্ঞাসা।

সুদীপ হেসে ঘাড় ঝাঁকালো, "হ্যাঁ মুন্না। উনি খুবই রক্ষণশীল। অন্তত এটা মানবে তোমাদের এই বিরাট নেতাকে, অনেকের থেকে অনেকটা বেশি জানবার বোঝবার সুযোগ আমার হয়েছে। তোমার ব্যাপারেই ওঁর রক্ষণশীলতা কেন বেশি জেগে ওঠে, তাও বুঝি। বুবুর কথা বলছিলে? উনি সে-বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন। তোমার সম্পর্কে বুবুর মনোভাব কী, তা উনি খুব ভালো জানেন। বুবুর সামনে তিনি আগে যদি বা তোমার বিষয়ে অবহেলার ভাব দেখাতেন, এখন একেবারেই তা করেন না। সম্ভবত তোমার বিষয়ে একমাত্র আমার আর আমার মায়ের সামনেই উনি ওরকম অশ্রদ্ধা আর অবহেলার ভাব দেখান। যেমন তোমার সম্পর্কে উনি হাসতে হাসতে আমাকে বলেন, মেয়েটা চম্বলের ডাকাত হতে পারতো।"

"চম্বলের মেয়ে ডাকাত!" জয়তী খিলখিল করে হেসে উঠলো, "পুতলিবাঈ, না ফুলনদেবী?"

সুদীপ বিষণ্ণ হাসলো, "মুন্না, তুমি হাসছো? উনি যখন ওরকম বলেন, আমি হাসতে পারি নে। তোমার যন্ত্রণা, তোমার কষ্ট অনুভব করার শক্তি ওঁর নেই।"

"ছুবু!" জয়তী সুদীপের ডান হাতটা টেনে, নিজের গালে চেপে ধরলো, "যাক। এসব কথা থাক।"

সুদীপ একটা নিঃশ্বাস ফেললো, "হ্যাঁ, থাক। কিন্তু উনি যখন ওরকম হালকা চালে ঠাট্টা করে ওসব কথা বলেন, তখন ওঁর মনের কথা আমি পড়তে পারি। আমি পাল্টা না জিজ্ঞেস করে পারিনে, 'মুন্নার পার্টিতে আসাটাই কি তোমার কাছে চম্বলের ডাকাত হওয়ার সামিল?' উনি আমার কথায় আরও চটে যান। ভাবেন, আমি পার্টিকে অসম্মান করছি। চিৎকার করে ওঠেন, 'তুই কি পার্টির সঙ্গে ডাকাতদের আস্তানা চম্বল উপত্যকার তুলনা করছিস?' আমি শান্ত ভাবে জবাব দিই—না। মুন্নার নাম করে, সেই তুলনাটা তুমিই দিয়েছো। সেই সব ডাকাত মেয়ের জীবনেও নিশ্চয়ই অনেক দুর্দশা ছিল। কিন্তু মুন্নার সঙ্গে, ঠাট্টা করেও ও তুলনাটা দেওয়া উচিত নয়। ও বাংলা ভাষায় এম এ-তে অসাধারণ রেজাল্ট করেছে, সেটাই আমার কাছে বড় কথা নয়। তোমার কানে কথাটা ভালো ঠেকবে না হয়তো, তবু বলি, ও আমার কাছে সাক্ষাৎ শক্তিস্বরূপিণী।"

"ছুবু, চুপ কর।" জয়তী নিজের গালে চেপে ধরা সুদীপের হাতটাই ওর মুখে চেপে ধরলো।

সুদীপ তাকালো জয়তীর চোখের দিকে। মুহূর্তেই ওর চোখে সেই হাসির কিরণ ঝিলিক দিল, "হয়তো ভবিষ্যতে একদিন তোমার হাতেই আমাকে চিরকালের জন্য চুপ হতে হবে। শুধু সেদিন যেন মহাকালী সজ্ঞানে থাকে।"

"কথাটা এর আগেও কয়েকবার তোমার মুখে শুনেছি।" জয়তী এখন সুদীপের গায়ে সংলগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে, "তোমার সঙ্গে কোথাও কোথাও আমার ফারাক বিস্তর। দলের কাছে আমি লয়াল। আমার সেই লয়ালটি নিয়ে তোমার ভয়, কারণ সেখানে আমি অন্ধ। কিন্তু ছুবু, স্বার্থান্ধ নই। তুমি আমাকে আশীর্বাদ কর, আমি যেন সজ্ঞানে সব কিছু করতে পারি।"

জয়তী ওর খোলা চুল মাথাটা একবার সুদীপের বুকে রাখলো, তারপরেই মাথা তুলে, সুদীপের চোখের দিকে তাকালো। সুদীপও তাকিয়েছিল। ওর কালো বড় গভীর চোখে আবেগ-মুগ্ধ হাসি। জয়তীর হাত ধরে নিজেই এগিয়ে গেল খোলা দরজার দিকে। বারান্দার সিঁড়ির মুখের কাছে এসে, জয়তীকে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "একবারও তো বললে না ওঁর সঙ্গে আমার যা কথা হবে, তা যেন তোমাকে জানাই?"

"কোনো দিন কি আমাকে তেমন জিজ্ঞেস করতে শুনেছো?" জয়তী ঘাড় বাঁকিয়ে সুদীপের চোখের দিকে তাকালো।

সুদীপ হাসলো। ঘাড় নাড়লো, "না, মুন্না, কখনও শুনি নি। আমি জানি, ও-বোধটা তোমার আছে।"

"তবু তোমার আর ওঁর কথা!" জয়তী এক পা নিচের ধাপের সিঁড়িতে নামিয়ে দিল, "আমার মনটা এখনই ছটফট করতে আরম্ভ করেছে; তোমার কাছে এটা স্বীকার না করে পারছি না।"

সুদীপ হাসলো। কিছু বললো না। জয়তীর হাত ছেড়ে দিল। জয়তী সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। ও চোখের আড়ালে চলে যাবার পরে, সুদীপ ঘরে ফিরে এলো। বাঁ হাত তুলে কবজির ঘড়ি দেখলো। এগারোটা বেজে পঁচিশ মিনিট। ও ছোট গোল টেবিলে, আঁকার বোর্ডটা উল্টে রাখলো। রীতিমতো বড় ঘর। দক্ষিণ খোলা দোতলার এই বড় ঘরটিতে থাকতেন ওর পিতামহ। পুরনো সোফাগুলো, সবই তাঁর আমলের। প্রায় একশো বছরের অধিক পুরনো চা গাছের কাঠের ওপরে, গোল কাচের সেন্টার টেবিলও ছিল তাঁর। পশ্চিমের দেওয়াল ঘেঁষে উঁচু আর লম্বা স্টিলের বই ঠাসা র‍্যাক, কিছু বেতের গার্ডেন চেয়ার, গোটা দুই মোড়া, এসব সুদীপের। এ ঘরের টেলিফোনটাও ওর নিজস্ব।

অবিশ্যিই এক বিখ্যাত ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফার্মের বড় এক পদাধিকারীর নামে। বইয়ের দুটো আলমারিও ঠাকুর্দার। এ ঘরে ডিভানের পরিবর্তে, যে-সিঙ্গল খাটটি রয়েছে, ঠাকুর্দাই ওটি করিয়েছিলেন। ছুটির দিনে, দিনের বেলা, কখনও কখনও, ওই খাটে শুতেন। রাত্রে শুতেন, পাশের দক্ষিণ খোলা ছোট ঘরে। সেই ঘরের সংলগ্ন বাথরুম। ঠাকুর্দার পুরো অংশটাই সুদীপকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

এ ঘরে ইজেল আছে। রঙের পাত্র, তুলির আলাদা টেবিল রয়েছে। পুব ঘেঁষে, দক্ষিণের জানালার সামনে চিকন কাঠির মাদুরের ওপরে দুটি তাকিয়া, একটি পাশ বালিশ। পাশ বালিশটির ওপরেই কাপড়ের মোড়কে ঢাকা এস্রাজটি শোয়ানো। এসব সুদীপের। দেওয়ালের দুদিকে আছে চারটি ছবি। চারটি ছবিই ওর নিজের আঁকা। ফলে, যে-সব ব্যক্তিদের ছবি আঁকা হয়েছে, তাদের চেনা গেলেও অবিকল ফটোগ্রাফির ছাপ নেই। কিছুটা সুদীপের ধ্যান ও ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে। অবিশ্যি গান্ধীজীর একটি ছবি পিতামহর আমল থেকেই ছিল। সেটি ছিল একটি ফটো। সুদীপ এ ঘর থেকে একমাত্র সেটিই সরিয়ে দিয়েছে। তার বদলে সেখানে রেখেছে নিজের আঁকা গান্ধীজীর একটি ছবি। এছাড়া আছে রবীন্দ্রনাথ, টলস্টয় আর লেনিনের ছবি। বইয়ের র‍্যাকে এক জায়গায় বসানো আছে মোটা আর বেশ শক্ত বোর্ডের ওপর আঁকা রামকৃষ্ণদেবের একটি আবক্ষ রঙীন চিত্র। সমস্ত ঘরটার দিকে তাকালে, কোথাও ফরেন কোলাবোরেট এক বিখ্যাত ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফার্মের আই আর.ও-কে খুঁজে পাওয়া কঠিন। মাত্র পঁয়ত্রিশ বছরে যেটা প্রায় অসম্ভব ঘটনার পর্যায়ে পড়ে। অথচ এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেসন অফিসার, সুদীপ ব্যান্ডো বলে যার পরিচয়, পদটি অর্জন করেছে নিজের যোগ্যতা দিয়েই। এবং এ কথাও জানা, সুদীপ দ্রুত আরও ওপরে উঠবে। অথচ ফরেন কোলাবোরেট ভারতীয় ফার্মের কর্তারা সুদীপকে কোনোদিন স্যুটেড বুটেড সাহেব সাজাতে পারেনি। নরম গোঁফ দাড়ি থেকে ফর্সা রঙ মুখটা পারেনি মুক্ত করতে। জিনস্-এর কোমরে গোঁজা শার্টের বোতামও বন্ধ করাতে পারেনি, অন্তত গ্রীষ্মের সময়ে।

সুদীপ ওর সেই আগের চেয়ারটিতে বসলো। বাঁ পাশের টেবিল থেকে সিগারেটের প্যাকেট টেনে নিল।

"ছুবু।"

সুদীপ চকিত হয়ে ডান দিকে ফিরে তাকালো। জয়তী চলে যাবার পরে, অন্তত দশ মিনিট অতিক্রান্ত। ইতিমধ্যে ওর একটি সিগারেট টানা শেষ। ও অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। যে-কারণে, এবং যাঁর কারণে ও অন্যমনস্ক হয়ে

পড়েছিল, স্বয়ং সেই সৌরীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়িয়েছেন। ঠোঁট টিপে হাসছেন সুদীপের দিকে তাকিয়ে।

সুদীপ ঝটিতি উঠে দাঁড়ালো, "এসো। আমি তো তোমার জন্যই বসে আছি।"

"দু-চার মিনিট দেরি হয়ে গেল।" সৌরীন্দ্র বললেন, "হঠাৎ একদল নতুন লোক এসে পড়লো। বিরক্তিকর। যাই হোক, তবে ঘরে ঢুকে দেখলাম, তুই যেন একেবারে ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছিস। আমি এসেছি, খেয়ালই করিস নি। না ডাকলে বোধহয়, সহজে তোর পাত্তা পাওয়া যেতো না।"

সুদীপ হাসলো, "হ্যাঁ, একটু অন্যমনস্কই হয়ে পড়েছিলাম। বসো।"

"হ্যাঁ, বসি।" সৌরীন্দ্র ঘরের চারদিকে একবার মুখ ঘুরিয়ে দেখলেন। তাঁর দেখার অভিব্যক্তি থেকেই বোঝা যায়, এ ঘরের সব কিছু তাঁর নখদর্পণে নেই। দৃষ্টিতে অনুসন্ধিৎসা। ঠোঁটে টেপা হাসি। চারদিকে দেখতে দেখতেই জিজ্ঞেস করলেন, "ইয়ে মানে, সেই ইয়ে—জয়তী চলে গেছে?"

সুদীপ ঘাড় ঝাঁকিয়ে বিনীত হাসলো, "হ্যাঁ, ও চলে গেছে। তুমি কি আশা করছিলে, ও থাকবে?"

"থাকলেও ক্ষতি ছিল না।" সৌরীন্দ্রর দৃষ্টি দেওয়ালের ছবিগুলোর দিকে ঘুরছিল, "অবশ্যি ওর সামনে তোর সঙ্গে কাজের কথা বলা যেতো না। আচ্ছা, এ ছবিটা…।" তিনি কথা শেষ না করে, কয়েক সেকেন্ড লেনিনের ছবিটা দেখে, সুদীপের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন, "এ ছবিটা তোর ঘরে কেন? এঁর সঙ্গে তোর এখন আর কী সম্পর্ক?"

সুদীপ হাসলো। এ হাসিটা ওর স্বভাবসিদ্ধ। যে-হাসি থেকে মনের কথা যথার্থ নির্ণয় করা যায় না। বললো, "দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বসো।"

"হ্যাঁ, বসবো।" সৌরীন্দ্র এদিকে ওদিকে দেখলেন। সুদীপের বাঁ দিকে, ছোট গোল টেবিলের ওপাশে, বেতের আর একটা চেয়ারের দিকে এগিয়ে গেলেন।

বয়সের ভার অথবা মেদ, যেটাই হোক, সৌরীন্দ্রর শরীরে তার লক্ষণ স্পষ্ট। সুদীপের থেকে তিনি দীর্ঘকায়। দুটো মিলিয়ে, তাঁকে রীতিমতো লম্বা চওড়া দেখায়। তাঁকে কালোই বলতে হবে, কিন্তু বেশ উজ্জ্বল। গোঁফ দাড়ি কামানো মুখ চওড়া আর পুষ্ট। উঁচু নাক কিঞ্চিৎ মোটা। চশমার আড়ালে, দু চোখ কালো দীপ্র তীক্ষ্ণ। মাথার ঘন চুল যতোটা ধূসর, তার থেকে এখনও কালোর রাজত্বই যেন বেশি। এবং চুল খুব ছোট না। শাদা পাজামা পাঞ্জাবি তাঁর গায়ে। বয়স সত্তর হলেও, তিনি এখনও যথেষ্ট শক্তপোক্ত ঋজু চেহারার মানুষ। তাঁর হাসি কথা চলাফেরায় কোথাও বার্ধক্যের স্পর্শ লাগেনি। বেতের চেয়ারে বসে,

পাঞ্জাবির পকেট থেকে বের করলেন সিগারেটের প্যাকেট। দেশী সিগারেট, রাজা মাপের, সর্বাপেক্ষা দামী। ফিল্টার টিপড্ অবিশ্যিই। তারপরে বের করলেন দেশলাই। ঠোঁটে তাঁর সেই চেপা হাসি। বেতের চেয়ারে বসে সুদীপের দিকে তাকালেন, "তুই আমার প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলি।"

"কী জবাব দেবো বল?" সুদীপ চেয়ারে বসে, ঘাড় কাত করে তাকালো, "ছবিটা তুমি নতুন দেখছো না আমার ঘরে। যতোবার এ ঘরে এসেছো, ততোবারই দেখেছো, আর ওই কথাটাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করেছো। জবাব তোমাকে দিয়েছি। হয়তো তোমার তা মনঃপূত হয়নি, তাই ভুলে গেছ। অথবা আমাকে একটু খোঁচা দেবার জন্যই, জিজ্ঞেস না করে পারো না।"

সৌরীন্দ্রর চোখে অবাক ভ্রূকুটি জিজ্ঞাসা। এবং তা অকপট। বললেন, "এ সম্পর্কে তুই কিছু বলেছিস? আশ্চর্য, আমি কিছু মনে করতে পারছিনে। আমার স্মৃতিশক্তি এত দুর্বল, জানা ছিল না তো?"

"স্মৃতিশক্তি তোমার দুর্বল নয়।" সুদীপ হেসে মাথা নাড়লো। "সেইজন্যই ও-কথাটা বললাম, আমার কথা তোমার মনের মতো হয়নি বলেই হয়তো ভুলে গেছ। এরকম অনেকেরই হয়। আমারও হয়তো হয়। এটা মানসিক ব্যাধি, না দুর্বলতা, অথবা শক্তি, তা বলতে পারিনে। এমন অনেক কথা আছে, আমরা মনে রাখতে চাইনে। তাই ভুলে যাই।"

সৌরীন্দ্র প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে ঠোঁটে চাপলেন। দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে সিগারেট ধরালেন। জ্বলন্ত কাঠি গুঁজে দিলেন ছাইদানিতে, "তার মানে এ্যাম্নেসিয়া?"

"তাই কী?" সুদীপ দক্ষিণের খোলা জানালার দিকে তাকিয়ে যেন নিজেকেই জিজ্ঞেস করলো। কুঁচকে উঠলো ওর ভুরু জোড়া। দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে এলো আবার সৌরীন্দ্রর মুখের দিকে, "এ্যামনেসিয়া—মানে স্মৃতিভ্রংশ। না, আমি ঠিক তা বলতে চাইনি। আমার কথাটা আসলে, অবচেতনের। ভুলে যাওয়া নয়। ভুলে যেতে চাই বলেই, ভুলে যাওয়া। কিন্তু সে ভুলে যাওয়াটা সজ্ঞানে ঘটে না—মানে ইচ্ছাকৃত নয়। হয়তো এ্যামনেসিয়ার মতো, এরও কোনো ইংরেজি শব্দ আছে। আমি জানিনে।"

সৌরীন্দ্র এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে মাথা ঝাঁকালেন। হাসলেন, "বুঝেছি। এর কোনো ইংরেজি শব্দ যদি তোরই জানা না থাকে, আমার তো কথাই নেই। এসব হচ্ছে মনস্তত্ত্বের ব্যাপার। সাইকিয়াট্রিসটের অভিধানে খুঁজলে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু ব্যাপারটা বেশ মজার। মনে রাখতে চাইনে, অতএব ভুলে গেলাম। মিটে গেল ঝামেলা।" তিনি হাসতে হাসতে সিগারেটে টান দিলেন।

"ঝামেলা মিটে যায় কী ?" সুদীপ যেন আবার নিজেকেই জিজ্ঞেস করলো। কিন্তু দৃষ্টি সৌরীন্দ্রর মুখের ওপর। "এমন কিছু খুনী বা অপরাধী দেখা গেছে, যারা তাদের খুন বা অপরাধের কথা ভুলে যেতে চায়। ভুলেও যায়। এমনকি, অপরাধ প্রমাণিত হবার পরেও, এরা কিছুতেই ঘটনার কথা মনে করতে পারে না। আমার মনে হয়, ভয় আর বিদ্বেষ থেকেও এরকম ঘটনা ঘটে।"

সৌরীন্দ্র ভ্রূকুটি চোখে লেনিনের ছবির দিকে দেখলেন। সিগারেটে টান দিয়ে, মুখ ফিরিয়ে তাকালেন সুদীপের মুখের দিকে। ধোঁয়া ছাড়লেন এক মুখ, "তার মানে, তুই বলতে চাইছিস, লেনিন সম্পর্কে তোর কথা আমি ভয়ে বা বিদ্বেষে ভুলে গেছি ?"

"না না। তুমি ভয়ে বিদ্বেষে ভুলে যাবে কেন ?" সুদীপ হেসে মাথা নাড়লো। হাত জোড় করে সংশয় ভরা বিচলিত চোখে সৌরীন্দ্রর মুখের দিকে তাকালো, "ওটা তো অপরাধের কথা। রাগ করো না, তোমাকে আমি তা বলিনি। আগেই তো বললাম, আমার কথা তোমার মনঃপূত নয় বলেই ভুলে যেতে চাও। ভুলেও যাও। তোমার ও-কথাটার জবাব আমি কয়েকবার দিয়েছি।"

সৌরীন্দ্রর মুখ গম্ভীর চিন্তিত। আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন, "না, আমার মনে পড়ছে না। আমার কথার জবাবে তুই লেনিন সম্পর্কে কী বলেছিস, আমার মনে নেই।" তিনি হঠাৎ হেসে সিগারেটে টান দিলেন, "আজকাল তো তুই অদ্ভুত সব আজেবাজে কথা বলিস। ওসব মনে রাখার কোনো অর্থও হয় না। তবু কেন ?" তিনি আবার দেওয়ালের দু'দিকে চোখ তুলে দেখলেন, "রবীন্দ্রনাথ টলস্টয় গান্ধী—এঁদের এক ঘরে রাখা বুঝতে পারি। এঁদের ওপর তোর অগাধ ভক্তি আর বিশ্বাস। ভালো কথা। তুই আর সেই ছবু নেই। অনেক বদলে গেছিস। গান্ধীকে তুই মহান—মহাত্মা বলে ভাবতে পারিস। কিন্তু তোর এই ঠাকুর ঘরে লেনিন কেন ?" তাঁর গম্ভীর স্বরে রীতিমতো জেদী জিজ্ঞাসা।

"ঠাকুর ঘর !" সুদীপ দেওয়ালের দিকে একবার দেখলো, "বেশ ভালো বলেছো। কিন্তু এসব কথা থাক। তুমি কী বলতে এসেছিলে, তাই বল।"

সৌরীন্দ্র সিগারেট গুঁজে দিলেন ছাইদানিতে। জোরে মাথা নাড়লেন, "না না, থাকবে না। আমি সত্যি তোর জবাব শুনতে চাই। এবার আমি ঠিক মনে রাখবো।"

সুদীপের হাসিতে অস্বস্তি। ও দক্ষিণের খোলা জানালার দিকে একবার দেখলো। বুঝতে পারছে, সৌরীন্দ্রর মনে এখন প্রচণ্ড জেদ চেপে বসেছে। সুদীপের জবাব না শুনে ছাড়বেন না। আসলে উনি এখন এক রকমের অসহায়। যে-অসহায়তার মধ্যে আছে সুপ্ত রাগ আর বিদ্বেষ। সুদীপের জবাবটা ওঁর কাছে

এখন একটা চ্যালেঞ্জের মতো। ও সৌরীন্দ্রব মুখের দিকে তাকালো, "তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, লেনিনের ছবি এ ঘরে রাখার অধিকার আমার নেই। কিন্তু তোমাকে আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি, লেনিনকে আমিও মহান-মহাত্মা বলে মনে করি। সেই জন্যই ওর ছবি আমার ঘরে রেখেছি।"

"মহাত্মা লেনিন!" সৌরীন্দ্রব ঠোঁট কাস্তেব মতো বেঁকে উঠলো। হাসলেন। ওঁর একটি দাঁতও পড়েনি। দেওয়ালের দিকে চোখ তুলে একবার দেখে, আবার সুদীপের চোখেব দিকে তাকালেন, "মহাত্মা গান্ধী, আব মহাত্মা লেনিন? চমৎকার! ব্যাখ্যাটা কী?"

সৌরীন্দ্রর ধারালো বিদ্রূপে ঝলকানো মুখের দিকে তাকিয়ে সুদীপ বিনীত হাসলো, "এব আবার ব্যাখ্যা কী? লেনিনকে মহাত্মা বলা যাবে না?"

"কিন্তু গান্ধীর সঙ্গে তাঁর তুলনা কিসের?" সৌরীন্দ্রর স্ববে অধৈর্য উত্তাপ।

সুদীপের মুখে শান্ত হাসি, "একটাই। দুজনেই পৃথিবীর দুই মানবপ্রেমিক মহান ব্যক্তি।"

"মানবপ্রেমিক!" সৌরীন্দ্র যেন অন্তহীন বিস্ময়ে কয়েক মুহূর্ত হতবাক্ হয়ে বইলেন। তারপরে বাইরের কৃষ্ণচূড়ার ডালে, ডাকপাড়া দোয়েলটাকে চমকে দিয়ে অট্টহাসিতে বেজে উঠলেন, "লেনিন মানবপ্রেমিক, পৃথিবীতে এইটা তাঁর পবিচয়? আর গান্ধীও মানবপ্রেমিক?"

সৌরীন্দ্রব অট্টহাসিতে সুদীপ একটুও বিব্রত বা বিচলিত হল না। মুখে ওর স্বভাবসিদ্ধ শান্ত হাসি, "আমি তাই মনে করি।"

"লেনিনের একমাত্র পরিচয়, তিনি মানবপ্রেমিক ছিলেন?" সৌরীন্দ্র তাঁর অট্টহাসিব রুদ্ধ বেগটাকে যেন কোনোক্রমে সামলে রেখে, ঘাড় কাত করে তাকালেন, "আব ওটাই কি তাঁর আসল পরিচয়?"

সুদীপ ঘাড় ঝাঁকালো, "তুমি আমার এক কালের গুরু। প্রথম লেনিনকে দেখেছিলাম তোমার চোখ দিয়ে। সে-দেখাটার মধ্যে পূর্ণতা ছিল না। সত্যও ছিল না। লেনিন পৃথিবীতে যে-ইতিহাস সৃষ্টি করে গেছেন, তার প্রথম আর আদি উৎস মানবপ্রেম। এটা আমার বিশ্বাস।"

"কোন্ শ্রেণীর মানব তাঁরা?" সৌরীন্দ্র যেন সুদীপকে কথার ফাঁদে বেঁধে, ঝুঁকে পড়লেন টেবিলের ওপর। চশমার কাচের আড়ালে তাঁর চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ।

সুদীপ হাসলো, "এটাই বোধহয় তোমার আসল প্রশ্ন। জবাবটা তো সহজ। নিশ্চয়ই সামান্য কিছু অত্যাচারী ভোগী সুখী মানুষ তাঁরা ছিলেন না।" ও হাত

জোড় করলো, "কিন্তু দোহাই, এখন তুমি শ্রেণী বিপ্লবের কথা শুরু করো না। কথাটা তোমাকে এমনিতেই প্রায় রোজ কয়েকবার বলতে হয়। আমার জন্মকাল থেকে এই নিয়ে তোমার সঙ্গে অনেক কথা হয়েছে। কথাটা এখন ওঝার জল পড়ার মতো গিলিয়ে দেবার অবস্থায় এসেছে। কিন্তু আমি আর জলপড়া খাবার অবস্থায় নেই।"

"আমি জানি, শ্রেণী বিপ্লবের ওপর তোর কোনো আস্থা নেই।" সৌরীন্দ্রর আক্রমণোদ্যত ভঙ্গি অনেকটা কমে এলো। তিনি সোজা হয়ে বসলেন, "লেনিন আর গান্ধীকে একসঙ্গে নিয়ে যে ঘর করে, শ্রেণীবিপ্লবের সম্পর্কে ওরকম কথা ছাড়া সে আর কী বলবে?"

সুদীপ মাথা নাড়লো, "আমি কিন্তু শ্রেণীবিপ্লব কথাটাকে অসম্মান করিনি। তুমি হয়তো রেগে যাবে। আমি বলতে চেয়েছি, আমাদের দেশে শ্রেণীবিপ্লবে বিশ্বাসী নেতারা, ও-কথাটাকে এখন ওঝাদের মতো মন্ত্রপূত জলপড়ার পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। আসলে শ্রেণীবিপ্লবে তারা বিশ্বাস করে না। অনেক সময় ভয় হয়, আদৌ তারা বিষয়টা বোঝে কি না। তার চেয়েও ভয়ের কথা, ক্যাডারদের ভেজাল মাল গেলাচ্ছে। আর কী সাংঘাতিক তার পরিণাম দেখতে পাচ্ছি আমরা। ঐ ওদের তবু ওসব বালাই নেই। গান্ধীবাদ নিয়ে মাথা ঘামায় না। বোঝেও না। বলতে হয়, বলে। ওদের এখন বুলি যা দাঁড়িয়েছে, কোনদিন শুনবো, মুখ ফসকে ওরাও শ্রেণীবিপ্লবের কথা বলছে। হে ভগবান, সেদিনটা কী ভয়ঙ্কর।"

"হাত জোড় করে আমাকে শ্রেণীবিপ্লবের কথা শুরু করতে বারণ করলি।" সৌরীন্দ্রর গম্ভীর স্বরের মতোই তাঁর মুখে গাম্ভীর্য নেমে এলো, "কিন্তু আমি তো দেখছি, ওটা নিয়ে তোর মাথাব্যথাই বেশি। কথাটাকে তুই অসম্মান করিস নে। অথচ আমাদের অপমান করছিস।"

সুদীপ ঝটিতি উঠে দাঁড়ালো। লজ্জিত বিব্রত ওর মুখের অভিব্যক্তি, "ক্ষমা করো। এতোটা বলতে চাইনি। গান্ধী আর লেনিনকে নিয়ে একসঙ্গে ঘর করার কথাটা বললে। শুনে নিজেকে সামলাতে পারিনি। আর আমার কথা তো তোমার কাছে অদ্ভুত আজেবাজে। মনে রাখাও অর্থহীন। অতএব—।"

"সেটা তো হাজার বার সত্যি।" সৌরীন্দ্রর স্বরে দৃঢ়তা, "তোর ইদানীংকালের কথা মনে রাখতে গেলে, আমাদের হাত পা গুটিয়ে বসে থাকতে হয়। পাগলে কী না বলে, ছাগলে কী না খায়। কিন্তু তোর কথা পাগলের মতো নয়। শত্রুর মতো। তাতেই বা কী যায় আসে। সারা পৃথিবী দেখছে, শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে, রাজ্যের জনগণ আমাদের সঙ্গে রয়েছে।"

সুদীপ ঘাড় ঝাঁকালো। সেই সঙ্গেই একটি দীর্ঘশ্বাস, "হ্যাঁ, জনগণ।"

"জনগণেব নামে দীর্ঘশ্বাস কেন ?" সৌবীন্দ্র ভ্রূকুটি চোখে তাকালেন।

সুদীপ করুণ হাসলো, "আমিও তাদেরই একজন যে !"

"ওটা তো ডাহা মিথ্যে কথা।" সৌরীন্দ্রর ঠোঁট হয়ে উঠলো ধাবালো কাণ্ডে। চশমাব কাচের আড়ালে, দু'চোখে বিদ্রূপের ছটা, "তা হলে তো তুই আমাদের সঙ্গেই থাকতিস্। আসলে তুই জনগণের শত্রু।"

সুদীপ আগের মতোই হাসলো, "কারণ আমি তোমাদের সঙ্গে নেই। তোমার মতো বর্ষীযান অভিজ্ঞ নেতা এখনও সেই পুবনো ফরমুলা আঁকড়ে ধবে আছো, যে তোমাদেব সঙ্গে নেই, সে-ই তোমাদেব শত্রু।"

"কে বলেছে, আমি সেই ফবমুলা আঁকড়ে ধবে আছি ?" সৌরীন্দ্র জোবে ঘাড় ঝাঁকুনি দিলেন। গলায় তাঁব প্রতিবাদেব সুর, "আমি নিতান্ত তোকে লক্ষ করেই কথাটা বলেছি। আমি দক্ষিণপন্থীদের বুঝি। ওদের কোনো নীতি বা আদর্শেব বালাই নেই। গান্ধীবাদে যে ওদের বিশ্বাস নেই, সেটা ওদেব হিংসার বাজনীতিতেই প্রমাণ। ওবা আমাদেব অনেক লোককে খুন করেছে।" তিনি থমকে গিয়ে, ভ্রূকুটি অবাক চোখে, ঘাড কাত কবে সুদীপের দিকে তাকালেন, "কী হল ! মাথায হাত দিয়ে বসে পডলি যে ?"

সত্যি, সৌবীন্দ্রব কথাব মাঝখানেই, সুদীপ যেন হঠাৎ হতাশায় দু'হাতে মাথা চেপে ধবে বসে পড়লো। কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ মাথা নাড়লো। তারপর মাথা থেকে হাত নামিযে সৌবীন্দ্রব দিকে তাকালো। একটু যেন বিব্রত হয়েই হাসলো, "কিছু নয়। তুমি আমাব কথা শুনলে রেগে যাবে। ওসব কথা থাক। তুমি কী বলতে এসেছিলে, তাই বল।"

"আমি যা বলতে এসেছিলাম, তা অবিশ্যি খুবই জরুরি।" সৌরীন্দ্রব মুখ শক্ত আর গম্ভীর হয়ে উঠলো। এবং গম্ভীর তাঁর গলার স্বরে, একটা জেদের আভাস চাপা থাকলো না, "তবু সে-কথাটা আজ রাত্রে বা কাল বাত্রের দিকে বললেও চলবে। আর আমার রাগের কথা বলছিস ? তুই যদি অন্যায় কথা বলে আমাকে আক্রমণ করিস, কিংবা অযথা বিরুদ্ধ কথা বলিস, তা হলে রাগ হতেই পারে। আমার রাগেব মূল্যই বা তোব কাছে কী আছে ?"

সুদীপের গোঁফদাড়ির ভাঁজে, বিব্রত হাসি যেন একটু করুণ হয়ে উঠলো, "বাগ মানেই কষ্ট। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাইনে।"

"আমাকে কষ্ট দিতে চাস না ?" সৌবীন্দ্রর শক্ত গম্ভীর মুখে হঠাৎ হাসি ফুটলো। হয়তো তিনি বিদ্রূপ কবতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর হাসিতেও একটা দুঃখের ম্লানতা নেমে এলো। "ছুবু, আমি রাগ আর কষ্টকে এক চোখে দেখিনে।

কিন্তু তুই আমাকে কষ্ট দিতে চাসনে, এ কথাটা আজ আর প্রাণ ধরে বিশ্বাস করতে পারিনে। উনিশশো বাষট্টি সালের সেই তুই—সতরো বছর বয়সের ছেলে। পুলিশ আমার সঙ্গে তোকেও জেলে পুরেছিল। তখন ডিগ্রি কোর্সের তোর সেকেন্ড ইয়ার—ফিজিক্স-এ অনার্স নিয়ে পড়ছিলি। মেধাবী ছাত্র সুদীপ ব্যানার্জি। জেলে থাকতেই, মাত্র আঠারো বছর বয়সে, তুই পরীক্ষা দিয়ে দুর্দান্ত রেজাল্ট করেছিলি। পার্টির অহঙ্কার তুই। আর আমারও কী অহঙ্কার—আমার বড় ছেলে—আমার শিষ্য কমরেড। এটা উনিশশো তিরাশি সাল। তুই আমাকে ত্যাগ করে গেছিস। আমাকে কষ্ট দিতে পারে, এমন কোনো কথাই তোর আজ আর বলতে বাধে না।"

সুদীপ টেবিলের ওপর বাঁ হাতটা বাড়িয়ে দিল। একটু ঝুঁকে পড়লো সৌরীন্দ্রর দিকে। ওর করুণ হাসিতে এখন বিষণ্ণতার ছায়া। গলার স্বরে আবেগ, "বাবা, আমি তোমাকে ত্যাগ করে আসিনি। একটা সময়, তুমি আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছো। তুমি সৌরীন বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই কোন্ ইংরেজ আমল থেকে স্বাধীনতার যোদ্ধা। জেলেই কেটেছে যার জীবনেব অনেকগুলো বছর। স্বাধীন ভাবতেও রেহাই পাওনি। আমার যখন চার বছর বয়স, তখন তুমি জেলে গেছলে। উনিশশো উনপঞ্চাশের অক্টোবরে। রাত্রে শুয়ে মায়ের মুখে তোমার কথা শুনতাম। আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে পুলিশ তোমাকে ধরে নিয়ে গেছলো। মা তোমার খবর পায়নি অনেকদিন। জেলের ভেতরে তোমরা পুলিশের সঙ্গে লড়াই করেছো। পুলিশ গুলি চালিয়েছে—বেদম পিটিয়েছে। মাসেব পর মাস তোমরা অনশন করেছো। আমার সাত বছর বয়স পেরিয়ে যাবার পর তুমি বাড়ি ফিরেছিলে। তারপর আবার বাষট্টিতে। এক বছর বাদ দিয়ে আবার চৌষট্টিতে। তোমাব মতো আমিও বলতে পারি, তুমি আমার বাবা—আমার গুরুও বটে। কোনো সন্তানের চোখে, তার বাবা এত বড় গৌরব বোধ হয় আর হতে পারে না। কিন্তু, হ্যাঁ, এটা উনিশশো তিরাশি। সেই তুমি আজ কতো বদলে গেছ। আমার সেই নেতা, আমার সেই গুরুকে চিনে উঠতে পারিনে। তাঁকে মেনে নিতে পারিনে। আমার ভেতরে কী ভয় আর লজ্জা, তোমাকে বোঝাতে পারিনে। হ্যাঁ, রাগ অভিযোগ, সবই আছে আমার মধ্যে। তোমার শিক্ষাই আমার পথ। আমি অন্ধ নই। যা আমার কাছে অন্যায়, সেখানে আমি আত্মসমর্পণ করতে শিখিনি। যে-মুহূর্তে তোমাদের সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করলাম, সেই মুহূর্তেই তোমরা আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। জানিয়ে দিলে, আমি আর তোমাদের সঙ্গে নেই।"

"নেই তো বটেই।" সৌরীন্দ্রর স্বরে আবার ফিরে এলো সেই দৃঢ়তা, "তুই

নিজে থেকেই আমাদের ছেড়ে গেছিস। আমাদেব জানিয়ে দিতে হযনি। গান্ধী আর লেনিনকে এক সঙ্গে নিয়ে যে ঘব করে, তার রাজনৈতিক মতবাদ কী হতে পারে, আমি জানিনে— ।"

সুদীপ দ্রুত মাথা নাডলো, "এটা কোনো রাজনৈতিক মতবাদ নয়। এঁদের দুজনকে তুমি একসঙ্গে মেলাতে পারো না, তোমার রাজনৈতিক আদর্শের জন্য। আমার কাছে এঁরা দুজন, আধুনিক পৃথিবীব সব থেকে বড দুঃখী দরিদ্র লাঞ্ছিত মানুষেব বন্ধু। নেতা। এঁদের ঘিরে এ শতাব্দীতে যে-পরিমাণ মানুষ এসে দাঁড়িয়েছে তাদেব ত্রাণেব জন্য, আর কাবোকে ঘিরে তাবা দাঁডায়নি। গান্ধীজীর পিসফুল রেভ্যুলিয়েশনের সঙ্গে, লেনিনেব নেতৃত্বে রুশ বিপ্লবেব সঙ্গতিটা কোথায়, সেটা আমি তোমাকে ব্যাখ্যা করতে চাইনে। বিবক্ত হবে, রেগে যাবে। এঁরা আমাব ঘব আলো কবে নেই। এঁরা আমার প্রাণেব শক্তি, শুদ্ধি।"

"তাহলে, আমাদের বিরুদ্ধে তোব সমালোচনার রাজনীতিটা কী ?" সৌরীন্দ্র তীক্ষ্ণ হেসে ঘাড় কাত করে সুদীপের দিকে তাকালেন, "আমাদেব বিরোধীরা যা বলে, তাই ?"

সুদীপ হেসে মাথা নাডলো, "না। আমার সমালোচনা হল এক অবাক, বিপন্ন, জিজ্ঞাসু মানুষের। আর আমার সমালোচনা হল তাদের বিরুদ্ধে, যাদের কাছে ছিল আমার সব থেকে বেশি প্রত্যাশা। এদেশের চোরাকাববারীদের আজ পর্যন্ত কোনো শাসকদলই ল্যাম্পপোস্টে বেঁধে ফাঁসি দেয়নি। এটা একটা নিছক তুলনামাত্র। আইনকে কলা দেখাবে কে ? কার সাহস আছে ? অনেক দ্বন্দ্ব বিরোধ সত্ত্বেও, দলগুলোব মধ্যে কী নিবিড় ঐক্য ! যাকগে এসব কথা। তুমি যা বলতে এসেছিলে, তাই বল।"

"বুঝতে পাবি, তোর এ কথার মধ্যেও আমাদের ওপরেই আক্রমণ করছিস।" সৌরীন্দ্র গম্ভীর মুখে মাথা ঝাঁকালেন, "কিন্তু তোর ঐ কথাগুলো—ঐ অবাক বিপন্ন জিজ্ঞাসু মানুষ, ওসব হল এক ধরনের ঘোলাটে কথাবার্তা। কোনো রাজনৈতিক দলকে সমালোচনা করতে হলে, একটা অন্য রাজনৈতিক মতাদর্শ থাকা উচিত।"

সুদীপ হেসে হাত জোড় করলো, "তা হলে আমি নিরুপায়। আপাতত আমার এমন রাজনৈতিক মতবাদ নেই, যা দিয়ে তোমাদেব মোকাবিলা করতে পারি।"

"ঠিক আছে। পরেও তোর সঙ্গে আমার কথা হবেই।" সৌরীন্দ্র হাসলেন, "কেন না, তুই তো আমাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা থেকে কখনোই বিরত হবি নে। এ সপ্তাহের ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকাটা আজই হাতে পেয়েছি। তোর

লেখাটাও দেখলাম।"

সুদীপের গোঁফদাড়ির ভাঁজে, চোখে হাসির দীপ্তি ছড়িয়ে পড়লো, "ওহ্, তুমি ঐ লেখাটার সম্পর্কে কিছু বলতে এসেছিলে?"

"না।" সৌরীন্দ্র ঘাড় নাড়লেন, "লেখাটা দেখেছি মাত্র। এখনো পড়া হয়নি। কিন্তু তখন তুই কী বলতে যাচ্ছিলি, সেটা শোনা হল না। আমাকে কষ্ট দিতে চাসনে বলে, মাথা চেপে ধরে চুপ করে গেছলি।"

সুদীপ হেসে উঠে মাথা ঝাঁকালো, "সেই কথাটা? সত্যি বলছি বাবা, কথাটা শুনে যেমন অবাক ও বিস্মিত হয়েছিলাম, তেমনি হাসিও পাচ্ছিল আমার খুবই। তুমি ওদের কথায় বলছিলে না, ওরা গান্ধীবাদে বিশ্বাস করে না, সেটা ওদের হিংসার রাজনীতিতেই প্রমাণ। ওরা তোমাদের অনেক লোককে খুন করেছে। তুমি একটুও মিথ্যে বলোনি। আর তোমরা? তোমরা কি হিংসার রাজনীতিতে বিশ্বাসী?"

"আমরা গান্ধীর অহিংস রাজনীতিতে বিশ্বাসী নই।" সৌরীন্দ্র যতোটা দৃঢ় হতে চাইলেন, ততোটা যেন পারলেন না। তাঁর স্বরে কোথায় একটা দ্বিধার স্পর্শ, "আমরা সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী।"

সুদীপ ঘাড় ঝাঁকালো, "ব্যক্তিহত্যায় নিশ্চয়ই নয়?"

"কখনোই নয়।" সৌরীন্দ্র ঘাড় নাড়লেন। তাঁর স্বরে দৃঢ়তা।

সুদীপ হাসলো, "ওরা বলে, তোমরাও ওদের অনেক লোককে খুন করেছো। খুনোখুনি যে চলছে, সেটা তো আমরা সবাই দেখছি। তা হলে ওদের কী করা উচিত? খাঁটি গান্ধীবাদী হয়ে অহিংস থাকা?"

"ছুবু, তোর আসল কথাটা কী?" সৌরীন্দ্রর ভ্রূকুটি চোখে সন্দেহ ও বিরক্তি। "তুই নিজেই বলছিস, ওরা গান্ধীবাদের কথা বলতে হয় বলে, কিন্তু বোঝে না। বিশ্বাসও করে না। এ সবই তোর জানা কথা, অভিজ্ঞতার কথা। ওরা অহিংস হয়ে থাকবে কি না, একথা জিজ্ঞেস করবার মানে কী? তুই জানিস নে, ওরা কী?"

সুদীপ ঘাড় ঝাঁকালো, "জানি তো।"

"তবে?" সৌরীন্দ্র ঘাড় কাত করে ভ্রূকুটি-তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন।

সুদীপও তাকালো সৌরীন্দ্রর চোখের দিকে। তারপর চোখ নামিয়ে অস্বস্তিতে হাসলো, "সে-জন্যই ওদের সম্পর্কে তোমার কথা শুনে তখন অবাক হয়েছিলাম। হাসি পাচ্ছিল। জানি, আমার কথা শুনলে, তুমি আবার রেগে যাবে। তুমি নিশ্চয়ই দাবী করবে, তোমরা যথার্থ লেনিনবাদীই আছো। কিন্তু আমি আজ আর তোমাদের সঙ্গে ওদের ফারাক বিশেষ দেখতে পাই নে।"

"তোর পক্ষে সেটাই তো স্বাভাবিক।" সৌরীন্দ্রর মুখ শক্ত হয়ে উঠলো। তিনি একটা সিগারেট ধরালেন। এক মুখ ধোঁয়া ছাড়লেন, এবং হাসলেন, "কথাটা তুই আগেও বলেছিস। কিন্তু তুই ভালোই জানিস, কথাটার মূলে কোনো সত্যি নেই। আমাদের আসল জায়গায় কোনো স্খলন বা পতন ঘটেনি। বাইরে থেকে দেখলে, কিছু ত্রুটি চোখে পড়তে পারে। বাইরের দেখাটা, বাইরেরই। ওটা দিয়ে ভেতরটাকে দেখা যায় না। চেনাও যায় না। যে বুর্জোয়া প্রেসগুলো সব সময় আমাদের বাপান্ত করে, তারাও জানে, আমাদের সাংগঠনিক শক্তি কতোখানি।"

সুদীপ সৌরীন্দ্রর চোখের দিকে তাকিয়েছিল। সৌরীন্দ্রর কথার জবাবে ও কিছু বললো না। বরং কেমন একটা লজ্জা ও কুণ্ঠায় হেসে মুখ নিচু করলো। বাঁ হাতের কবজি উলটে ঘড়ি দেখলো। বেলা একটা বাজতে মাত্র কয়েক মিনিট বাকি। মনে পড়লো, বেলা তিনটের সময় ওর সীতানাথের কাছে যাবার কথা। সেখান থেকে, পাঁচটায়, এ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এ, নতুন চার শিল্পীর ছবি দেখতে যাবে। ও সৌরীন্দ্রর দিকে মুখ তুলে তাকালো। সৌরীন্দ্রও ওর দিকেই তাকিয়েছিলেন। জিজ্ঞাসু তাঁর চোখের দৃষ্টি। ও জিজ্ঞেস করলো, "একটা সিগারেট খাবো?"

"নিশ্চয়ই। নতুন অনুমতির দরকার হচ্ছে কেন?" সৌরীন্দ্র তাঁর নিজের সিগারেটের প্যাকেটটাই এগিয়ে দিলেন সুদীপের দিকে, "আমার এ সিগারেট তো তোর আবার ভালো লাগে না।"

সুদীপ নিজের প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করলো। হেসে ঘাড় নাড়লো, "না। এ তো যার যেটা ভালো লাগে।"

"কিন্তু তুই চুপ করে গেলি যে?" সৌরীন্দ্র সিগারেটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লেন। ঘাড় কাত করে ভ্রূকুটি চোখে তাকালেন।

সুদীপ দেশলাই জ্বেলে সিগারেট ধরালো। হাসলো, "তোমার সে-কথা মনে আছে বাবা? তুমি আমাকে আমার ষোল বছর বয়সে বলেছিলে, ছুবু, বড় হয়ে যখন তোর সিগারেট খেতে ইচ্ছে হবে—না হলেই ভালো—তবু আমি নিজে যে-জিনিস খাই, কারোকে তা বারণ করার অধিকার আমার নেই। তবে যখন তোর সিগারেট খাবার ইচ্ছে হবে, অবিশ্যি কিনে খাবার মতো রোজগার যখন তুই করবি, তুই আমাকে বলিস। তোর জীবনের প্রথম সিগারেটটা আমিই তোকে দেবো। কথাটা মায়ের কানে পর্যন্ত ভালো লাগেনি। হয়তো অনেক প্রাজ্ঞ-বিজ্ঞদের মূল্যবোধ এ কথায় দারুণ আঘাত পেতো। কিন্তু নতুন মূল্যবোধের চেতনাটা তুমিই আমাকে প্রথম দিয়েছিলে। নতুন, আবার পুরনোও

বটে। আমাদের দেশের চাষী-মজুরদের বাবা-ছেলেতে একসঙ্গে তামাক খেতে আটকায় না। কিন্তু আমাদের মধ্যবিত্ত মন, শিক্ষা, এটা মেনে নিতে পারে না। তুমি পেরেছিলে। কারণ, তুমি জানতে ওটা বোধহয় অনিবার্য। আমাকে মিথ্যাচার আর অন্যায়বোধ থেকে বাঁচিয়েছিলে। আরো একটা খুব মোক্ষম কথা মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছিলে! সিগারেট কেনার মতো রোজগার যখন আমি করবো, তখনই যেন চাই। তার মানে, যতোদিন আমি উপার্জন না করতে পারছি, ততোদিন পর্যন্ত ওটাতে আমার অধিকার থাকবে না। সে-কথা আমার কাছে পিতৃবাক্যেরও বেশি. গুরুবাক্য। তোমার সে-কথা মনে আছে ?"

"তা আছে বই কি !" সৌরীন্দ্রর অবাক ভ্রূকুটি চোখে বিস্ময়, "সেই পুরনো কথাটা হঠাৎ এখন মনে করবার কী কারণ ঘটলো ? যে-প্রসঙ্গ নিয়ে আমাদের কথা হচ্ছিল, তার সঙ্গে এর কী সম্পর্ক ? আমাদের বিষয়ে তোর একটা মিথ্যে অভিযোগের জবাব দিচ্ছিলাম আমি। সে-বিষয়ে তোর কিছু বলার নেই ? আমার কথা মেনে নিচ্ছিস ?"

টেবিলের ওপরে রাখা, সুদীপের ডান হাতের দু'আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগারেট। ওর দৃষ্টি সেদিকে। মুখে অপ্রতিভ হাসি। ঘাড় নাড়লো, "না, মেনে নিইনি। স্বাভাবিক, তুমি আজ আমাকে বাইরের লোক ভাববে। আমার দেখাটাও বাইরে থেকে, এমন কি বোঝাটাও, এটা তোমার জোর জেদের কথা। আজ তোমাকে এখান থেকে টলানো যাবে না।"

"জোর জেদের কথা নয়। এটা আমার বিশ্বাসের কথা।" সৌরীন্দ্রর স্বরের দৃঢ়তায় জেদেরই ঝাঁজ ফুটলো, "আমার বিশ্বাসকে তুই টলাবি কেমন করে ?"

সুদীপ সৌরীন্দ্রর চোখের দিকে তাকালো। তিনিও সুদীপের চোখের দিকে তাকিয়েছিলেন। কয়েক সেকেণ্ডের স্তব্ধতায়, বাইরে সেই দোয়েলের ডাক শোনা গেল। সুদীপ হাসলো। একটা ছোট নিশ্বাস ফেললো, "বিশ্বাস !"

"কী বলতে চাস তুই ?" সৌরীন্দ্রর ভ্রূকুটি জিজ্ঞাসু মুখে যেন অস্বস্তির ছায়া পড়লো. "আমার বিশ্বাস সম্পর্কে তোর সন্দেহ আছে নাকি ?"

সুদীপ হ্যাঁ না কিছুই বললো না। মাথা নিচু করে সিগারেটে টান দিল। তারপর চোখ তুলে তাকালো, "আমার সেই পুরনো দিনের কথা বলতেই ভালো লাগছে। সেখানেই আমি তোমাকে খুঁজে পাই।"

"বুঝি, আজকের আমাকে নিয়ে তোর অসুবিধে আছে।" সৌরীন্দ্র তাঁর সিগারেটে শেষ টান দিয়ে, শেষাংশ গুঁজে দিলেন ছাইদানিতে, "কারণ তুই ওদের সঙ্গে আমাদের আজ আর কোনো ফারাক দেখতে পাসনে। এসব কথা আমাদের শত্রুরাই বলে।"

সুদীপের মুখের হাসিতে ছায়া নামলো, "তোমাদের নিজেদেব মধ্যেও এ নিয়ে বিরোধ আছে ?"

"আছে !" সৌরীন্দ্রর স্বরে আবার জেদের ঝাঁজ ফুটলো, "বিরোধিতা তারাই করছে, যাবা ভাবে, পাওয়ারে থেকে পার্টির কিছু লোক অনেক সুখ-সুবিধে ভোগ করছে। আখেব গুছিয়ে নিচ্ছে। পার্টির মধ্যে এরা সব ঈর্ষাকাতর লোক। নিজেদেব কিছু কববাব যোগ্যতাও নেই। বিরোধিতাই এদেব কাজ।"

সুদীপ দক্ষিণেব খোলা জানালার দিকে তাকালো। সৌরীন্দ্রর কথাব কোনো জবাব দিল না। ওব সিগারেটেব বেশিব ভাগটাই তখনও অবশিষ্ট ছিল। সেটা ছাইদানির মধ্যে চেপে দিল। সৌরীন্দ্র জিজ্ঞাসু চোখে সুদীপেব দিকে তাকিয়েছিলেন। সুদীপ কিছু বলবে, সেই প্রত্যাশা তাঁব জিজ্ঞাসু চোখে। কিন্তু সুদীপ কিছুই বললো না। ও আবার কবজি উলটে ঘড়ি দেখলো। সৌরীন্দ্রও তাঁর বাঁ হাতের পাঞ্জাবির হাতা সরিয়ে ঘড়ি দেখলেন। তাকালেন সুদীপের দিকে, "তুই কি কোথাও যাবি ? না কি, কারোর আসার কথা আছে ?"

সুদীপের মুখে সেই ছায়া। এ ছায়ায় গাম্ভীর্য নেই। আছে একটা নিস্পৃহ বৈরাগ্যের ঔদাস্য। সৌরীন্দ্রর জিজ্ঞাসার জবাবে ও মাথা নাড়লো। সৌরীন্দ্র টেবিলের ওপব হাত বেখে, সুদীপেব দিকে ঝুঁকে পড়লেন, "খিদে পেয়েছে নাকি ?"

সুদীপ ম্লান হাসলো। সৌরীন্দ্রর দিকে তাকিয়ে, মাথা নাড়লো আবার। সৌরীন্দ্রর ভুরু কুঁচকে উঠলো, "কিন্তু কিছু বলছিস না যে ?"

"কী বলবো ?" সুদীপের মুখে সেই নিস্পৃহ উদাসীনতা, "পার্টির ভেতরে যাবা আজকের নেতৃত্বের বিরোধিতা করে, তারা ঈর্ষাকাতর—"

সৌরীন্দ্র দ্রুত ঘাড় নাড়লেন, "না না, আমি বিরোধী মাত্রকেই ঈর্ষাকাতর বলতে চাইনি। তাব মধ্যে, অনেকের অনেক ভ্রান্তিও আছে। অনেককে ভুল বোঝানো হচ্ছে। ঈর্ষাকাতর তারাই, নেতৃত্বের লোভে যারা হীনমন্যতায় ভুগছে, আর এরাই সৎ পার্টি কর্মীদের ভুল বোঝাচ্ছে। যেমন সীতানাথদা—"

"বাবা !" সুদীপ যেন সাপের ছোবল খাওয়া যন্ত্রণায় আর্তস্বরে ডেকে উঠলো। অথচ ওব্ গোঁফদাড়ি ভরা মুখ হয়ে উঠলো কঠিন। চোখের দৃষ্টিতে তীব্র প্রতিবাদের ঝলক, "শেষ পর্যন্ত তুমি সেই নামটাই উচ্চারণ করলে ? তুমি আর যা-ই হও, তোমাকে অসৎ ভাবতে আমার কষ্ট হবে।"

এই সময়ে প্রণতি ঘরে ঢুকলেন। দোহারা হলেও তাঁকে মোটা বলা যায় না। খুব খাটোও নন। তাঁর ফর্সা রঙ আর চেহারার অনেকখানিই যে সুদীপ পেয়েছে, তা দেখলেই বোঝা যায়। আটপৌরে ধরনে লাল পাড় তাঁতের শাড়ি আর সাদা

জামা তাঁর গায়ে। ষাটের ঊর্ধ্বে, তাঁর শরীর ও স্বাস্থ্য এখনও বেশ শক্ত। দু'হাতে শাঁখা, সোনা-বাঁধানো সরু লোহা, দু-এক গাছা সোনার চুড়ি। গলায় সোনার সরু চেন। মাথার খোলা ধূসর চুলের মাঝখানের সিঁথিতে সিঁদুরের রেখা। তাঁর আয়ত গভীর কালো চোখে উদ্বেগের ছায়া। তাকালেন স্বামী আর পুত্রের দিকে। উদ্বেগ তাঁর স্বরেও, "কী ব্যাপার ? তোমরা এতক্ষণ ধরে বাপ-ব্যাটায় কী নিয়ে পড়েছো ? শুনলাম, তোমরা দু'জনে অনেকক্ষণ ধরে কথা বলছো। শুনেই তো আমার আতঙ্ক।"

"আতঙ্কের কিছু নেই মা।" সুদীপ প্রণতিকে দেখে উঠে দাঁড়ালো। হাসলো, "বাবা আর আমি তো হাতাহাতি মারামারি করবো না।"

সৌরীন্দ্রর মুখ গম্ভীর। তিনি যে মনে মনে উত্তেজিত, তা তাঁর আবার একটা সিগারেট ধরানো দেখেই বোঝা গেল। তিনি প্রণতি বা সুদীপের দিকে তাকালেন না। বিপরীত দেওয়ালের দিকে তাঁর ক্ষুব্ধ দৃষ্টি। ক্ষুব্ধতা তাঁর গম্ভীর স্বরেও, "কিন্তু কথাবার্তাগুলো হাতাহাতি মারামারির থেকে কম কিছু নয়। তুই আমাকে ডিজঅনেস্ট ভাববি, সেটাও আমাকে সহ্য করতে হবে ? এ এলাকার লোকাল কমিটির যারা আমার বিরুদ্ধে, তারা কেউ এমন কথা বললে, আমি তাকে সহজে রেহাই দিতাম না। কিন্তু তারাও কেউ আজ পর্যন্ত আমাকে খোলাখুলি ডিজঅনেস্ট বলেনি।"

"আমিও তোমাকে তা বলিনি।" সুদীপ সৌরীন্দ্রর দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লো, "আমি বলেছি, তোমাকে অসৎ ভাবতে আমার কষ্ট হবে। আর কথাটা তখনই বলেছি, যখন তুমি সীতানাথ-জেঠু সম্পর্কে একটা মিথ্যে আর জঘন্য মন্তব্য করলে।"

সৌরীন্দ্র ঠোঁটেব কাছে সিগারেট তুলতে গিয়ে, নামিয়ে নিলেন। ভ্রুকুটি-কঠিন চোখে সুদীপের দিকে তাকিয়ে তিনি হঠাৎ যেন রাগে ফেটে পড়লেন, "মিথ্যে ? আমাকে তুই মিথ্যুক বলছিস ?"

"আহ্, তুমি এত রেগে যাচ্ছো কেন ?" প্রণতি সৌরীন্দ্রর কাছে এগিয়ে গেলেন, "আমি তো এ ভয়ই করছিলাম। একে হাই প্রেসার। সিগারেট খাচ্ছো ঘন ঘন। তুমি তো অনেকবার আমাকে বলেছো, ছুবুর সঙ্গে তুমি আর কথা বলবে না। তবু কেন আসো কথা বলতে ?"

সুদীপের মুখে আবার ছায়া নামলো। কিন্তু উদাসীনতার থেকে এ ছায়ায় গাম্ভীর্যের স্পর্শ স্পষ্ট, "আমি বলতে চেয়েছি, সীতানাথ মজুমদার সম্পর্কে তুমি যে-মন্তব্য করেছো, তা মিথ্যে। তোমার মতো, পার্টিতে আরো অনেকেই যাঁরা আজ সীতানাথ-জেঠুকে সহ্য করতে পারেন না, তাঁরাও কেউ বলেন না, উনি

নেতৃত্বের লোভে হীনমন্যতায় ভুগছেন।"

"তুই চুপ করবি ছুবু ?" প্রণতি সুদীপের দিকে ফিরে ধমকে উঠলেন, "তোকেও আমি কতোদিন বলেছি, তুই তোর বাবার সঙ্গে কখনো তর্কে যাবি নে। তবু সেই তর্কেই তুই যাবি। আমি তোদের সত্যি-মিথ্যে জানি নে। যে-সব কথা নিয়ে তোদের তর্ক লাগে, সে-সব কথা না বললেই হয়! কিন্তু বাবা-ছেলের মধ্যে এ কি অশান্তি ? এটা একটা সংসারও তো বটে।"

সুদীপের মাথা নিচু। মায়ের উদ্বেগ অশান্তির কথা ও বুঝতে পারে। কিন্তু সৌরীন্দ্রব সঙ্গে যে-প্রসঙ্গে ওর কথা হয়, ওর পক্ষে তা নীরবে মেনে নেওয়া সম্ভব না। সম্ভব না সৌরীন্দ্রব পক্ষেও। এক্ষেত্রে, পিতা পুত্র উভয়েই সমান অসহায়। অথচ, আজ দু'জনেই এমন একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে, উভয়ের মধ্যে বিতর্ক অনিবার্য।

সৌরীন্দ্র তাঁর ক্রোধ ও উত্তেজনা প্রশমনের চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁর ঠোঁটে কাস্তের বক্রতা, "সীতানাথ মজুমদারকে আমি চিনি তোর জন্মাবার আগে থেকে। আজ যেহেতু সে তোর নেতা হয়েছে, অতএব তার সম্পর্কে সত্যি কথা বলা যাবে না।"

"সত্যি কথা ?" সুদীপের চোখে বিস্ময়। ও তাকালো প্রণতির দিকে।

প্রণতি বাঁ হাত তুলে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। সৌরীন্দ্র তার আগেই মাথা ঝাঁকালেন, "হ্যাঁ, সত্যি কথা। সীতানাথ মজুমদারের সঙ্গে বহুবার, বহু ইস্যুতেই পার্টি নেতৃত্বেব মতবিরোধ হয়েছে। এবারের মতবিরোধেই তাই ওকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।"

"মতবিরোধ আর নেতৃত্বের লোভ যে এক কথা, তা জানতাম না।" সুদীপ এবার একটু হাসলো। মাথা নাড়লো, "প্রকাশ্যে তাঁর সম্পর্কে পার্টিও এমন কথা বলেনি। বরং মতবিরোধ সত্ত্বেও, তিনি যে একজন খাঁটি মানুষ, সে-কথাটাই বলা হয়েছে। তাঁর সৎ নির্ভীক ইমেজ নষ্ট করা যায়নি। যাবেও না। বহিষ্কার তিনি মেনে নেননি। কিন্তু নিঃশব্দে সরে দাঁড়িয়েছেন। আলাদা কোনো দলও গড়তে যাননি। তিনি নিজে থেকে কারোর সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন না। আমার মতো বহিষ্কৃত কেউ কেউ—"

প্রণতি সুদীপকে বাধা দিলেন, "ছুবু, যাঁর কথা নিয়ে বাবা-ছেলেতে ঝগড়া হয়, তাঁর কথা থাক না।"

"মা, বাবাই ভালো জানে, আমি ঝগড়ার কথা বলিনি।" সুদীপ সৌরীন্দ্রর দিকে তাকালো, "ঝগড়া বিবাদে সত্যি মিথ্যে যাচাই হয় না। সীতানাথ জেঠুকে তুমিও জানতে। তাঁর স্নেহ ভালবাসা তুমিও পেয়েছো। তিনি কী রকম—"

প্রণতি সৌরীন্দ্রর মুখের দিকে দেখলেন। দ্রুত মাথা নাড়লেন, "না না ছুবু, আমি কিছুই জানি নে। এ জগৎ সংসারকে আমি তোদের বাবার চোখ দিয়ে দেখেছি। মানুষকেও চিনেছি ওঁর চোখ দিয়েই। সীতানাথদা এক সময়ে আমাদের আপন ছিলেন, আজ আর নেই। তোর বাবার যিনি শত্রু, তিনি আমারও শত্রু। স্বামীকে নিয়ে সংসার আমার কাছে অনেক বড়।"

সুদীপ প্রণতির দিকে তাকিয়েছিল। সৌরীন্দ্র এই মুহূর্তে, দক্ষিণের জানালার দিকে তাকিয়ে, নিঃশব্দে সিগারেট টানছিলেন। সুদীপ মায়ের কথা শুনছিল। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েছিল। মায়ের চোখে মুখে, কথার স্বরে, কোথাও কি একটু দ্বিধা ছিল? থাকলেও, তা বোঝবার কোনো অবকাশ তিনি দেননি। নিঃশর্ত তাঁর স্বামীর প্রতি আনুগত্য। এখানে সত্যি-মিথ্যের বিচারের কোনো প্রশ্ন নেই। ন্যায়-অন্যায় বিবেচনা বহির্ভূত। পরস্পরের প্রেম দিয়েও, এর ব্যাখ্যা করা যাবে না। আনুগত্যের অধিক, এর নাম উৎসর্গ। আত্মোৎসর্গ। কোন্ যুক্তিবাদী একে অন্ধত্ব বলবে, কে জানে। কিন্তু ওখানেই মায়ের শক্তি। সব শক্তির মূল সেখানেই। নিজের বিশ্বাসের কাছে, নিজেকে সম্পূর্ণ সঁপে দিতে পারাই, তার আত্মোৎসর্গ। তার মুক্তি। সীতানাথ জেঠু হচ্ছেন সেই শক্তির অধিকারী।

সুদীপের দুই চোখে উজ্জ্বল হাসির ছটা। ও এক পা এগিয়ে, নিচু হয়ে প্রণতির দু'পা স্পর্শ করলো, "মা, তোমার কথার কোনো প্রতিবাদ আমি করবো না। করলেও তোমার কিছু যাবে আসবে না। আশীর্বাদ কর, তোমার মতো শক্তি যেন পাই।"

সৌরীন্দ্র মুখ ফিরিয়ে সুদীপের দিকে তাকালেন। প্রণতি সুদীপের মাথায় আলতো করে হাত ছোঁয়ালেন, "তোর ওসব শক্তি-মক্তির কথা আমি বুঝি নে বাপু। আমার কথা আমি বললাম; তবে আমার কষ্টের মূলেও তো তোরাই। স্বামী-পুত্রের বিবাদ কি কোনো মা-বউয়ের ভালো লাগে? কী অশান্তি যে করিস তোরা। অথচ কয়েক বছর আগেও, তোদের বাবা-ছেলের মাঝখানে, আমাদের মাথা গলাবার উপায় ছিল না। কোথায় গেল তোদের সেই ভাব?"

সুদীপ সৌরীন্দ্রর মুখের দিকে তাকালো। তিনিও তাকালেন সুদীপের দিকে। সুদীপ হেসে প্রণতির দিকে তাকালো, "সেটা বাবাকেই জিজ্ঞেস কর না!"

"আমাকে কেন?" সৌরীন্দ্র এখন অনেকটা শান্ত। কিন্তু গম্ভীর, "তুই নিজেই বল না। কেমন করে তোর বিশ্বস্ত নেতা হয়ে গেল সীতানাথ মজুমদার। আমরা হয়ে গেলাম বিশ্বাসঘাতক।"

সুদীপ হাসলো, "তা হলে তো কিছু পুরনো দিনের কথায় ফিরে যেতে হয়।"

"না না, নতুন পুরনো, আর কোনো কথাই নয়।" প্রণতি সৌরীন্দ্রর বাঁ হাতটা

তুলে, ঘড়ি দেখালেন, "ক'টা বেজেছে, দেখেছো ? তোমার এখনও চান হয়নি। অনিয়মের তো শেষ নেই।" তিনি সৌরীন্দ্রর হাত ছেড়ে, সুদীপের দিকে তাকালেন, "তোদের কি খিদে তেষ্টা বলে কিছু নেই ? চল, খেতে চল।"

সৌরীন্দ্র চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। জ্বলন্ত সিগারেটের শেষাংশ গুঁজে দিলেন ছাইদানিতে, "পুরনো নতুন, যে-কোনো কথাই বলিস, পরিবর্তিত পরিস্থিতির কথাটা ভুলে যাস নে। সেটা ভুলে গেলেই, সব কিছুকেই অন্য রকম দেখবি। সেই দেখাটা হবে অবাস্তব। পরিবর্তিত পরিস্থিতির মধ্যে যে মানিয়ে চলতে পারে সে-ই সব থেকে সার্থক।"

"পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মানিয়ে চলা !" সুদীপ সনিশ্বাসে হাসলো, "কথাটা নতুন নয়। শুধু ব্যাখ্যাটা নিয়েই যা গোলমাল। সেটা দূর করা যাচ্ছে না।"

প্রণতি ঘাড় বাঁকিয়ে, চোখ পাকিয়ে সুদীপের দিকে তাকালেন, "ফের তুই তর্ক করতে যাচ্ছিস ?"

"তর্ক নয় মা।" সুদীপ প্রণতির দিকে দু'হাত জোড় করে বাড়িয়ে ধরলো।

সৌরীন্দ্র দরজার দিকে পা বাড়ালেন, "তর্কই। ব্যাখ্যাটা নিয়ে গোলমাল কিছু নেই। গোলমাল পাকাবার চেষ্টা চলছে। তবে ওটাকে আমরা দূর করবো।"

"তুমিও আর কথা বাড়িও না।" প্রণতিও দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন।

সৌরীন্দ্র দরজার সামনে দাঁড়ালেন, "তবুও, আজ যা বলতে এসেছিলাম, আগামীকাল রাত্রের মধ্যে বলবো। টেলিফোনে একটা সময় ঠিক করে নেবো। আর—।" কথা শেষ না করে তিনি একবার প্রণতির দিকে দেখলেন। হাসলেন সুদীপের দিকে তাকিয়ে, "একটা কথা তোর কাছে আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে। আমাদের সঙ্গে তোর এত বিরোধ থাকা সত্ত্বেও, জয়তীকে তুই মেনে নিচ্ছিস কেমন করে ? জয়তীই বা তোকে সহ্য করে কেন ? এটা একটা মস্ত রহস্য।"

সুদীপ আস্তে আস্তে ঘাড় ঝাঁকালো। হাসলো, "সত্যি। কিন্তু এ রহস্যটা তোমাকে কোনোদিন বোঝাতে পারবো কি না, জানি নে।"

প্রণতি সুদীপের মুখের দিকে অনুসন্ধিৎসু চোখে তাকিয়েছিলেন। সৌরীন্দ্র মুখ ঘুরিয়ে বেরিয়ে গেলেন। প্রণতির মুখে অস্বস্তির ছায়া। তিনি ঘরের বাইরে পা বাড়ালেন, "ছুবু, দেরি করিস নে বাবা। খেতে আয়।"

উনিশশো বাষট্টি সালে, চীন-ভারত যুদ্ধের সময়, সৌরীন্দ্রর সঙ্গে সুদীপকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল। ওর বয়স তখন সতরো। রাজনৈতিক কারণে, সতরো বছর বয়সে, জেলবাস, ভারতে নতুন কোনো ঘটনা ছিল না। ব্রিটিশ আমলেও

না। স্বাধীন ভারতেও না। উনিশশো উনপঞ্চাশে, বে-আইনি ঘোষিত কমিউনিস্ট পার্টির ষোল-সতরো বছর বয়সের ছাত্ররাও গ্রেপ্তার হয়েছিল। কিন্তু উনপঞ্চাশের সঙ্গে বাষট্টির তফাত ছিল অনেক। উনপঞ্চাশে পার্টির শ্লোগান ছিল, ভারতের এ স্বাধীনতা মিথ্যা। ভারত সরকারের বিরুদ্ধে, শ্রমিক-কৃষকের নেতৃত্বে, সশস্ত্র বিপ্লব সংগঠিত করতে হবে।

পরবর্তীকালে, নকশাল আমলে, বা সাম্প্রতিক কালে, কথায় কথায় সংঘর্ষের সময় যে-পরিমাণ অস্ত্র আর বোমা ব্যবহৃত হয়, উনপঞ্চাশে তা কল্পনাই করা যেতো না। নিহতের তালিকা ছিল খুবই কিঞ্চিৎকর, আর হত্যাকারী ছিল পুলিশ। উনপঞ্চাশে ঐ বয়সের ছেলে যারা পুলিশের হাতে পড়েছিল, তখন তাদেব রক্তে এক দুরন্ত স্বপ্নাবেগেব ঢেউ। অস্ত্র বলতে তারা বোমা বানাতে শিখেছিল। কলকাতায় বাসে-ট্রামে, শিল্পাঞ্চলে কারখানার গেটে, আনাড়ির মতো কিছু বোমা ছুঁড়েছিল। তাদের কাছে অন্য আগ্নেয়াস্ত্র বলতে আর বিশেষ কিছুই ছিল না। পুলিশ এদের ধরে নিয়ে গিয়ে পিটিয়েছে। স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা করেছে।

বাষট্টিতে সে-রকম কিছু ঘটেনি। সেইজন্যই, সুদীপের গ্রেপ্তার পার্টির মধ্যে কিছুটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। পুলিশ এই মেধাবী ছেলেটির দিকে নজর রেখেছিল। কারণ সৌরীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যাযের এই ছেলেটি, ঐ বয়সেই কলেজে রাজনীতি করতো। বয়সের তুলনায় স্কুল-কলেজের শিক্ষার ক্ষেত্রে যেমন অনেক বেশি মেধার পরিচয় দিয়েছিল, তেমনি বাবার কাছ থেকে, আর বই পড়ে কমিউনিস্ট রাজনীতি সম্পর্কে তুখোড হয়ে উঠেছিল রীতিমতো। বাবাকে গুরু করে, ঐ বয়সেই মার্কসীয় তত্ত্ব চর্চা করেছে। লেনিনের মার্কস-ব্যাখ্যা, রুশ বিপ্লব ও লেনিনের নেতৃত্বের শিক্ষাব পাঠ নিয়েছে। পাঠ্য ওর বিজ্ঞান হলেও, সাহিত্য শিল্পের দিকেও ছিল ওর আকর্ষণ। রবীন্দ্রনাথ, আর তাঁর পরবর্তী কবি সাহিত্যিকদের রচনার সঙ্গেও পবিচয় ছিল। বলতে ও ব্যাখ্যা করতে পারতো ভালো। সেই কারণেই ওর দিকে পুলিশেব নজর ছিল। বাষট্টিতে গ্রেপ্তারের কাবণও ছিল সেটাই।

সৌরীন্দ্র তাঁর পিতার একমাত্র পুত্র। তাঁর আছে আরও তিন বোন, যাঁরা সকলেই বিবাহিতা, এখন জননী গৃহিণী। পিতা সূর্যমোহন ছিলেন আদর্শ গান্ধীবাদী। পেশায় ছিলেন খ্যাতনামা আইনজীবী। যৌবনে কারাবাস করেছেন কয়েকবার। চেয়েছিলেন তাঁর একমাত্র ছেলে হবে ব্যারিস্টার। সৌরীন্দ্রও যথেষ্ট মেধাবী ছিলেন। কিন্তু পিতৃভক্ত সন্তান, রাজনীতিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন অল্প বয়সেই। দীর্ঘ কারাবাসের ফাঁকে ফাঁকে ইতিহাসে এম.এ.প্রথম শ্রেণী নিয়ে

পাশ করেছিলেন। সূর্যমোহন এম. এ. পাশ করে আইন পড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। সৌরীন্দ্র সে সুযোগ পান নি। না পাবার কাবণ, একদিক থেকে রাজনীতিই।

সৌরীন্দ্র আদিতে ছিলেন গান্ধীবাদী। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভ্য। জেলের মধ্যেই ঘটেছিল তাঁর রাজনৈতিক জন্মান্তর। সেখানেই সাম্যবাদে তাঁর দীক্ষা। জেলের ভেতর চোরা পথে আসতো মার্কস্-এঙ্গেলস্-এর বই। রুশ বিপ্লব ও লেনিনের শিক্ষা। ঐ সময়েই ঘটেছিল তাঁর সব থেকে দীর্ঘ সময়ের কারাবাস। পৃথিবীব্যাপী তখন বিশ্বযুদ্ধর ঘনঘটা। তবু যতো দিন হিটলার চুক্তি লঙ্ঘন করে সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমণ করেনি, ততো দিন ভারতে ফ্যাসি-বিরোধী আন্দোলন ঠিক মতো দানা বাঁধেনি। রাশিয়া আক্রান্ত হওয়া মাত্রই, দিকে দিকে জনযুদ্ধের ডাক পড়েছিল। বৃটিশ সরকারের সঙ্গে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সমঝোতা হয়ে গিয়েছিল। কমিউনিস্টরা দলে দলে বেরিয়ে এসেছিল জেল থেকে। গান্ধীও অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে। কিন্তু বৃটিশের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়বেন কেন? স্বাধীন ভারতীয় হিসাবেই লড়বেন। আগে চাই স্বাধীনতা। নয় তো, লড়েঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে। কমিউস্টরা জেল থেকে বেরিয়ে আসছিল। কংগ্রেস আর তার অনুগামী দলের লোকেরা বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলন করে জেলে যাচ্ছিল।

সৌরীন্দ্র জেল থেকে বেরিয়ে এসে দেখেছিলেন, তাঁর বাবা সূর্যমোহন গৃহে অন্তরীণ। কোর্টে যেতে পারছেন না। একটা আশঙ্কা ছিল, পিতাপুত্রের রাজনৈতিক মতাদর্শগত বিরোধ নিয়ে, পরস্পরের মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি হবে। কিন্তু সূর্যমোহন সৌরীন্দ্রকে তাঁর রাজনীতির বিষয়ে কোনো কথাই বলেননি। সৌরীন্দ্র জেল থেকে বাড়ি এসে যখন সূর্যমোহনকে প্রণাম করেছিলেন, সূর্যমোহন খুবই কুণ্ঠিত লজ্জায় বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলেন। সৌরীন্দ্র অত্যন্ত অবাক হয়েছিলেন। বিভ্রান্তিও বোধ করেছিলেন। কারণ পুত্রস্নেহাসক্ত সূর্যমোহনের চরিত্রের সঙ্গে তাঁর ওরকম আচরণ বিশেষ অসঙ্গতিপূর্ণ মনে হয়েছিল। সৌরীন্দ্রর প্রণাম তিনি বরাবর প্রসন্ন আশীর্বাদের দ্বারা গ্রহণ করেছেন। প্রণামের পর সর্বদা মাথায় পিঠে হাত স্পর্শ করতেন। বিয়াল্লিশ সালের মার্চ মাসে, দীর্ঘকাল অদর্শনের পরে, সৌরীন্দ্রর প্রণামে, তাঁর কুণ্ঠিত লজ্জায় বাধা দেওয়াটা, কেবল বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল না, সৌরীন্দ্র মনে আঘাত পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি হেসেই বলেছিলেন, "আপনি কি আমাকে অস্পৃশ্য মনে করছেন নাকি?"

"অস্পৃশ্য?" সূর্যমোহন সৌরীন্দ্রর দিকে তাকিয়ে হেসেছিলেন। অন্তরীণ

ছিলেন বলেই, সেই সময়ে তিনি দাড়ি কামাননি। মাথা নেড়ে প্রসন্ন গম্ভীর স্বরে বলেছিলেন, "অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধেই তো চিরকাল আছি। ঐ মহাপাপের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম। তোমার তো তা অজানা থাকবার কথা নয়।"

সৌরীন্দ্রও হেসেছিলেন, "ওটাকে তো আমিও ঘৃণা করি। ও নিয়ে আপনার সঙ্গে আমার বিরোধ নেই। কিন্তু আমার প্রণামটা নিতে যেন আপনি স্বস্তি বোধ করলেন না?"

"তা অবিশ্যি করিনি।" সূর্যমোহনের কাঁচা-পাকা গোঁফদাড়ির ভাঁজে ছিল প্রসন্ন হাসির কিরণ। তাঁর স্বর, সুরও ছিল বেশ অনায়াস, "কিন্তু মন-প্রাণ থেকে আমার সমস্ত স্নেহ আশীর্বাদ তোমাকে উজাড় করে দিচ্ছি। এবার তুমি অনেকগুলো বছর জেলে কাটিয়ে এলে। আমরা সবাই বড় অশান্তিতে কাটিয়েছি। বিশেষ করে তোমার মা। তোমার বোনের বিয়েতে তোমাকে একবার মাত্র প্যারোলে তিন ঘণ্টার জন্য আসতে দিয়েছিল। যাই হোক, শরীর মন সব ভালো আছে তো?"

সৌরীন্দ্র মূঢ় নন। তাঁর আসল কথাটাই সূর্যমোহন এড়িয়ে গিয়েছিলেন, সেটা খুবই স্পষ্ট ছিল। শরীর-মনের প্রশ্নও ছিল অবান্তর। জেল থেকে প্রতিটি পত্রেই সে-সংবাদ থাকতো। মন-প্রাণ থেকে উজাড করে দেওয়া সমস্ত স্নেহ আশীর্বাদের কথা মিথ্যা ছিল না। অতএব তিনি হেসেই বলেছিলেন, "আপনি তো এত অস্পষ্ট কথার মানুষ নন। আমার কথার জবাবটাই যে দিলেন না?"

"তা দিইনি, সত্যি।" সূর্যমোহনের মুখে ছিল সেই একই হাসির কিরণ। তবে তাঁর গলার স্বরে ছিল ঈষৎ বিব্রত সুর, "পাছে তুমি ভাবো, তোমার রাজনৈতিক মতবাদ সম্পর্কে আমি সমালোচনা করছি। মনে মনে কিন্তু আমি নবজাতককে স্বাগতই জানাচ্ছি। তবে, আমি তোমার কাছ থেকে প্রাচীন ভারতীয় রীতিনীতি মেনে পায়ে হাত দিয়ে, প্রণাম করাটা আশা করিনি। আমার মনে হয়েছে, ওটা তোমার আদর্শের বিরোধী। অস্বস্তিটা সেই কারণেই। আর তোমার নিজের যদি সত্যি বিশ্বাস থাকে, ওটা তোমার আদর্শের বিরোধী নয়, তা হলে বলতে হবে, আমারই বুঝতে ভুল হয়েছে।"

সৌরীন্দ্র নিজেই একটা ধন্দের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন। রাজনৈতিক মতামত যে কেবল রাজনীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, সে-বোধ তাঁর ছিল। তার মধ্যে একটা গভীর ধ্যান জ্ঞান বিশ্বাসের বিষয়ও আছে। তাঁর সাম্যবাদের সঙ্গে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের যে বৈজ্ঞানিক সম্পর্ক বর্তমান, তা ভাববাদের ঘোরতর বিরোধী। ঈশ্বর ও অধ্যাত্ম ভাবনার পরিপন্থী। কিন্তু তার সঙ্গে পায়ে হাত দিয়ে প্রণামের সম্পর্কটা, সহসা বিচার করে উঠতে পারেননি। সৌরীন্দ্রর মনে ছিল, মা দিদিদের

সঙ্গে, দেখা-সাক্ষাতের পর্ব শেষ করে, তিনি পিতার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। দুজনের কথা বলবার অবকাশ ছিল। তিনি সূর্যমোহনের দিকে তাকিয়ে বিনীত হেসেছিলেন, "অনেক দিন পরে দেখা হলে, আপনাকে তো আমি বরাবর প্রণামই করেছি। বাবাকে প্রণাম করা ছাড়া আর কী করা যায়, সে-কথা তো আমি ভাবিনি।"

"সে তো তুমি ছেলেবেলায় ইস্কুলে পরীক্ষা দিতে যাবার সময়েও আমাকে, তোমার মাকে, ঠাকুমাকে প্রণাম করে যেতে।" সূর্যমোহনের চোখে ছিল প্রসন্ন কৌতুকের ছটা, "সামাজিক কারণে বা অল্প দিনের জন্য কোথাও যেতে আসতে হলেও প্রণাম করতে। আমি অবিশ্যি এখনও তাতে কোনো আপত্তির কারণ দেখতে পাইনি। কিন্তু তোমার নতুন মতবাদ আর আদর্শের সঙ্গে এর কোনো বিরোধ নেই তো?"

সৌরীন্দ্র অস্বস্তিতে হেসেছিলেন, "থাকলেও সেটা আমি ভেবে দেখিনি। আমার নতুন ধ্যান-ধারণায় গলদ থাকতে পারে। তবে আসল কথা হল, আপনাকে প্রণাম না করলে আমার মন যে অশান্তিতে ভরে উঠতো।"

"হয়তো তুমি সে-সংস্কারটা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারোনি!" সূর্যমোহন সৌরীন্দ্রর হাত ধরে, তাঁর পাশের চেয়ারে বসিয়ে দিয়েছিলেন, "তবে মনের শান্তিটা বড় কথা। এ নিয়ে আর কথা চলে না।"

সৌরীন্দ্রর অবিশ্যি পরে মনে হয়েছিল, পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করার মধ্যে একটা ভাববাদী চেতনা আছে। একটা রিলিজিয়াস মানসিকতা এর মধ্যে কাজ করে। এবং তিনি আবিষ্কার করেছিলেন, সূর্যমোহন অকারণে তাঁকে ওসব কথা বলেননি। তিনিও মার্কস্-এঙ্গেলস্-এর রচনা পাঠ করেছিলেন। কিন্তু সে-কথা নিজে থেকে কখনও বলেননি। জানাতেও চাননি। তাঁর জিজ্ঞাসু মন যা জানতে চেয়েছিল, জেনেছিলেন। যা তাঁর গ্রহণযোগ্য না, তা গ্রহণ করেননি। অথচ নবজাতককে তিনি স্বাগত জানিয়েছিলেন। অন্তত মুখে তা-ই বলেছিলেন। সেটা কতোখানি অন্তরের কথা, সৌরীন্দ্রর মনে মনে সন্দিগ্ধ জিজ্ঞাসা জেগেছিল। এবং সে-কথা তিনি পরে না জিজ্ঞেস করে পারেননি। "সত্যি কি আপনি নবজাতককে স্বাগত জানাতে পেরেছেন?"

"মিথ্যে বলবো কেন?" সূর্যমোহন অবাক চোখে সৌরীন্দ্রর মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন।

সৌরীন্দ্রর চোখে, মুখের হাসিতে, কেমন একটি প্রচ্ছন্ন অবিশ্বাস ছিল, "নবজাতকের রাজনৈতিক আদর্শের সঙ্গে আপনার তো কোনো মিল নেই।"

"তা তো নিশ্চয়ই নেই।" সূর্যমোহনের গোঁফদাড়ির ভাঁজে প্রসন্ন হাসির

কিরণ ছিল, "তোমরা জেল খালি করে বেরিয়ে আসছো, সেখানে আমাদের লোকদের নিয়ে গিয়ে ভরতি করা হচ্ছে। ইংরেজদের সঙ্গে তোমাদের বোঝাপড়া হয়েছে, কারণ ওটা তোমাদের পার্টির আন্তর্জাতিক নির্দেশ। একসিসদের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য এখন এটাই তোমাদের আদর্শ। আমাদের ওরকম কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থা নেই। বিদেশের নীতির দ্বারা আমরা চালিত হইনে। তোমাদের নীতিকে আমরা বিশ্বাস করিনে। তোমরা তাই আমাদেরও গালাগালি করছো। সেটাও তোমাদের আদর্শের মধ্যেই পড়ে। তোমার আমার মধ্যে বিবোধ থাকতে পারে, কিন্তু আমি তা বলে তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে যাবো নাকি ? আদর্শ আব বিশ্বাস মতো তোমার কাজ করার অধিকার আছে, সেটা আমি মানি। মানি বলেই বলেছি, নবজাতককে স্বাগত জানাই। ওটাও আমার আদর্শ। তা বলে কি আমি তোমার মতবাদে বা আদর্শে বিশ্বাস করি ? কখনোই না।"

সূর্যমোহন ঘাড় নেড়েছিলেন। তাঁর স্বরে ছিল দৃঢ়তা। কিন্তু মুখের হাসি মুছে যায় নি। সৌরীন্দ্রর চোখে তখনও সন্দেহ ছিল। তিনি সূর্যমোহনের মুখের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো শুনেছিলেন। মনে হয়েছিল, তাঁর কথার মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে কিছু অসঙ্গতি রয়েছে। অথবা তিনি মনের কথা খুলে বলছিলেন না। যাকে তিনি স্বাগত জানান, অথচ তার মতবাদে আদর্শে আদৌ বিশ্বাস নেই। কিন্তু সৌরীন্দ্রর অধিকারকে তিনি মেনে নিয়েছিলেন। সৌরীন্দ্রর পক্ষে তেমন ভাবা অসম্ভব ছিল। যাঁর সঙ্গে তাঁর মতের মিল নেই, তাঁকে তিনি মেনে নেবেন কেমন করে ? যে-গান্ধীবাদকে আদর্শ করে তিনি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, সেই গান্ধীর নীতির সঙ্গে তখন তাঁর ঘোরতর বিরোধ। সেই বিরোধে তিনি আজ পর্যন্ত অটল। অথচ সূর্যমোহনের স্ববিরোধিতা তিনি বুঝে উঠতে পারছিলেন না। তিনি নবজাতককে স্বাগত জানিয়েছিলেন। জেনে শুনেই, যে নবজাতকের মতবাদ বা আদর্শে তিনি ঘোরতর অবিশ্বাসী। এবং সৌরীন্দ্র নিজের মনের অবস্থা প্রকাশ না করে পারেননি, "আমার আদর্শ আর বিশ্বাস মতো কাজ করার অধিকারকে মেনে নিচ্ছেন, অথচ সেই মতবাদ বা আদর্শের ওপর আপনার আদৌ বিশ্বাস নেই, এ তো যেন আপনি নিজেই নিজের কথার বিরোধিতা করছেন।"

"না ভানু, (সৌরীন্দ্রর ডাকনাম) তা না।" সূর্যমোহনের মুখের হাসি, গলার স্বর একরকমই ছিল, "তুমি যাকে স্ববিরোধিতা মনে করছো, আসলে সেটা পরমতসহিষ্ণুতা। পরমতসহিষ্ণুতার অনেক রকম অর্থ তুমি বা তোমরা করতে পারো। ভীরুতা, কাপুরুষতা, স্ববিরোধিতা—যা খুশি। কিন্তু পরমতসহিষ্ণুতার অর্থ এই নয়, সেই মতকে মেনে নেওয়া হচ্ছে। সহিষ্ণুতার মধ্যেই শক্তি আছে।

এ শিক্ষা আমরা পেয়েছি। বিশ্বাসও করি। গান্ধীজী নিজেই এটা জানতেন, কখন অসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়ে তিনি ভুল করেছেন। তার জন্যে তাঁকে অনেক মাশুল দিতে হয়েছে।"

সৌরীন্দ্রও হেসেছিলেন। প্রকৃত নবজাতকের হাসি। কারণ তাঁর হাসির মধ্যে ছিল প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের বক্রতা, "পরমতসহিষ্ণুতাই যদি আপনাদের নীতি হয়, তবে সারা পৃথিবীর এমন দুঃসময়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে গেলেন কেন ? বিপদ তো কেবল রাশিয়ার নয়। সারা পৃথিবীর। শত্রুরা পৃথিবীর সব দুঃখী দরিদ্র শ্রেণীর শত্রু। ভারতেরও বিপদ তার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। সেই বিপদ এগিয়েও আসছে। ইংরেজরা সেই বিপদের বিরুদ্ধে লডছে। এ সময়ে তাদের বিরোধিতা করা, দেশের মধ্যে বিশৃংখলা, বাধার সৃষ্টি করা কি উচিত হচ্ছে ?"

"তার জন্যে তোমাদের যা বলবার, তা তো বলেই যাচ্ছো।" সূর্যমোহনেব স্বর শান্ত প্রসন্নই ছিল, "কিন্তু আমি দেখছি, পরমতসহিষ্ণুতার কথাটা তুমি তোমার মতো করেই নিলে। সহিষ্ণুতা আত্মসমর্পণ নয়। মেনে নেওয়াও নয়। তোমার পক্ষে এ কথাটা আজ বিশ্বাস করা কঠিন, আমি বুঝতে পারছি ভানু। তবু আমি তোমাকে কোনো উপদেশ বা পরামর্শ দিতে যাবো না। তুমি তোমার পথে চলো। আমি আমার পথে চলি।"

সৌরীন্দ্র সজোরে ঘাড় নেড়েছিলেন. "না, এত সহজে সব কিছু হয় না। আমি আমার পথে চলবো, আর আপনি আপনার পথে চলবেন, অথচ আমাদের মধ্যে কোনো সংঘর্ষ হবে না, তা কী করে হয় ?"

"তা হলে সংঘর্ষ কর।" সূর্যমোহন হেসে উঠেছিলেন, "আমরা এখন তোমাদের কাছে বিশ্বাসঘাতক, দেশের শত্রু, পঞ্চমবাহিনী। পুলিশের কাছে আমাদের ধরিয়ে দিচ্ছো। তোমাদেব কাজ তোমরা করে যাও। আমাদের কাজ আমরা করি।"

সৌরীন্দ্রর স্বরে প্রতিবাদের ঝাঁজ ফুটে উঠেছিল। "কাদের ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, সেটা কিন্তু বললেন না। এটা নিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যে কুৎসা রটনা করা হচ্ছে।"

"মিথ্যে কুৎসা রটনা করা যাদের স্বভাব, তারা তা করবেই।" সৌরীন্দ্রর প্রতিবাদের ঝাঁজের জবাবে, সূর্যমোহনের সামান্য ধৈর্যচ্যুতিও ঘটেনি, "তোমরা তাতে দমবে কেন ? যাদের ধরিয়ে দিলে তোমাদের কাছে দেশের মঙ্গল করা মনে হবে, তাদের তো নিশ্চয় ধরিয়ে দেবে। তোমার কর্তব্য থেকে তুমি বিচ্যুত হবে কেন ?"

সৌরীন্দ্র বুঝেছিলেন, সূর্যমোহন কোনো তর্কেও আসতে চান না। তিনি তাঁর

নিজের বিশ্বাসে এমনই অটল, নির্বিকার, কোনো যুক্তিতেই তিনি বিচলিত হতেন না। তবু সৌরীন্দ্র শেষ পর্যন্ত বুঝিয়ে দিতে ছাড়েননি, "কুৎসা রটনার বিষয়ে, আমি আসলে আপনার মিথ্যে ধারণার প্রতিবাদই করতে চেয়েছিলাম। আসলে যা রটানো হচ্ছে, আমরা ধরিয়ে দিচ্ছি, সেটা সত্যি নয়। পুলিশ আর গোয়েন্দাবিভাগই যাদের ধরবার ধরছে। আমাদের তাতে পূর্ণ সমর্থন আছে। হয় তো আমাদের কেউ কেউ শত্রুদের সম্পর্কে একেবারে চুপচাপ থাকতে পারে না।"

"আমি তো তোমার কোনো কথারই প্রতিবাদ করছিনে।" সূর্যমোহনের স্বরে, অভিব্যক্তিতে, কোথাও অপ্রসন্নতার কাঠিন্য নেমে আসে নি। "তুমি আমি আমরা কেউ মায়ের দুয়ারে হত্যে দিয়ে পড়ে থাকতে আসিনি। ওটা ভক্তির লক্ষণ নয়। আসল বিশ্বাসটা আছে সেই গানে, 'তোমার কর্ম তুমি কর মা, আমার কর্ম আমি করি।' মিছে কেন আমার দুর্গতির জন্য আর একজনকে দায়ী করি? তবে হ্যাঁ, মায়ের ভক্তের অন্তরে একটা বিশ্বাস আছে। পুরুষকারের সঙ্গে দৈবের যে যোগাযোগ, সেটাকে স্বীকার করে বলেই মা'কে উদ্দেশ করে তার ঐ গান।" বলতে বলতে তিনি নিজেই কৌতুক করে হেসে উঠেছিলেন। তাকিয়েছিলেন সৌরীন্দ্রর বক্র হাসিমুখের দিকে, "ভারতের এই প্রাচীন বিশ্বাসটার মধ্যে তুমি একটা রিলিজিয়নের ধাপ্পার গন্ধ পাচ্ছো তো? আমার কিছু করার নেই ভানু। ওতেই আমি আছি।"

সৌরীন্দ্র হেসেছিলেন, "আপনি কিসে আছেন তা আমি জানি। ওখানটায় আমিও তো ছিলাম। তবে এখন ঐ বিপজ্জনক জায়গাটা থেকে মুক্তি পেয়েছি। আধা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান থেকে আধা বস্তুবাদী হওয়াটা বড় বিপজ্জনক। ঐ অর্ধেকটার বাইরে যা তারা দেখতে পায় না, সেটাকেই বলে দেয়, অজ্ঞাবাদ। এ্যাগনোস্টিসিজম।"

"কার বিষয়ে তুমি এসব কথা বলছো?" সূর্যমোহনের হাসিমুখে ছিল কৌতুকের ভ্রুকুটি, "গান্ধীজীর সম্পর্কে তুমি যদি ওরকম একটা বোঝা চাপাতে চাও, তা হলে ভুলই করবে। তিনি বস্তুবাদী নন। অজ্ঞাবাদেও তিনি বিশ্বাসী নন। তিনি কেন অকারণে এ দুয়ের মধ্যে ছুটোছুটি করবেন? তার চেয়ে, তুমি তোমার আসল কথাটাই বলতে পারতে। 'দার্শনিকেরা কেবল নানাভাবে জগতটাকে ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু আসল কথা যে তাকে পরিবর্তন করা, সেটা ভাবেননি।' তোমাদের মতের সঙ্গে না মিললেও, গান্ধীজীর মূল তত্ত্বও জগতের পরিবর্তন সাধন। তাঁর ঘোরতর শত্রুও বলবে না, তিনি ভারতবাসীকে ধর্মের আফিম গেলাতে চেয়েছেন। তবে হ্যাঁ, অহিংসা, অনশন, এসব তোমাদের কাছে

খুবই বিপজ্জনক। কিন্তু ওসবের সঙ্গে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। মানে রিলিজিয়নের। যাক, ভানু, অনেক কথা বলে ফেলেছি, আর নয়। তোমার কলেজের চাকরিটা কেমন হল, সে-বিষয়ে কিন্তু কিছুই শোনা হয়নি।"

উনিশশো বিয়াল্লিশ অতিক্রান্ত হয়ে যাবার পরে, তেতাল্লিশে কলকাতায় জাপানী বোমার ভয় জেগে উঠেছিল। সৌরীন্দ্র একটি কলেজে চাকরি পেয়েছিলেন। সেই সঙ্গে ফ্যাসিবিরোধী নানা আন্দোলনের নেতৃত্বেও ছিলেন। তা ছাড়া, কর্পোরেশন শ্রমিক ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা, আবার রেল শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যেও তিনি জড়িয়ে পড়ছিলেন। কর্পোরেশন বা রেল, এক সঙ্গে চলতে পারে না, তিনিও জানতেন। কিন্তু প্রথম দিকে, দুদিকেই তিনি, বিশেষ করে, ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, শ্রমিকদের নিজস্ব দাবী-দাওযার ন্যায় অধিকারের জন্য লড়ছিলেন। বিশেষ করে, কলকাতা কিছুটা খালি হতে থাকলেও, নতুন বিপদ ঘনিয়ে আসছিল, খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি, বাজার থেকে তার অন্তর্ধান।

সূর্যমোহনকে সৌরীন্দ্র তাঁর কলেজের চাকরির বিষয়টি—বেতনক্রম ইত্যাদির কথা বলেছিলেন। সাংসারিক কথার মধ্যে তাঁদের পরস্পরের কোনো বিরোধ ছিল না। সৌরীন্দ্রর দুই দিদি ও ছোট বোনের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। সৌরীন্দ্রর বয়স তখন ত্রিশ। দীর্ঘকাল একটানা কারাবাসের জন্যই তাঁর বিয়ে করা হয়ে ওঠেনি। জেল থেকে ফিরে আসা মাত্রই, তাঁর মা তো বিশেষভাবে ব্যস্ত হয়েছিলেনই। সূর্যমোহনও মনে মনে বিশেষ ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন। সেই সময়ে, ছেলেদের ত্রিশ বছরেও অবিবাহিত থাকাটা খুবই অযৌক্তিক ছিল। তুলনায়, বয়সটাও অনেক বেশি বিবেচিত হতো।

যাঁরা বিয়ে করবেন না মনস্থ করতেন, তাঁদের কথা আলাদা। সৌরীন্দ্র তাঁর শরীর-মন সব দিক থেকেই বিবাহেচ্ছু ছিলেন। কিন্তু শুধু মায়ের উপরোধেই বিয়েটা ঘটে ওঠা সম্ভব ছিল না। এই একটি বিষয়ে, সৌরীন্দ্রকে মেনে নিতে হয়েছিল, সূর্যমোহন তখন পর্যন্ত পিতা, গৃহকর্তা। মায়ের ব্যাকুলতার সঙ্গে বাবার উদ্যোগ না থাকলে, সেটা সম্ভব ছিল না। তিনি জানতেন, মা প্রায় রোজই বাবার কাছে গিয়ে তাঁর বিবাহের বিষয়ে কথা বলতেন। সূর্যমোহন মনে মনে যথেষ্ট ব্যস্ত হলেও, আসল কথাটা খুলে বলতে পারছিলেন না। সৌরীন্দ্র তা অনুমান করেছিলেন এবং একটি চাকরির জন্য উঠেপড়ে লেগেছিলেন।

সৌরীন্দ্রর চাকরি প্রাপ্তির কথা শুনেই, সূর্যমোহন যেন গভীর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিলেন, "এবার তা হলে আর দেরি করা চলে না। আমি আর তোমার মা, দুজনেই খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। তোমার বিয়ে হওয়াটা বিশেষ প্রয়োজন।

তোমার কোনো আপত্তি নেই তো ?"

সৌরীন্দ্র সলজ্জ হেসে মাথা নেড়েছিলেন, "স্বাভাবিক জীবনযাপনই আমার আদর্শ।"

"খুব ভালো কথা।" সূর্যমোহন ঘাড় ঝাঁকিয়ে হেসেছিলেন। জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়েছিলেন সৌরীন্দ্রর চোখের দিকে, "তোমার বিয়ের জন্য আমরা কি কন্যা দেখতে পারি ?"

সূর্যমোহনের কথা শুনে সৌরীন্দ্র প্রথমে একটু অবাক ও বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। পর মুহূর্তেই তিনি পিতার প্রশ্নের অন্তর্নিহিত অর্থটি বুঝতে পেরেছিলেন। পেরে, আগের মতোই সলজ্জ হেসেছিলেন। সূর্যমোহন স্পষ্টই জানতে চেয়েছিলেন, সৌরীন্দ্রর নিজের পছন্দ মতো কোনো কন্যা ছিল কি না। যার সম্যক্ অর্থ, সৌরীন্দ্রর কোনো প্রেমপাত্রী ছিলেন কি না। ছিলেন না। যে-বয়সটা পর্যন্ত তিনি জেলে কাটিয়ে এসেছিলেন, তারপরে আর জেলের বাইরে এসে, প্রেমে পড়বার অবকাশ পাননি। নতুন ছাত্র আন্দোলনকে কেন্দ্র করে, পার্টিতে তখন যে-রকম প্রেমপর্ব শুরু হয়েছিল, সেখানে তিনি নিজেকে বেমানান দেখেছিলেন। নিতান্ত ঠাট্টাচ্ছলেই তিনি সূর্যমোহনকে পাল্টা প্রশ্ন করেছিলেন, "আমার ইচ্ছে মতো পাত্রীকে কি আপনি আপনার ঘরে বিয়ে দিয়ে নিয়ে আসবেন ?"

"তোমার ইচ্ছে মতো পাত্রীকে আবার বিয়ে দিয়ে নিয়ে আসবো কেন ?" সূর্যমোহনও হেসেছিলেন, "সে পাত্রীকে তুমি বিয়ে করে সংসার পাতবে।"

সৌরীন্দ্র আরও একটু কৌতুক করেছিলেন, "আপনার বাড়িতে আমরা আশ্রয় পাবো তো ?"

"ব্যভিচারের কোনো ঘটনা না থাকলে, নিশ্চয়ই পাবে।" সূর্যমোহনের স্বরে দৃঢ়তা ছিল।

সৌরীন্দ্র যেন একটি তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করেছিলেন, "কর্পোরেশনের কোনো শ্রমিক মেয়েকে কি আপনি পুত্রবধূ হিসাবে মেনে নিতে পারবেন ?"

"ভানু, ও কথা বলে তুমি আমাকে হারাতে পারবে না।" সূর্যমোহনের মুখ হাসির ছটায় ভরে উঠেছিল, "কথাটা যদি আমার আদর্শকে বিদ্রূপ করার জন্যে বলে থাকো, তা হলে খুবই ভুল করেছো। তুমি মেথরানী ঝাড়ুদারনীকে বিয়ে করলে, তোমার মা হয়তো এ বাড়ি ছেড়ে যাবেন। অথবা গলায় দড়ি দেবেন। আমি একটুও আপত্তি করবো না। ওতে তোমার থেকে আমার সম্মান কিছুমাত্র কমবে না। তবে আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে, তুমি সত্যি কথা বলছো না। অমন অযৌক্তিক কাজ তুমি করতে যাবে কেন ?"

সৌরীন্দ্র ভ্রূকুটি অবাক চোখে তাকিয়েছিলেন, "অযৌক্তিক ?"

"নয় ?" সূর্যমোহনের চোখে অবিশ্বাস ও মুখে সেই হাসির ছটাই ছিল, "তুমি জেল থেকে উপবীত ত্যাগ করে এসেছো, সেটা বুঝতে পারি। ওখানে তোমার সঙ্গে আমার একটুও বিরোধ নেই। কিন্তু তুমি এম.এ.পাশ-করা মধ্যবিত্ত বাড়ির ছেলে। চাকরি করছো কলেজে। হঠাৎ একটি কর্পোরেশনের শ্রমিক মেয়েকে তুমি দয়া দেখিয়ে এ ঘরে নিয়ে আসবে কেন ? সে বেচারিই বা তা আসতে চাইবে কেন ?"

সৌরীন্দ্র হেসে উঠেছিলেন। বুঝেছিলেন, সূর্যমোহনের সঙ্গে ও বিষয়ে তর্ক করে সুবিধা হবে না। তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁর বিয়ের জন্য কন্যা বাবা মা-ই দেখুন। দেখা আসলে হয়েই গিয়েছিল। কেবল তাঁর একটা চাকরি না হওয়া পর্যন্ত, সূর্যমোহন অগ্রসর হতে পারছিলেন না। ভবানীপুরের মুখোপাধ্যায় পরিবারের কন্যা প্রণতিকে দেখে, প্রথম দর্শনেই সৌরীন্দ্র বিবাহে সম্মতি দিয়েছিলেন। প্রণতি লেখাপড়ায় একেবারে পেছিয়ে ছিলেন না। তবে ম্যাট্রিক পরীক্ষা তাঁর দিয়ে ওঠা হয়নি।

সৌরীন্দ্রর বিবাহের পরেই সূর্যমোহন ঘোষণা করেছিলেন. তাঁর পক্ষে ঐভাবে গৃহে অন্তরীণ থাকা আর সম্ভব হচ্ছে না। তাঁর বন্ধুরা এবং নেতারা যখন কারাবাস করছেন, তখন গৃহে অন্তরীণ থেকে সংসারেব সমস্ত সুখভোগের মধ্যে তিনি জীবনযাপন করছিলেন। অতএব, গৃহে অন্তরীণ থেকেও, তিনি মৌনব্রত অবলম্বন করেছিলেন। দোতলার ঘর ত্যাগ কবে, নিচের তলায় তাঁর অফিস ঘরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ভিতর বাড়িতে খেতে যেতেন না। নিরামিষ খাওয়া শুরু করেছিলেন। তিনি কখনও কোনো ধর্মীয় গুরুর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেননি। অতএব তাঁর জীবনে সন্ধ্যা-আহ্নিকের কোনো প্রশ্নও ছিল না। সুতা ও চরকা কাটা, দুবেলা নিঃশব্দে প্রার্থনা, বৌদ্ধ রচনা পাঠ আর বাগানে ভোরে সন্ধ্যায় বেড়ানো, এই তাঁর প্রাত্যহিকতায় দাঁড়িয়েছিল। তাঁর স্ত্রী, সৌরীন্দ্রর মা বসুন্ধরাও স্বামীর অনুগামিনী হয়েছিলেন। তবে মৌনব্রত তিনি গ্রহণ করতে পারেন নি। চরকা কাটতেন। স্বামীর নিরামিষ রান্না তিনি নিজের হাতে করতেন। স্বামীর আহারের পর নিজেও নিরামিষ খেতেন। এবং নিচের অফিস ঘরে স্বামীর সঙ্গে না থাকলেও, দোতলায় তিনি তাঁর খাটের শয্যা ত্যাগ করেছিলেন। বৌদ্ধ সাহিত্য বা ভাগবত তিনি যথার্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারতেন না। রামায়ণ পাঠ করতেন। একই সংসারে তখন দুই চিত্র।

এ সবই হল সুদীপের জন্মের পূর্বের ঘটনা। মা প্রণতির কাছে ও ছেলেবেলায় শুনেছে বাবার কথা। কিন্তু পিতামহ সূর্যমোহনের বেশির ভাগ কথাই শুনেছে বাবার কাছে। অবিশ্যি সৌরীন্দ্র নিজেও সুদীপকে শুনিয়েছেন তাঁর নিজের বিষয়ে। মায়ের কাছে ও প্রধানত শুনেছে, অল্প বয়স থেকে বাবার দীর্ঘকাল কারাবাসের কথা। কিন্তু সৌরীন্দ্রর স্বাধীন ভারতে কারাবাস ছাড়া, পরাধীন ভারতে কারাবাসের সময় প্রণতি এ সংসারে আসেননি। স্বামীর কাছ থেকে যা শুনেছেন তাই শুনিয়েছেন তাঁর প্রথম সন্তানকে।

সৌরীন্দ্র তাঁর পিতা সূর্যমোহনকে মনে করতেন, ব্যক্তিটি ছিলেন নির্লোভী সৎ। সন্তান-সংসারের প্রতি কর্তব্যপরায়ণ। এমন কি, দেওয়ানি আইন সম্পর্কেও তিনি ছিলেন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বিচক্ষণ আইনজীবী কিন্তু গান্ধীবাদে বিশ্বাসের দরুনই, তিনি মনে প্রাণে ছিলেন আস্তিক, ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী, ভাববাদী আদর্শের প্রেরণায় প্রাচীন এক কল্পজগতের মানুষ। তাঁর নীতিবোধের মধ্যেও ছিল এমন একটা নিষ্ঠাপরায়ণতা, আইনজীবী হিসাবে ফৌজদারি মামলার মধ্যেও পেতেন একটা অশুচিতার গন্ধ। তিনি তাঁর কোনো কাজের দ্বারা মানুষের ক্ষতি সাধনের কথা চিন্তা করতে পারতেন না। অথচ একটি মানুষের ধ্যান-ধারণা, জগত-সংসারকে দেখার সমস্ত মূলটাই ছিল এমন অবৈজ্ঞানিক, আর তার ফলে, তাঁর সমস্ত সততার ভিতটাই যে ছিল মিথ্যা, তা কিছুতেই বুঝতেন না।

সৌরীন্দ্র সুদীপকে যখন সূর্যমোহনের চরিত্র ব্যাখ্যা করতেন, তখন তিনি খাঁটি প্রলেতারিয় মার্কসীয় নাস্তিকতার একজন তাত্ত্বিক হিসাবেই করতেন। বুঝিয়ে দিতে চাইতেন, নিজের পিতাকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে অশ্রদ্ধেয় বা ছোট মনে করতেন না। কিন্তু ঈশ্বরবিশ্বাসী ভাববাদী পিতাকে বোঝানো কঠিন ছিল, নাস্তিকতাই হল প্রগতিশীল শ্রেণীগুলোর পক্ষে লাক্ষণিক। অথচ উনি পরমতসহিষ্ণুতার নামে নিজেকে ভীষণ উদারপন্থী বলে মনে করতেন। প্রণামের ব্যাপারে তাঁর কুণ্ঠাবোধে সেই প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল। সৌরীন্দ্র সেটাকে নিতান্তই একটা সামাজিক লৌকিকতা বলে মনে করতেন। অবিশ্যি এ ধরনের লৌকিকতার মধ্যেও একটা ভাববাদী মানসিকতা কাজ করে। আর, সৌরীন্দ্রর পক্ষে উপায় ছিল না, সমস্ত লৌকিক বিষয়ের বিরুদ্ধেই তিনি মাথা তুলে দাঁড়াবেন। যে-কারণে, সূর্যমোহন তাঁকে বেশ একটু বেকায়দায় ফেলেছিলেন বিয়ের সময়ে। কন্যা পছন্দ অপছন্দের পরেই তাঁর জিজ্ঞাসা ছিল, "কী প্রথায় বিয়েটা করবে, কিছু ভেবেছো?"

"আপনি কোন্ প্রথার পক্ষপাতী?" সৌরীন্দ্রর চোখের দৃষ্টিতে, গলার স্বরে, হাসির মধ্যেও বিরক্তি একেবারে চাপা থাকেনি।

সূর্যমোহন হেসে মাথা নেড়েছিলেন, "আমার পক্ষপাতের কোনো প্রশ্নই নেই। কন্যা পছন্দের ব্যাপারে তুমি যেমন আমাকে বলেছিলে, আমিও সেইরকমই জিজ্ঞেস করছি। তুমি যাঁদের বৈজ্ঞানিক সমাজতত্ত্বে বিশ্বাসী, তাঁরা চার্চের বিয়েকে ধর্মীয় গোঁড়ামি বলে মনে করতেন। নাস্তিকের চোখে বিয়ের কী সংজ্ঞা, আমার জানা নেই।"

"নাস্তিক বলতে, আপনি কী বুঝেছেন, জানি নে।" সৌরীন্দ্রর ঠোঁটে ছিল বক্র হাসি, "যে ধর্মের বিবোধিতা করে, সে নাস্তিক। কথাটা ঠিক। কিন্তু আপনার পুরনো ধ্যান-ধারণা থেকে ধরেই নিচ্ছেন, নাস্তিক মানে সর্বাংশে অবিশ্বাসী। অথচ ব্যাপারটা আসলে একেবারে উল্‌টো। নাস্তিকেব দৃষ্টি কোনোরকম অপার্থিব অসত্য অবৈজ্ঞানিক আবর্জনা দিয়ে ঢাকা নয়। এ ক্ষেত্রে নাস্তিকতা একটা বিশেষ তত্ত্বাশ্রয়ী। একটা বিশেষ তত্ত্বে বিশ্বাসী। যে-তত্ত্ব থেকে তার আদর্শ আর সংগ্রামের নীতি আর পথগুলো আবিষ্কার করা হয়েছে—"

সূর্যমোহন হাত তুলে সৌরীন্দ্রকে বাধা দিয়েছিলেন, "তোমার এত বিশদ ব্যাখ্যা আমার মাথায় ঢুকবে না। ফরাসী দার্শনিক পিয়ের বেইলের কথা তুমি আমার থেকে বেশি জানো নিশ্চয়। নাস্তিকতাবাদী সমাজের সূত্রপাত তিনিই করেছিলেন। মার্কস্ আর এঙ্গেলস্ সাহেব মানতেন, পিয়ের বেইলের তত্ত্বের মধ্যে বস্তুবাদের সন্ধান পাওয়া গেছলো। এই ফবাসী দার্শনিক বিশ্বাস করতেন, কেবল নাস্তিকদের নিয়েই একটা সমাজ চলতে পারে। তারাই যোগ্য শ্রদ্ধার পাত্র হতে পারে। এর চেয়েও উনি খাঁটি কথা বলেছেন, মানুষ হীনচরিত্র হয় কুসংস্কার আর প্রতিমা পুজোর মধ্য দিয়ে। নাস্তিকতা দিয়ে নয়। তোমরা সেই নাস্তিকদেরই উত্তরসুরি, বা সেইরকমই একজন নাস্তিক। আমি তো একবারও বলিনি, তোমরা অবিশ্বাসী। আমি বলেছিলাম, তোমার বিশ্বাস মতে, বিয়ের কী সংজ্ঞা, আমার জানা নেই।"

"আপনি পিয়ের বেইলের নাস্তিকতার কথা জানেন, আর আমার মতে বিয়ের কী সংজ্ঞা হতে পারে, জানেন না?" সৌরীন্দ্রর হাসির মধ্যে অকপট বিস্ময় ছিল। বাস্তবিকই তিনি সূর্যমোহনের কাছ থেকে পিয়ের বেইলের নাস্তিকতার কথা প্রত্যাশা করেননি, "পিয়ের বেইলের সেই নাস্তিকদের উত্তরসুরি হিসেবে, আমি তো নিজেকে একজন অসামাজিক জীব মনে করি নে। তবে বিয়ের সংজ্ঞা আমার কাছে, পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা নয়। আর ভার্যা মানে, সে স্বামীর দাসী বাঁদীও নয়। নারী-পুরুষের বৈধ দাম্পত্য জীবনেই আমি বিশ্বাস করি।"

সূর্যমোহন হেসে মাথা ঝাঁকিয়েছিলেন, "বৈধ। মানে সমাজ আর রাষ্ট্রের দ্বারা যে-বিয়ে সমর্থিত। আইনানুসারে বিয়ে তুমি করতে পারো, তাতে ধর্মীয় প্রথা,

মন্ত্রতন্ত্রগুলোর হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। সেটাই হবে তোমার আদর্শ মতো। অবিশ্যি বৃটিশ সবকারের আইনও তোমার আদর্শের সঙ্গে মেলে না। একজন কমিউনিস্ট হিসেবে, কেনই বা তুমি এ রাষ্ট্রের আইন মেনে নেবে। তুমি যে হিন্দু, সেটা তোমাকে ঘোষণা করতেই হবে। কিন্তু বৈধতার জন্যই, আপাতত তোমাকে আইনানুসারে—"

"আপনাব কথা আমি ঠিক বুঝতে পাবছি নে।" সৌরীন্দ্রর ভ্রূকুটি চোখে ছিল অনুসন্ধিৎসু জিজ্ঞাসা, "আপনি কি আমাকে কোর্টে গিয়ে সই-সাবুদ-সাক্ষী নিয়ে বিয়ে করতে বলছেন ?"

সূর্যমোহন মাথা নেড়েছিলেন, "আমি কিছুই বলছি নে। আমি তোমার আদর্শের কথা ভেবে বলছি।"

"কন্যা পক্ষের সঙ্গে আপনার কি এ বিষয়ে কোনো কথা হয়েছে ?" সৌরীন্দ্রর স্বরে ও অভিব্যক্তিতে অস্বস্তি আর বিস্ময়, দুই-ই ছিল, "তারা কি সেরকম কিছু চায় ?"

সূর্যমোহন ঘাড় ঝাঁকিয়েছিলেন, "হ্যাঁ, কথা হয়েছে। তোমাব কন্যা পছন্দের পরে, আমি বিয়েব পদ্ধতি বিষয়ে কথা তুলেছিলাম। পাত্র হিসেবে তোমাকে তাঁদের খুবই পছন্দ। তবে শাস্ত্রীয হিন্দু বিয়ে হলেই তাঁরা খুশি হবেন; আমি তোমার সঙ্গে কথা না বলে, তাঁদের কোনো কথা দিইনি। তোমার আর পরিবারের হয়ে আমি একটিই মাত্র কথা তাঁদের দিয়েছি, আমাদের সামান্যতম কানাকড়িবও দাবী নেই। তবে হ্যাঁ, তাঁরা বলেছেন, তুমি যে-পদ্ধতিতে বিয়ে করতে চাও, তাতেই তাঁরা রাজী।"

"তাঁবা খুবই ভদ্রলোক।" সৌবীন্দ্র সূর্যমোহনেব কৌতুকোজ্জ্বল চোখের দিকে তাকিয়ে হেসেছিলেন "আমি একটা দাবী করতে পারিনে, আমার মতবাদ আর আদর্শের সঙ্গে সবার সবকিছুকে এখনই মানিয়ে চলতে হবে। বিশেষ করে এসব ক্ষেত্রে। আমি শুধু তাঁদের কথা বলছিনে। মা-দিদিরাই কি খুশি হবেন ?"

সূর্যমোহন মাথা নেড়েছিলেন, "তা কী করে হবেন ? তুমি আমার ছেলে বটে। কিন্তু আজ বাবা-ছেলে ছাড়াও তোমার আমার মধ্যে আব একটা পরিচয় ঘটেছে। আমি গান্ধীবাদী। তুমি কমিউনিস্ট। তোমার মা-দিদিদের কাছে আমরা বাবা আর ভাই। তোমার আমাব মতবাদ আর আদর্শের চেয়ে ওঁদের কাছে আমাদেব সেই পরিচযটাই আসল।"

"আমি তাঁদের কাছে তাঁদের মতোই থাকতে চাই।" সৌবীন্দ্র অকপট হেসে স্বীকার কবেছিলেন, "বাস্তব অবস্থাটা আমাকে মেনে নিতেই হবে। এরকম একটা অবাস্তব দাবী আমি করবো কেমন করে ? তা হলে তো বিয়েতেই আমার রাজী

হওয়া উচিত নয়। কারণ যাকে আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি, সে হয়তো আমার একটা রাজনৈতিক পরিচয় জানে। প্রকৃত মতবাদ আর আদর্শের কথা নিশ্চয়ই জানে না। আমাদের কানাকড়িরও দাবী নেই, সেটা যেমন জানিয়ে দিয়েছেন, তেমনি এটাও জানিয়ে দিন, বিয়ের পদ্ধতি নিয়েও আমাদের কিছুই বলার নেই।"

সূর্যমোহনের দুই চোখ প্রসন্ন কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠেছিল, "বড় আনন্দ পেলাম ভানু। এত জোর দিয়ে তুমি তোমার নাস্তিকতার আদর্শের কথা বল, আমি পাল্টা ততো জোর দিয়ে আমার ইচ্ছেটা তোমার ওপর চাপিয়ে দেবার কথা ভাবতে পারি নে। যার বাস্তব বোধ আছে, সে-ই সার্থক।"

"তবে আমাদের সকলের বাস্তববোধটা একরকম নয়।" সৌরীন্দ্র কিঞ্চিৎ হাল্কাভাবেই হেসেছিলেন, কথাটার ওপরে যেন তেমন একটা গুরুত্ব আরোপ করতে চাননি, "আমাদের বাস্তববোধের মধ্যেও অনেক তারতম্য আছে। তাই একজনের সার্থকতা আর একজনের সার্থকতা নাও হতে পারে। রাগ করছেন না তো বাবা?"

সূর্যমোহন হাসতে হাসতে মাথা নেড়েছিলেন, "ঐ চণ্ডালটার সঙ্গে আমার একটুও ভাব নেই। রাগ করবো কেন? তুমি তো ঠিক কথাই বলেছো। তোমার আমার জীবনই তো জানিয়ে দিচ্ছে, আমাদের বাস্তববোধ এক নয়। আর ওটার সঙ্গে আদর্শ আর মতবাদটা মিশে থাকে বলেই, সার্থকতাটাও ভিন্ন হয়ে যায়। যাই হোক, বিয়ের ব্যাপারে, তুমি যে-বাস্তবতাকে মেনে নিয়েছো, তাতেই আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। আমার ভয় ছিল, পাছে তুমি এই ভেবে বেঁকে বসো, তোমাকে আমরা সুবিধাবাদের পথে ঠেলে দিচ্ছি। তা তুমি ভাবোনি। বেশ পরিচ্ছন্ন চিন্তার পরিচয় দিয়েছো।"

সৌরীন্দ্র সহসা কোনো জবাব দিতে পারেন নি। তাঁর চোখে ঘনিয়ে এসেছিল সন্দেহের ছায়া। সূর্যমোহনের মুখে 'সুবিধাবাদ' শব্দটা তাঁর কানে যেন কেমন বেসুরো বেজেছিল। তিনি তীক্ষ্ণ চোখে সূর্যমোহনের গোঁফদাড়ির ভাঁজ ভেদ করতে চেয়েছিলেন। হেসে আস্তে আস্তে ঘাড় ঝাঁকিয়েছিলেন, "এক দিক থেকে দেখতে গেলে, আমাকে সুবিধাবাদী ভাবা যেতে পারে। তবে—"

"কখনোই না।" সূর্যমোহন দৃঢ়ভাবে হাত আর মাথা নেড়েছিলেন, "তোমার এই বাস্তববোধের সঙ্গে কোথাও সুবিধাবাদী মনোভাবের পরিচয় নেই। আমার ভয় ছিল, পাছে তুমি ওরকম কিছু ভাবো। তুমি যদি সকলের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাদের দুঃখ দিতে, তা হলে সেটা সুবিধাবাদ হত। অন্তত আমি তাই মনে করি। তুমি যদি এ বাস্তবতার পরিচয় না দিতে, তা হলে তোমার সব ব্যাপারটাই হয়ে উঠতো একটা অসাধারণ কাণ্ডকারখানা। আর যাই হোক, সব ব্যাপারে

অসাধারণত্ব প্রমাণ করাটা মোটেই সত্যিকারের অসাধারণত্ব নয়। নিজেকে অসাধারণ প্রমাণ করার জন্য লোকে যে কতো হাস্যকর কাণ্ডকারখানা করে!"

সৌরীন্দ্রর চোখ থেকে সন্দেহের ছায়া অপসারিত হয়েছিল। বুঝতে পেরেছিলেন, সূর্যমোহন বাস্তবিকই তাঁকে কথার ছলে সুবিধাবাদী বলতে চাননি। তা ছাড়া, তাঁর নিজের বাস্তববোধই তাঁকে অকারণ জটিল অসংলগ্ন আচরণ থেকে রক্ষা করেছিল। শাস্ত্রীয় মতে বিয়ের বিবোধিতা করলে, সমস্ত ব্যাপারটা কেবল হাস্যকর হতো না। অসাধারণ কাণ্ডকারখানার জন্য সমস্ত ঘটনাটাই হয়ে উঠতো করুণ আর বিষণ্ণ। মনে মনে একটা আত্মপ্রসাদও তিনি অনুভব করেছিলেন। পরিস্থিতি ও পরিবেশ, সময় ও কাল অনুযায়ী একমাত্র কমিউনিস্টরাই বাস্তববোধের পরিচয় দিতে পারে।

সুদীপ ওর বাবার কাছ থেকে এ কথাটাকে মন্ত্রের মতো গ্রহণ করেছিল। কয়েকবছর আগে ওর অনিয়মিত রোজনামচা অনুযায়ী, "কে তুমি! আমার অবচেতনের অন্ধকারে মুখ ঢুকিয়ে থাকা কূপমণ্ডুকটাকে খুঁচিয়ে দিলে? আমার সীমাবদ্ধ সেই সামান্য আলোর বলয় থেকে, ডাক দিলে আকাশের নিচে গিয়ে দাঁড়াতে। জানতে না, সেটা কী দুঃসহ কষ্টের কাজ? মুক্ত আকাশের নিচে, কূপমণ্ডুকের চোখ কী ভীষণ ধাঁধিয়ে যায়! আমার জন্ম থেকে যে-সব কথাকে মন্ত্রের মতো সত্য অব্যর্থ বলে জানতাম, সেইসব কথাগুলো কী বিশ্রী বিকৃত স্বরে, বিদ্রূপে হেসে আমাকে পরিহাস করে উঠেছিল। একটা মুহূর্তের ম্যাজিকের মতো তা ঘটেনি। অনেকদিন ধরে ধীরে ধীরে ঘটে আসছে, আর একটা দুঃসহ কষ্টে মরে যাচ্ছি। সেই বস্তুবাদী মহামতি দার্শনিক হেগেলের মাথায়ও এঙ্গেলস্ যেমন টিকি আবিষ্কার করেছিলেন—একবার ভেবে দেখ, সেই আবিষ্কারের ব্যাপারটাকে যদি একটা নাটকীয় দৃশ্যের মধ্য দিয়ে দেখানো হতো, কী ভয়ংকর চমকই না লাগিয়ে দেওয়া যেতো! খোলা আকাশের নিচে এসে আমার দিকে দিকে কেবল চমকের পর চমক। পোড়খাওয়া মার্কসবাদী নৃতাত্ত্বিক দার্শনিক এঙ্গেলস্ সেই কূপমণ্ডুকতার টিকিটা গ্যাটের মাথায়ও চাপিয়ে দিয়েছেন; দিতে বাধ্য হয়েছেন তাঁর নীতিবোধের ব্যাখ্যার দ্বারাই। কিন্তু আমার পিতৃদেব আর তাঁর পার্টিকে কোন্ এঙ্গেলস্ এসে এখন বলবেন, মশাইরা কুঁয়ো থেকে উঠে আসুন। মাথার পেছনে হাত দিয়ে দেখুন, টিকি যে রাধাকিষণ আপনারও কেমন গজিয়ে উঠেছে। হেগেল আর গ্যাটে না হয় জার্মান ছিলেন। আপনারা বাঙালী "কিমলিস্" হয়ে কী করে ভাবছেন, আপনারা যা করছেন, সেটাই একমাত্র উচিত?... আর আমিই বা আমার পিতৃদেবকে কেমন করে বলবো, গুরু! তোমার মন্ত্রের ভেতর দিয়ে যে তন্ত্র আমার মাথায় গজিয়েছিল, সব যে ভেঙে

চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে।”...

অবিশ্যি সাঁইত্রিশ বছর বয়সেব সুদীপের চিন্তায়, অতীতের সৌরীন্দ্র বর্তমানে কতোখানি বদলে গিয়েছেন, সেটাই বড একটা জিজ্ঞাসা হয়ে দেখা দিয়েছে। এই জিজ্ঞাসার মধ্যেই, বাবা আর ঠাকুর্দার পরস্পরের সম্পর্ক আর কথাগুলো, ও কোনো দিনই ভুলতে পারেনি।

সৌরীন্দ্র তাঁর বিযেব বাস্তববোধের পবিচয় দেবার পরে, সূর্যমোহন যখন মৌনব্রত অবলম্বন করেছিলেন, ত্যাগ করেছিলেন আমিষ আহার, বৌদ্ধ সাহিত্য, ভাগবত পাঠ আর তকলিতে সুতো পাকানো, অথবা চরকা কাটাকে সারাদিনের কাজ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, কোনো কিছুই তিনি মেনে নিতে পারেন নি। বিশেষ করে বসুন্ধরাও (মা) যখন নতুন পুত্রবধূ প্রণতির ওপর সৌরীন্দ্রর সব দাযিত্ব ছেড়ে, স্বামীব অনুগামিনী হয়েছিলেন, তখন তাঁর মনে যুগপৎ ক্ষোভ ও বিমর্ষতা নেমে এসেছিল।

সূর্যমোহনের মতে, হিন্দু শাস্ত্রীয বিয়েটা আসলে সংক্ষিপ্ত বৈদিক বিয়ে। স্ত্রী-আচার সমূহকে একেবারে ত্যাগ করেননি। কিন্তু যে-সব লৌকিক আচার আচবণকে তিনি অশালীন মনে করতেন, সে-সব ঘটতে দেননি। তবে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব মিলিয়ে নিমন্ত্রিতের সংখ্যা কিছু কম ছিল না। কয়েকদিনের জন্য গোটা বাড়ি ছিল ভরপুব। তিন কন্যা, জামাতাবৃন্দ আর দৌহিত্র দৌহিত্রীই বাড়ি ভবিয়ে তুলতে অনেকখানি ছিল। তা ছাড়া অন্যান্য নিকট আত্মীয়ও কম ছিল না।

অন্যদিকে, সৌরীন্দ্রর শ্বশুরালয়ের চেহারাটা ছিল একটু অন্যরকম। সে-পরিবারে মতবাদ, আদর্শ ইত্যাদির কোনো ব্যাপার ছিল না। শিক্ষা-দীক্ষার বিষয়টি মোটামুটি ছিল আবশ্যিক। বিত্তবৈভব বৃদ্ধির বিষয়টি ছিল, ঐকান্তিকভাবে নিজেদের নিয়োজিত করা। মনে-প্রাণে হিন্দু। দোল-দুর্গোৎসব, বারো মাসে তেরো পার্বণ লেগেই থাকতো। বিয়ের সময় সৌরীন্দ্র দেখেছিলেন, তাঁর শ্বশুরালয়ে স্ত্রী-আচারের বাড়াবাড়ি অনেক বেশি। সেখানে সূর্যমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো কোনো ব্যক্তির অদৃশ্য অস্তিত্বের কথা কারোকে মনে বাখতে হয়নি। দীর্ঘকাল কারাভোগী কমিউনিষ্ট সৌরীন্দ্রর বিয়ের বাসরে গানের আসরে হারমোনিয়াম বাজিয়ে রূপসীরা যে-সব গান করেছিল, তাকে খুব শ্লীল বলা যায় না। বরের হাত ধরে টানা, গায়ে পড়া, নানা ইশারা ইঙ্গিতে অশ্লীল কথা কটাক্ষ ছিল অবাধ। এমনকি সৌরীন্দ্রর দীর্ঘ জেলবাসকে নিয়েও অনেক স্থূল ঠাট্টা করতে ছাড়েনি। একমাত্র রেহাই ছিল, রাজনৈতিক উক্তি করার মতো কেউ ছিল না। কেউ কোনো প্রশ্ন তোলেনি। তবে সম্পর্কে এক বিবাহিতা রূপসী

সুন্দরী শালী সবাইকে শুনিয়ে প্রথমে বলেছিলেন, "তুমি হচ্ছো একজন মহর্ষির ছেলে। তাঁকে আমাদেব নমস্কার।" তারপবে একেবারে ঘাডে পড়ে, কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস কবেছিলেন, "কিছু মনে করো না ভাই। আমার বরের মুখে শুনেছি, তোমাদের কমিউনিস্টদের নাকি ক্লাস করে বুঝিয়ে দেয়া হয়, বউয়ের সঙ্গে কী ভাবে মিশতে হয়?"

সৌরীন্দ্র মুহূর্তমাত্র বিচলিত বোধ করেছিলেন। তারপরেই সহজভাবে হেসেছিলেন, "হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন। আমাদের বুঝিযে দেওযা হয়, বউ শুধু একটি মেয়েমানুষ আব ভোগের যন্ত্র নয়। তাঁকে মানুষের মর্যাদা দিতে হয।"

"আহ্, এ তো সেই তোমাব বাবা মহর্ষির মতো কথা হল।" শালীটি সহজে সৌরীন্দ্রকে রেহাই দিতে চান নি, "আমাব কথাটাই ছাই তুমি বুঝতে পারোনি। আমি শুনেছি, তোমাদেব কমিউনিস্টদের ধবন-ধারণ নাকি সব আলাদা?"

সৌরীন্দ্র বুঝতে পেরেছিলেন, সেই সময়ে কমিউনিস্টদেব নিয়ে কোনো মতবাদ ও আদর্শহীন এক শ্রেণীর মতলববাজ লোক অপপ্রচাব চালাচ্ছিল, শ্যালিকাটি তারই প্রতিধ্বনি করেছিলেন। রক্ষণশীল কংগ্রেস বা কংগ্রেসের অনুগামী ভিন্ন দলগুলোর মধ্যে সাধাবণ মেযে বা ছাত্রীদেব স্থান ছিল না বললেই চলে। সেই তুলনায় কমিউনিস্ট পার্টিতে মেয়েদের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। আর তা নিয়ে জঘন্য নোংরা প্রচার চালানো হতো। অবাধ মেলামেশার সুযোগ যে কেউ কেউ একেবারে নিতো না, তা বলা যায় না। কিন্তু তার সংখ্যা ছিল নগণ্য। সমগ্র পার্টিব ক্ষেত্রে তা কখনও নৈতিক ক্ষতিব কারণ হয়ে ওঠেনি। অবিশ্যি কমিউনিস্ট পার্টি থেকেও তখন জাপানী মেয়েদেব সম্পর্কে বীভৎস অপপ্রচার চালানো হয়েছিল। সেটাও ছিল রাজনৈতিক মতলব হাসিলের একটা অনৈতিক শস্তা পথ।

সৌরীন্দ্র আদৌ বিরক্ত বা উত্তেজিত হননি। শ্যালিকাটির সীমাবদ্ধতা তাঁর কাছে হাস্যকব মনে হয়েছিল। তিনি হেসেছিলেন, "হ্যাঁ, একেবারে খাঁটি মানুষের মতো। দেখতে মানুষ, অথচ জানোয়ার, তাদের মতো নয়।"

"ধুর, তুমি একেবারে বেবসিক ভগ্নিপতি।" শ্যালিকাটি কপট হতাশায় প্রসঙ্গের ইতি টেনেছিলেন, "কোথায ভাবলুম, একটু নতুন কিছু শুনবো। তা নয়, সেই একই পুরনো ব্যাপার। তা হলে আর কমিউনিস্ট ভগ্নিপতি পেয়ে কী লাভ হল?"

সৌরীন্দ্র সুদীপকে এ ঘটনাটির দ্বাবা পচা গলা বুর্জোয়া সমাজের বিকৃতির ব্যাখ্যা করেছিলেন। তবে, শ্বশুরালয়ে বাসরঘরের আর সব আনুষঙ্গিক প্রমোদ যে তিনি সেই সময় উপভোগ করেছিলেন, তাও অস্বীকাব করেননি। কারণ

সে-সবও ছিল তাঁর বাস্তববোধের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। তাঁর বিয়েতে পার্টির বহু বন্ধুই নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। সকলেই প্রায় নিমন্ত্রণ রক্ষা করেছিলেন। কেউ কেউ বরযাত্রী দলেও সামিল হয়েছিলেন। এমন কি সীতানাথ মজুমদারের মতো কমরেড, বর কনে, উভয় গৃহে, বিয়ে উপলক্ষে পার্টির ঝুলি পেতে ধরেছিলেন। এবং তাঁর ঝুলি কেবল নগদ অর্থে ভরে ওঠেনি। কয়েকটি ছোটখাটো সোনা রুপোর অলঙ্কারও জুটেছিল।

সৌরীন্দ্র বিয়ের যাগযজ্ঞ সব অনুষ্ঠানেই অংশ গ্রহণ করেছিলেন, যা তাঁর কাছে কোনো অর্থই বহন করে না, সেই মন্ত্রও উচ্চারণ করেছিলেন। কিন্তু তার মধ্যে তিনি কোনো ভাববাদী আবেগ আদৌ অনুভব করেননি। বরং তাঁর শ্বশুরালয়ে কিছু স্ত্রী-আচার ও লৌকিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে, লোকায়ত বস্তুবাদের ক্ষীণ ও দূর সংকেত দেখতে পেয়েছিলেন। প্রণতিকে স্ত্রীরূপে পেয়ে তিনি সুখী বোধ করেছিলেন। তাঁর বিয়েকে কেন্দ্র করে আত্মীয়স্বজনসহ গৃহের উৎসবকে তিনি উপভোগ করেছিলেন। কৃতজ্ঞ বোধ করেছিলেন সকলের শুভেচ্ছায়।

সৌরীন্দ্র প্রণতিকে নিয়ে জোড় গমন থেকে যেদিনটিতে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, গৃহে তখনও বিয়ের উৎসব, আনন্দের সৌরভ পূর্ণ হয়ে ছিল। কিন্তু সেই দিনটিতেই সূর্যমোহন, পরের দিন থেকেই তাঁর মৌনব্রত গ্রহণের কথা ঘোষণা করেছিলেন। মৌনব্রতর সঙ্গেই, তাঁর নিরামিষ আহার ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ ও দিনযাপনের কথাও জানিয়ে দিয়েছিলেন। এবং সে-সব কথা যে বসুন্ধরা আরও আগেই স্বামীর কাছ থেকে জেনেছিলেন, তাও বোঝা গিয়েছিল তাঁর আচরণ থেকে। ক্ষুব্ধ বিমর্ষ সৌরীন্দ্র পিতার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। "বাড়িতে এখনো দিদি জামাইবাবুরা রয়েছেন। কাবেরী (ছোট বোন) আর ওর বর রয়েছে। আপনার নিজের বোন ভগ্নিপতি ভাই ভাদ্রবউরা রয়েছেন। বিয়ে মিটেছে সত্যি। কিন্তু আপনার বাড়িতে এখনো বিয়ের উৎসবের হাওয়া। এ অবস্থায় আপনি আগামীকাল থেকেই—"

"শোন ভানু, তুমি কিছু ভুল বলছো না।" সূর্যমোহনের মুখে প্রসন্নতার পরিবর্তে ছিল একটি বিষণ্ণ করুণ হাসির ম্লানতা, "বাড়িতে যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের সবাইকেই আমি আমার কথা বলেছি। বুঝেছি, কেউ-ই খুশি হতে পারেননি। তোমার তো আরোই খারাপ লাগবার কথা। এটাও বুঝি, আমি তোমাদের সকলের কাছ থেকে বাড়ির মধ্যে নিজেকে যতোই আলাদা করে রাখি নে কেন, বিয়ের আনন্দ উৎসবকে তা জীইয়ে রাখতে পারবে না। তবে কি জানো, তুমি জোড়ে ফিরে আসার পরে আমি আমার ব্রত পালন করতে যাচ্ছি। আমিও আর এভাবে থাকতে পারছি নে। অপেক্ষা ছিল তোমার বিয়ের। সেটা মিটেছে।

আমি নামে অন্তরীণ, অথচ গৃহের সব রকম সুখ-সুবিধে ভোগ করবো, মেনে নিতে পারছিনে। জেলে রয়েছেন আমার নেতা বন্ধুরা। আশা করি তুমি বুঝবে।"

সৌবীন্দ্র সূর্যমোহনের কথা মেনে নিতে পারেন নি, "বুঝতে পারছি, এ রকম অন্তরীণ অবস্থায় আপনি জেলের নেতা বন্ধুদের জন্য কষ্টবোধ করছেন। তাই নতুন ব্রত গ্রহণ করছেন। হয়তো আপনার এটা অনুশোচনা-পাপস্খালন। কিন্তু তার তো একটা সময় ছিল।"

"হয়তো তোমাকে বোঝাতে পারবো না।" সূর্যমোহনের মুখে ছিল সেই একই অভিব্যক্তি। সেই সঙ্গে একটু বা আবেগ, "সময় আর সত্যি ছিল না। ভেবেছিলাম, তুমি জেল থেকে ফিরে এলেই শুরু কববো। তখন তোমার বিয়ের কথা তুললেন তোমার মা। ঠিক কথা, খুব ঠিক সময়েই তিনি তুলেছিলেন। কিন্তু তুমি উপার্জনশীল না হলে বিয়ের কথা আমি ভাবতে পারিনি। ব্যাপারটা দাঁড়িয়ে গেল একটা অনিশ্চয়তাব মধ্যে। অবিশ্যি কন্যা দেখা চলছিল। আমি চাইনি, স্ত্রীর ভবণপোষণের দায় নিতে না পারা পর্যন্ত তোমার বিয়ে হোক। ঈশ্বরের অশেষ করুণা, তোমার একটি চাকরি জুটে গেল। তাও ইতিমধ্যে পেরিয়ে গেছে ন' মাস। বুঝতে পারছি, তোমাদের সবাইকেই কষ্ট দিচ্ছি। কিন্তু আমি—"

সৌবীন্দ্র সূর্যমোহনকে তাঁর কথা শেষ হতে দেননি। হেসেছিলেন নিঃশব্দে। তাঁর সেই ধারালো বক্র হাসি, "হ্যাঁ কষ্টই। তবে কষ্টের মধ্যে একটা নাটকীয় চমকও আমরা দেখছি।"

"নাটকীয় চমক!" সূর্যমোহনের গোঁফদাড়ির ভাঁজে ঢাকা সৌম্যতায় আঘাতের আকস্মিক বিস্ময় ব্যথা জেগে উঠেছিল। চোখে ছিল আহত দৃষ্টি। মুখের সেই বিষণ্ণ হাসিব কিরণ ফুটতে সময় লেগেছিল।

দুজনেব কেউ লক্ষ করেননি, গঙ্গা কখন এসে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়েছিলেন। গঙ্গা সূর্যমোহনের প্রথম সন্তান, জ্যেষ্ঠা কন্যা। সৌরীন্দ্রর বড় দিদি। তিনি দবজার কাছ থেকে এগিযে এসেছিলেন ঘরের মধ্যে, সূর্যমোহনের আরামকেদাবাব সামনে। তাঁর মুখে ছিল হাসি, "এটা কিন্তু তুই ঠিক বলিসনি ভানু। বাবার কথায আমরা কেউ নাটুকে কিচ্ছু দেখিনি। তোব বিয়েতে আসার আগেই বাবা আমাকে চিঠিতে মনের কথা সব খুলে লিখেছিলেন। তবে দিনক্ষণের কথা লেখেননি বলে আজ মনটা খুব খারাপ তো হযেছেই। আমাদের একটি মাত্র ভাইয়েব বিয়ে বলে কথা।" তারপরেই তিনি সূর্যমোহনের কাঁধে হাত রেখেছিলেন, "কিন্তু আমাদেব বাবা তো আমাদেরই বাবা। বাবাকে তো আমরা

চিনি। তুই সেই কোন্ অল্প বয়সে বাবার সঙ্গে একত্র জেল খেটেছিস। বাবাকে তুই চিনিস আমাদের চেয়ে বেশি।"

সূর্যমোহন সম্ভবতঃ কষ্ট করে তাঁর চোখ শুকনো রেখেছিলেন। তাঁর মুখে ফুটেছিল সেই বিষণ্ণ হাসির করুণ কিরণ, "গঙ্গা ? তুই কখন এলি ?"

"কিন্তু বড়দি, তুমি একটা ব্যাপার বোধ হয় ভালো করে দেখানি, বা ভাবোনি।" সৌরীন্দ্র তাঁর কষ্টতা গোপন করতে পারেননি, "তোমরা সবাই এখনো এ বাড়িতে থাকতেই, মা রান্নাঘরে নিরিমিষ রান্নার আলাদা সব ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। বাবা যাচ্ছেন কাল নিচে তাঁর অফিস ঘরে থাকতে। মা এর মধ্যেই শোবার ঘরের মেঝেতে একটা সামান্য কাটির মাদুর পেতেছেন শোবার জন্যে। চরকা রামায়ণ সব জড়ো করেছেন তাঁর ঘরে। আর জোড়ে গিয়ে আজ আমি বউ নিয়ে ফিরে এলাম বাড়িতে। এ তো যেন আনন্দ উৎসবের মাঝখানে মড়া কান্না শুনতে পাচ্ছি।"

গঙ্গা অতিমাত্রায় বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন, "ভানু, মড়াকান্না কেন বলছিস ভাই। ওরকম অমঙ্গলের কথা বলিসনে।"

"ওসব মঙ্গল অমঙ্গলে আমার বিশ্বাস নেই বড়দি।" সৌরীন্দ্র তাঁর দুঃখ ক্ষোভ থেকে মুক্ত হতে পারছিলেন না। "রাত পোহালেই তোমরা সব এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে, আমি আর প্রণতি থাকবো। হঠাৎ-ই যেন আমাদের আলাদা করে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু আমাদের অপরাধটা কী ?"

সূর্যমোহন আবার মুখ খুলেছিলেন, "অপরাধের কথা ভাবছো কেন ? আর আলাদা করে দেবার কথাই বা আসছে কেন ? আমাকে একটু সুযোগ দাও। তোমরা স্বামী-স্ত্রীতে এ বাড়ি সংসারের সব দায়িত্ব নাও। নতুন বিয়ে হলে কি তা নিতে নেই ? তোমার মা আর আমি তো চিরকাল থাকবো না। তোমরাই তো এ সংসার বয়ে বাড়িয়ে চলবে। আর তুমি যদি নিতান্তই না চাও, তা হলে আমি ব্রত নেবো না।"

"বাবা, আপনি ব্রত নেবেন।" গঙ্গা হেসে সৌরীন্দ্রর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, "আমরা রাত পোহালেই এ বাড়ি ছেড়ে যাবো না। কেন যাবো ? বাবা মা থাকুন নিজেদের নিয়ে। আমরা এখন ভাইয়ের বউয়ের সেবা ভোগ করবো কিছুদিন।"

সূর্যমোহন সশব্দে হেসে উঠেছিলেন, "ঠিক বলেছিস গঙ্গা।"

গঙ্গা যথার্থই ঠিক বলেননি। যদি বা যথার্থ তাঁরা তিন ভগ্নিই স্বামী-সন্তানসহ তারপরেও কয়েক দিন পিত্রালয়ে কাটিয়ে গিয়েছিলেন, অন্যান্য আত্মীয়রা চলে

গিয়েছিলেন পরের দিনই। বস্তুতপক্ষে সে-যাওয়াটা সূর্যমোহনের ব্রত পালনের কারণে নয়। সময়ের দিক থেকে সৌজন্যমূলকই ছিল। গঙ্গা যমুনা কাবেরী, দুই দিদি আর ছোট বোনের পক্ষেও খুব বেশিদিন থাকা সম্ভব ছিল না। তাঁদের স্বামীরা কাজের মানুষ। যদৃচ্ছা ছুটি ভোগের সময় কারোরই ছিল না। গঙ্গা যমুনার ছেলেমেয়েরাও বড় হয়ে উঠেছিল। তাদের ছিল স্কুল কলেজের তাড়া। অতএব, নিতান্ত যে-কটা দিন না থাকলেই নয়, সে-কটা দিনই তাঁরা ছিলেন। তাঁরা বা আত্মীয়স্বজনরা কেউ সূর্যমোহনকে তাঁদের বিদায়ের জন্য দায়ী করেননি। তবে স্বভাবতঃই সকলেই একটু মন-মরা হয়ে পড়েছিলেন।

সৌরীন্দ্রও খুব অবাস্তব কিছু বলেননি। সবাই বিদায় নিয়ে চলে যাবার পরে বাড়িতে একটা কেমন স্তব্ধতা নেমে এসেছিল। কাজের লোক ছিল তিনজন। তাদের মধ্যে দুজন স্ত্রীলোক। একজন পুরুষ। সকলেই পরিবারের পুরনো লোক। অনন্ত উড়িষ্যাবাসী, অনেক কালের পুরনো লোক। সৌরীন্দ্রর থেকেও তার বয়স বেশি। ধুতি আর গেঞ্জি পরা অনন্তর কাঁধে সব সময়ই থাকতো একটা বড় ঝাড়ন। সূর্যমোহনের অফিস ঘর থেকে গোটা বাড়ির দরজা জানালা আসবাবপত্র আলমারি ঝাড়াটাই তার কাজ ছিল। তবে সূর্যমোহন কোর্টে না বেরনো পর্যন্ত সে একতলা থেকে বিশেষ নড়তো না। কারণ নানা কাজে সূর্যমোহনের তাকেই প্রয়োজন হত বেশি। ঝাঁটপাট ধোয়া মোছা বাসন মাজা ইত্যাদির দায়িত্ব ছিল এলোকেশী নাম্নী এক সধবার। যার স্বামী-সন্তানকে বাড়ির কেউ কোনো কালে দেখেনি। অথচ নাকি সবই ছিল। কিন্তু সে ছুটি নিতো না। আর ছিল বিধবা ব্রাহ্মণকন্যা সত্যবালা। বসুন্ধরার থেকে বয়স কিছু কম। সূর্যমোহন আর বসুন্ধরা তাকে সত্য বলে ডাকতেন। বাড়ির ছেলেমেয়েদের কাছে সে ছিল সত্যমাসী। তার দায়িত্ব যদিও ছিল রান্না, এবং কিছুটা ঘরকন্নার, কিন্তু রান্নার পুরো দায়িত্ব বসুন্ধরা তাকে কোনো দিনই দেননি। সত্যমাসী বসুন্ধরার সাহায্যকারিণী ছিল।

এরা ছাড়াও কাজের লোক ছিল। সহদেব দাস আর দ্বিজপদ বসু। সূর্যমোহনের দুই মুহুরি এবং কেরাণী। আরও অন্যান্য সহযোগী আইনজীবী কর্মচারীও ছিল। তারা বাড়িতে আসতো কম। সহদেব আর দ্বিজপদ সকালেই বাড়িতে হাজিরা দিতো। গাড়ি এবং ড্রাইভার ছিল। সূর্যমোহন অন্তরীণ হবার পর থেকেই গাড়ি চলা বন্ধ ছিল। কিন্তু ড্রাইভার আসতো রোজ। আসতো সহদেব আর দ্বিজপদও। সহদেবের একটি বিশেষ কাজ ছিল, প্রতিদিন অনন্তকে নিয়ে বাজার করতে যাওয়া। অন্যান্য সহযোগী আইনজীবী কর্মচারীরাও আসতো অধিকাংশ দিন বিকাল বা সন্ধ্যায়। অন্তরীণ অবস্থায়ও সূর্যমোহন বাড়িতে বসে

অনেক কাজ করতেন। এমন কি, তাঁর মৌনাবস্থায়ও কাজের হাত থেকে একেবারে রেহাই পাননি। তাঁর ঘোরতর আপত্তি থাকা সত্ত্বেও দু-একটি মন্তব্য, সই ইত্যাদি করতে হত। অবিশ্যি কয়েক মাস পরে তা বন্ধ করেছিলেন।

সূর্যমোহনের মৌনব্রতর সঙ্গেই সমস্ত বাড়িটাই যেন মৌনাবলম্বন করেছিল। বসুন্ধরা মৌনব্রত নেননি। কিন্তু তিনি পারতপক্ষে খুব প্রয়োজন না হলে কারোর সঙ্গেই বিশেষ কথা বলতেন না। সত্যমাসীকে তিনি সৌরীন্দ্র আর প্রণতির জন্য আমিষ রান্নার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। সহদেবকে নির্দেশ দেওয়া ছিল, বাজারে যাবার আগে বসুন্ধরার কাছ থেকে যেমন প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বিষয় জেনে যেতে হবে, তেমনি জেনে যেতে হবে প্রণতির কাছ থেকেও। বসুন্ধরা রোজই প্রণতিকে একটি কথা বলতেন, "বৌমা, ভানু একটু মাছ-মাংস খেতে ভালবাসে। তুমি বুঝে-সুঝে সব বলে দিও। তোমার নিজেরটাও বলে দিও মা। আর যদি সেরকম বোঝ, সত্যকে বলে দিও, রান্নাবান্না কেমন হবে।" সৌরীন্দ্রকে সারা দিনের মধ্যে যখনই হোক, একবার বলতেন, "ভানু, ভালো করে খাওয়া-দাওয়া করিস বাবা। কলেজের চাকরির নামে সেই কখন বেরিয়ে যাস, ফিরিস সারাটা দিন কাটিয়ে। বউমা একলা থাকে। তোরও একটু নিয়মকানুন মেনে চলা উচিত।"

সৌরীন্দ্র মাথা ঝাঁকিয়ে হাসতেন, "ঠিক আছে মা। রোজ রোজ কেন এক কথা বল?"

সৌরীন্দ্র বড়দি গঙ্গাকে যা বলেছিলেন, সংসারের চিত্রটি তেমনই হয়ে উঠেছিল। একই সংসারে সত্যি তখন দুই চিত্র। সৌরীন্দ্র আর প্রণতি এক দিকে। আর এক দিকে সূর্যমোহন আর বসুন্ধরা। এবং অনন্ত, এলোকেশী, সত্যমাসী, সবাই গৃহের কর্তা-কর্ত্রীরই যেন অনুগামী ছিল। তারাও তেমন প্রয়োজন না হলে, কথা বলতো না। যন্ত্রের মতো কাজ করে যেতো। এলোকেশী নির্দেশমতো প্রণতির চুল বেঁধে দিতে যেতো, বা আলতা পরাতে যেতো। প্রণতি তাকে ফিরিয়ে দিতেন। এলোকেশীর বয়সই শুধু বেশি না। বাসন মাজা কাপড় কাচা ঝিয়ের হাতে তিনি কখনও চুল বাঁধেন নি, আলতাও পরেন নি। তাঁদের ভবানীপুরের বাড়িতে সপ্তাহে কম করে একদিন নরসুন্দরপত্নী মাসতলা আর ঝামা দিয়ে পা গোড়ালি পরিষ্কার করে, নখ কেটে আলতা পরিয়ে দিয়ে যেতো। চুল বেঁধে দেবার দায়িত্বও ছিল তাদেরই। কিন্তু তারা চুল বাঁধার নিত্য নতুন ফ্যাশান শিখতো না। তার চেয়ে বাড়ির অল্পবয়সী দাসী বাঁদীরা ভালো চুল বাঁধতো। বিশেষ বিশেষ দিনে, চুল বাঁধার জন্য ছিলেন সেই সব বউদি কাকীমার দল, যাঁদের আয়ত্তে ছিল কেশবিন্যাস-বন্ধনের নতুন ফ্যাশান।

অতএব, প্রণতি শ্বশুরালয়ে তাঁর নিজের চুল নিজেই বাঁধতেন। আলতাও পরতেন। আর বসুন্ধরার নির্দেশমতো, প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় যখন চিলে-কোঠায় গৃহদেবতা বনমালীর নিত্যপূজায় আসতেন পূজারী ব্রাহ্মণ, তখন উপস্থিত থাকতেন। তবে এ নির্দেশ তিনি বেশি দিন পালন করতে পারেন নি। সৌরীন্দ্র আপত্তি করেছিলেন।

সৌরীন্দ্রর মনে জমে উঠেছিল ক্ষোভ আর বিমর্ষতা। তাঁর স্পষ্টতই মনে হয়েছিল, পিতার সংসারে তিনি আর প্রণতি যেন এক কোণে পড়ে থাকা নবদম্পতি। তাঁর তবু রীতিমতো বড় রকমের বাইরের জগৎ ছিল। প্রণতির তা ছিল না। ভগ্নিরা চলে যাবার পরে, তিনি কিছু দিন, খুব প্রয়োজন না হলে, প্রণতিকে ছেড়ে যেতেন না। অবিশ্যি সেই সময়ে তাঁর কাছে প্রণতির আকর্ষণও কম ছিল না। কিন্তু কলেজের চাকরি ছাড়াও, তাঁর পার্টির কাজ ছিল বিস্তর। প্রণতি যদি ঘন ঘন পিত্রালয়ে যেতেন, তাঁর শ্বশুর শাশুড়ি আপত্তি করতেন না। কিন্তু স্বয়ং সৌরীন্দ্রই তাঁকে ছাড়তে চাইতেন না। সেই না ছাড়তে চাওয়ার মধ্যে কেবল স্ত্রীর অভাব বোধটাই একমাত্র কারণ ছিল না। প্রণতিকে তিনি যেভাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, সেদিক থেকে শ্বশুরবাড়ির পরিবেশ ছিল বিপরীত। তবু, প্রণতির নিজেব আর অন্যান্য ভগ্নি ও ভগ্নিপতিবাহিনীর দল যখন আসতো, তখন সৌরীন্দ্রর বলার কিছু থাকতো না। তিনি সবাইকে অভ্যর্থনা করতেন। প্রণতি খুশি হত। সৌরীন্দ্রকেও প্রণতিকে নিয়ে মাঝে-মধ্যে শ্বশুবালয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যেতে হত।

প্রণতির পিত্রালয়ে কোনো বকমের রাজনীতির হাওয়া ছিল না। স্বাদেশিকতা বলতে, গান্ধী, সুভাষচন্দ্র ছাড়া. যে-সব ইংরেজ হত্যাকারী দেশপ্রেমিক বিপ্লবীদের ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল, তাঁদের নামগুলো জানা ছিল। কমিউনিস্ট রাজনীতি তাঁর পিত্রালয়ে বাস্তবিকই ছিল বিদেশী ব্যাপার। সৌরীন্দ্র ভালোই জানতেন, তাঁর প্রকাণ্ড শ্বশুরালয়টি-কমিউনিস্টবিরোধী পরিবার। আর বিরোধিতার কারণ ছিল, অজ্ঞতা। তবু যে প্রণতিকে সৌরীন্দ্রর সঙ্গে বিয়ে দিতে তাঁদের বিশেষ আগ্রহ ছিল. তার কারণ সূর্যমোহন ও তাঁর পারিবার। তবে পাত্র হিসেবে সৌরীন্দ্ররও একটা সম্মান ছিল।

সৌরীন্দ্র প্রণতিকে আগাপাশতলা কমিউনিস্ট তৈরি করে তুলতে পারবেন, তা ভাবেন নি। একুশ বছরের প্রণতির পক্ষেও তা সম্ভব ছিল না। সৌরীন্দ্র তাঁর মন থেকে ধর্মের গোঁড়ামি দূর করতে চেয়েছিলেন। বোঝাতে চেয়েছিলেন, কমিউনিস্ট পার্টি গরীব শ্রমিক কৃষকের পার্টি। সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা পার্টির লক্ষ্য। সমাজতন্ত্র কি এবং কেন, সোভিয়েট রাশিয়া, জনযুদ্ধ, কংগ্রেসের চরিত্র, গান্ধীবাদ

ইত্যাদি বিষয়ে সেই সময়ে প্রকাশিত সহজপাঠ্য বই কিনে দিয়েছিলেন। বিপ্লব কী, এবং বিপ্লব যে ভবিষ্যতে একদিন ঘটবেই, এই বদ্ধমূল ধারণাটা প্রণতির মনে তিনি গেঁথে দিয়েছিলেন। ভবিষ্যতের সেই বিপ্লব যে বহু দূরের ব্যাপার নয়, বেঁচে থেকেই সৌরীন্দ্র সেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবেন, এমন একটা বিশ্বাস, প্রণতির মনে সৃষ্টি করেছিলেন। পরবর্তীকালে, সুদীপকে যখন তাঁর রাজনীতি শিক্ষা দিয়েছিলেন, তখন অবিশ্যি বিপ্লবের সময় সম্পর্কে তিনি মত বদলেছিলেন।

প্রণতির মন থেকে সৌরীন্দ্র যে ধর্মবিশ্বাস দূর করতে পারেন নি, সেটা বর্তমানে একটি প্রশ্নাতীত বিষয়। কিন্তু তার জন্যে এখন সৌরীন্দ্রর মনে কোনো ক্ষোভ বা প্রতিবাদ নেই। কিন্তু সেই সময়ে তাঁর নিষেধ মেনে, প্রণতি চিলেকোঠায় বনমালীর পূজার সময় উপস্থিত থাকতেন না। প্রণতির আশঙ্কা ছিল, শাশুড়ি তাঁকে ভর্ৎসনা করবেন। কিন্তু বসুন্ধরা তা করেন নি। বরং বলেছিলেন, "স্বামীর কথা মেনে চলাই স্ত্রীর একমাত্র কর্তব্য।"

সৌরীন্দ্রর ক্ষোভ ও বিমর্ষতা প্রণতির মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছিল। নববধূ হিসেবে তাঁর প্রত্যাশাও মেটে নি। শ্বশুর শাশুড়ি তাঁর কাছে ছিলেন অনেক দূরের মানুষ। যে সময়ে তাঁদের স্নেহ আদর পাবার কথা, তখন তাঁরা এক ভিন্ন জগতের অধিবাসী। তিনি শুনেছিলেন, এবং জানতেন, তাঁর শ্বশুর দেবতুল্য ব্যক্তি। তথাপি তিনি স্বামীকেই বিশ্বাস করেছিলেন, শ্বশুরমশাই দেশের শত্রু। শাশুড়ি না বুঝে, শ্বশুরমশাইয়ের অন্ধ অনুগামিনী ছিলেন। প্রণতি তাঁর স্বামীকেই দেবতুল্য জ্ঞান করতেন। তাঁর সমস্ত কথাই বিশ্বাস করতেন। পিত্রালয়ে কেউ তাঁর স্বামীর রাজনীতির বিরুদ্ধে কিছু বললে, প্রতিবাদ করতেন। জনযুদ্ধ পত্রিকা তাঁর মুখস্থ থাকতো। তবে, তিনি এখন অনায়াসেই স্বীকার করেন, "বনমালীর ঘরে যেতে না পেরে আমার মনটা নানা অমঙ্গল চিন্তায় ভরে থাকতো। মনে মনে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইতাম। স্বামীর কল্যাণ কামনা করতাম।" সৌরীন্দ্রও এখন প্রণতির ধর্মবিশ্বাসকে তাঁর একান্ত নিজস্ব বিষয় বলে গণ্য করেন।

সৌরীন্দ্রর মনে এ উদারতা জন্মেছে সময় ও কালের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। কিন্তু তিনি কি আগেও জানতেন না, প্রণতি সর্বাংশে তাঁর পক্ষে থাকলেও, ধর্ম ও দেবদেবীর জগৎ থেকে তাঁকে কখনও বিচ্যুত করা যায়নি! জানতেন। স্বীকারও করেন। কিন্তু প্রণতি যেহেতু কোনোকালেই ধর্মের বিষয় নিয়ে তাঁর রাজনীতির বিরোধিতা করেন নি, সেইহেতু তিনি চুপচাপ মেনে নিয়েছিলেন।

সুদীপ একদা মনে করতো, সৌরীন্দ্র ঠিক কাজই করেছিলেন। মা যেমন বাবার রাজনীতির বিরোধিতা করতেন না, তেমনি তিনি বাইরে ধর্মের প্রচারও

করতেন না। করলে, সেটা হত জনসাধারণের প্রতি শত্রুতা করা। কারণ, মার্কস্-এব মতেব একটা মূল বিষয়ই হল, "ধর্ম জনগণের জন্য আফিম স্বরূপ"।
আর এই সুদীপের অনিয়মিত রোজনামচায়, ছ' বছর আগে এক জায়গায় অবাক কয়েকটি কথা লেখা হয়েছিল। "মা বাবাকে কালীঘাটের কালীপুজোর প্রসাদ দিতে গেলেন। বাবা মাথা নেড়ে আপত্তি কবলেন। কিন্তু মা জোর করে বাবার কপালে প্রসাদ ছুঁইয়ে বাবাকে হাঁ করতে বললেন। বাবা হাঁ করলেন! প্রসাদ খেলেন!! তারপরেও মা পুজোর ফুল বাবার বুকে কপালে মাথায় ছুঁইয়ে তাঁর জামার পকেটে গুঁজে দিলেন। বাবা হাসতে হাসতে চলে গেলেন। কিন্তু সে-ফুল বাবার পকেটেই থেকে গেল। বাবা আজ বিপুল ভোটে এ্যাসেম্বলিতে জয়ী হয়েছেন!"

সৌবীন্দ্রব সেই প্রথম জয় না। তিনি আগেও জয়ী হযেছেন। সুদীপ মাকে পুজো দিতে দেখেছে। বাবাকে প্রসাদ খেতে দেখেনি। অন্তত প্রকাশ্যে দেখা যায়নি। অথচ সূর্যমোহনের সঙ্গে সৌরীন্দ্রর ধর্ম আর ঈশ্বব নিয়ে বহু বিতর্ক হয়েছে। সুদীপ সে-সব কথা ভোলেনি। সূর্যমোহনেব ধর্ম আব ঈশ্বরতত্ত্ব শুনলে, তাঁকে যেন কেমন সেই প্রাচীনকালের সাধুসন্ত বলে মনে হয়। যাঁদের রাগ দ্বেষ তিক্ততা ছিল না। যাঁরা কোনো অপমান বা শাস্তি পেলেও হাসি মুখে শান্ত আর নির্বিকার থাকতেন। যাঁদের অমোঘ বিশ্বাসে কোনো শক্তিই ফাটল ধরাতে পারতো না। সুদীপ বিশ্বাস করতো, ওব ঠাকুর্দা ছিলেন একজন ধার্মিক আর প্রতিক্রিয়াশীল মানুষ। যেমন মনে করতো গান্ধীকে।

সৌরীন্দ্র সূর্যমোহনকে সরাসরি আক্রমণ করতেন, "আপনারাই ধর্মের নামে দেশেব সর্বনাশ কবছেন।"

"কোন্ ধর্মের কথা বলছো তুমি?" সূর্যমোহনের নিরীহ হাসি দেখলে মনে হতো, তিনি সর্বদাই আত্মরক্ষা করে কথা বলতেন, "আমাদের ধর্ম শব্দের সঙ্গে ইংবেজি রিলিজিয়ন কথাটা ঠিক মেলে কী? 'রিলিজিয়ন'-এর মানে একটাই। আমাদের ধর্ম শব্দেব অনেক অর্থ।"

সৌরীন্দ্রব ভ্রূকুটি চোখে সন্দিগ্ধ জিজ্ঞাসা ফুটে উঠতো, "যথা?"

"তুমি ইতিহাসের ছাত্র হয়ে আমাকে জিজ্ঞেস কবছো, যথা?" সূর্যমোহন অবাক হাসতেন "আমাদের জীব ধর্ম আছে। সমাজের কাজকেও আমরা ধর্ম বলি—সমাজধর্ম। তেমনি মানবধর্ম। সংসারধর্ম। তোমার তো এ সব না জানার কথা নয়?"

সৌরীন্দ্রও মাথা ঝাঁকিয়ে, তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বক্র হাসতেন, "জানবো না কেন? কিন্তু ওসব কর্মের বিষয়ে ধর্ম শব্দকে যোগ করা একটা অর্থহীন ব্যাপার।

ধর্ম ধর্মই।"

"তাই কী ?" সূর্যমোহন যেন অন্যমনস্ক হয়ে যেতেন, "তোমার কি মনে হয় না, আমাদের নানা কাজকে ধর্ম বলার মধ্যে একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে ?"

সৌরীন্দ্র মাথা নাড়তেন, "না। বরং ধর্ম শব্দটি প্রয়োগ করে, সব কিছুর মধ্যেই একটা অধ্যাত্মের প্রলেপ দেবার চেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়। ইংরেজি রিলিজিয়ন ছাড়া ধর্মের আর কোনো অর্থ আমি মানি নে।"

"অথচ, আমি জানি, আমার জীবধর্মের মধ্য দিয়ে তোমাকে পেয়েছি।" সূর্যমোহনের মুখে থাকতো প্রশান্ত হাসি, "যে-ধর্মটার মধ্য দিয়ে আমরা প্রাণী হিসেবে বাঁচি।"

সৌরীন্দ্রর বক্র ঠোঁটে ঝলকে উঠতো ধারালো বিদ্রূপ, "আমার কথা শুনে রাগ করবেন না। ও কথাগুলোর মধ্যে কেমন একটা চালাকি আছে। আহার মৈথুন, এ সবের সঙ্গেও ধর্ম শব্দটি জুড়ে প্রবৃত্তিকেও একটা অপার্থিব মাত্রা দেবার চেষ্টা।"

"ঐ ইংরেজি শব্দটার বাইরে তুমি কিছুতেই আসতে পারো না।" সূর্যমোহন যেন কিছুটা অসহায় হয়েই মাথা নাড়িয়ে হাসতেন, "মুশকিলটাও সেখানেই। অপার্থিব ভাবছো কেন ? জীবধর্ম আর প্রাণীধর্ম, যাই বলি, একটা বড় কথা হল, আমরা মানুষ। মানুষের প্রবৃত্তিকে তুমি যে-কোনো অর্থেই, ভিন্ন মাত্রা দেবে না ?"

সৌরীন্দ্র চিন্তিত মুখে, মাথা ঝাঁকাতেন, "মানুষ তো শিশ্নোদরপরায়ণ জীব নয়। তার প্রবৃত্তির সঙ্গে পশু-প্রবৃত্তিকে আমি মেলাতে পারিনে। কিন্তু তা বলে আপনার ঐ ধর্ম আমি জুড়তে পারিনে।"

"পেরো না।" সূর্যমোহন প্রসন্ন হাসতেন, "ধর্মের নামে আমাদের অনেক অধর্মের মার খেতে হয়,এ কথাটা যতোটা সত্যি, তার চেয়েও কিন্তু বেশি সত্যি, আমাদের সব কিছুতেই রয়েছে ধর্ম। তুমি যাকে রিলিজিয়ন বলো, সেই অর্থেই।"

সৌরীন্দ্রর সেই মাথা ঝাঁকানো তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের হাসি উঠতো ঝলকে, "এটা তো আপনার পুরনো কথা। আর ঐ ধর্মকেই আপনারা জীইয়ে রাখতে চান। মার খাওয়াটাকে স্বীকার করেও।"

"মারটা তো আসলে ধর্মের নামে অধর্মের মার।" সূর্যমোহন হেসে মাথা নাড়তেন, "অধর্মের যেটা আমাদের দেশে সব থেকে বড় পাপ আর অন্যায়, সেই জাতপাত অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই। ভারতবর্ষে শোষণের ভিত্‌টাও যে সেখানেই। সেটা কি স্বীকার করো ?"

সৌরীন্দ্র মাথা নাড়তেন, "পুরোপুরি না। ভারতবর্ষে কলকারখানার বয়স একশো বছর হতে চললো। সেখানে শ্রমিকদের কথা ভুললে চলবে কেন?"

"আমার মনে হয়, তুমি যে-শ্রমিকদের কথা বলছো, তাদের মধ্যেও জাতপাতের ব্যাপার আছে।" সূর্যমোহনের স্বর সব সময়েই থাকতো উত্তেজনাহীন, "শিল্পাঞ্চলের বস্তিগুলোতে তোমরা হয়তো সেই জাতপাতের ব্যাপারটা টের পাও না। তোমাদেব নজরটা ট্রেড ইউনিয়নের দিকে বেশি। সেটা খারাপ নয়। কিন্তু দেশেব শ্রমিকদেব চরিত্র না বুঝলে, ট্রেড ইউনিয়নের আন্দোলন কি সার্থক হবে? আমাদের শ্রমিক ইওরোপের শ্রমিক নয়। আর একটা কথা। মানা, না মানা তোমার ইচ্ছে। বলেছো ঠিকই, ভারতবর্ষে কলকাবখানার বয়স একশো বছর হতে চললো। কিন্তু একশো বছরে ক'টা কলকাবখানা হয়েছে? এতবড় দেশে, কাবখানা শ্রমিকের সংখ্যাই বা কতো? সেদিক থেকে দেখতে গেলে, আমাদের দেশ এখনো গ্রামভিত্তিক। শোষণেব আসল ভিতটাও সেখানেই।"

সৌরীন্দ্র সবাসরি স্বীকাব না করলেও জানতেন, যে-কোনো শিল্পেই শ্রমিকদেব মধ্যে জাতপাতের ব্যাপারটা ছিল। এমন কি, কর্পোরেশন শ্রমিকদের মধ্যেও ছিল জাতপাতের সূক্ষ্ম বিচাব। তা নিয়ে তাদের গোষ্ঠী পঞ্চায়েতে নালিশ বিচার হতো। আবও একটা বিষয় শিল্পাঞ্চলে দেখা যেতো। শ্রমিকরা বেশিব ভাগই আসতেন ভারতেব নানা প্রান্তেব গ্রাম থেকে। সেখানে গ্রাম সমাজের শাসন থেকে, সব জাতের শ্রমিকরাই শিল্পাঞ্চলে নিজেদের অনেকটা স্বাধীন মনে করতো। কিন্তু তারা জানতো, কাবখানার কাজের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে, আবার তাকে গ্রামে ফিরে যেতে হবে। যাদের সেই পিছুটান ছিল না, বংশপরম্পরায় কারখানাই যাদের ভরসা, তাদেব সংখ্যা নগণ্য। আর এই পিছু টান-না-থাকা শ্রমিকদের মধ্যেই ছিল আন্দোলনেরও আসল শক্তি। শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব বলতে যা বোঝায়, সেই শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য ছিল এদের মধ্যেই। সৌরীন্দ্ররা যখন জেল থেকে বেরোননি, তাঁদের আন্দোলনের সামিল হওয়ার আগেই, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হবারও অনেক আগে, এই পিছুটান-না-থাকা শ্রমিকরা লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিয়েছে। এদের মধ্যে জাতপাতের বিচার ছিল না। কারণ এদের ফিরে যাবার মত কোনো গ্রাম ছিল না। গ্রাম সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না। ছিটেফোঁটা জমির স্বপ্ন দেখার মতো মনোবৃত্তিও এদের ছিল না। কারণ এরা যেহেতু গ্রাম থেকে আসেনি, আর গ্রামে পূর্বপুরুষের রেখে যাওয়া জমির টানেই, পরিবারের কিছু লোককে গ্রামে রেখে, শহরে কলকাবখানায় কাজ করতে আসেনি, কলকারখানার কাজের মাইনে জমিয়ে, গ্রামের জমির পরিমাণ

বাড়াবার চিন্তাও এদের ছিল না, সেইহেতু কারখানাকে ঘিরেই ছিল এদের জীবনের যা কিছু ভালো মন্দ। অবিশ্যি ভারতবর্ষের নানা অঞ্চল থেকে আসা গ্রামের অসংখ্য শ্রমিকরাও সকলেই গ্রামে ফিরে যেতে পারতো না। সেখানে সর্বস্বান্ত হয়ে, কোনো কোনো পরিবারকে চিরকালের জন্য কারখানার শ্রমিক জীবন মেনে নিতে হত। এরাও সেই পিছুটান না-থাকাদের শ্রেণীভুক্ত হয়ে যেতো। আর এই গোষ্ঠীভুক্ত শ্রমিকরা কারখানার কাজেও ছিল বিশেষ দক্ষ।

সৌরীন্দ্ররা জানতেন, এই পিছুটান না-থাকা শ্রমিকদলই আসলে প্রলেতারিয়েত। সর্বহারা। যাদের হাতের শেকল ছাড়া আর কিছুই খোয়াবার ছিল না। দেখেছিলেন, এদের ভিতর থেকেই বেরিয়ে আসছিল সত্যিকারের লড়াকু মজদুর। এদেরই নেতৃত্বে শ্রেণী বিপ্লব ঘটবে, এ বিষয়ে তাঁদের কোনো সন্দেহ ছিল না। এদের বিপ্লবের নেতৃত্ব দেবার জন্য, সৌরীন্দ্র নিজেকে, এবং তাঁর মতো আরও অনেককেই মনে করতেন, বুদ্ধিজীবী তাত্ত্বিক নেতা। সেই জন্যই তিনি সূর্যমোহনের কথায় হেসে মাথা নাড়তেন। "গান্ধীবাদীরা একটা পুরনো ধারণা নিয়ে কুসংস্কারে ভুগছে। দেশ এগিয়ে চলেছে কোন দিকে, সে-খেয়াল তাদের নেই। শোষণের আসল ভিত এখনো গ্রাম, অতএব জাতপাত অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের মতো সংস্কারমূলক কাজকেই আপনারা রাজনৈতিক আন্দোলন মনে করছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সবে শেষ হয়েছে। আপনাদের নেতা আর কর্মীরা সব জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে। কিন্তু অহিংসা আন্দোলনের কোনো পরিবেশ আর নেই। আর এটাও এখন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, আমরা ফ্যাসিবিরোধী সংগ্রামের জন্য আমাদের কর্তব্যে অবহেলা করিনি। বলা হতো আমরা বৃটিশের দালাল। অথচ দেশের স্বাধীনতা নিয়ে, ইংরেজরা কংগ্রেস আর মুসলিম লিগের সঙ্গে কথা বলছে। যুদ্ধ শেষ হতেই আপনাদের লেলিয়ে দেওয়া সমাজবিরোধীরা আমাদের ঠ্যাঙালো। রশীদ আলি দিবস উপলক্ষে যে ঝড় উঠলো, আপনারা সেটাকে নিজেদের কাজে লাগালেন। যেন আপনারাই আন্দোলনটা করেছেন। বম্বের নৌবিদ্রোহকেও বানচাল করলেন আপনারা। তারপর—"

"গত ষোলই আগস্টে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গাটাও লাগালাম আমরাই।" সূর্যমোহনের দুই চোখে হাসি ও কৌতুকের ছটা ঝিলিক দিতো, "ওটাই বা বলতে বাকি রাখো কেন?"

সৌরীন্দ্র সজোরে ঘাড় ঝাঁকিয়ে, বক্র হাসতেন, "না, সরাসরি আপনারা লাগাননি, লাগিয়েছে আপনাদের স্যাঙাতরা—যে সাহেবদের সঙ্গে এখন আপনাদের আর মুসলিম লিগের নেতারা দেশ ভাগাভাগির চক্রান্তে মেতেছে।"

"চক্রান্ত ?" সূর্যমোহন চোখ বুজে হাসতেন, "দেশ বিভাগের ব্যাপারে তোমাদের মতামতটাও জানি। ষোলই আগস্টের ডাইরেক্ট অ্যাকশনের ডাক দেবার দরকার, কার এবং কেন হয়েছিল, সে-সব তোমার অজানা থাকবার কথা নয়। গান্ধীজীর সঙ্গে তোমাদের পার্টির লোকেরাও পূর্ববঙ্গের জেলা আর গ্রামগুলোতে ঘুরেছে। আমি গান্ধীবাদী, এর মধ্যে কোনো ফাঁকি নেই। সেই ভেবেই তোমাকে বলতে পারি, ভবিষ্যতে কংগ্রেসের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কেমন দাঁড়াবে, আমি নিজেও জানিনে। কিন্তু এসব কথা থাক। শোষণের আসল ভিত গ্রাম—আমাদের কুসংস্কার, ঐ সব নিয়ে কী যেন বলছিলে ?"

সৌরীন্দ্রর স্বরে গাম্ভীর্য নেমে আসতো, "হ্যাঁ, আমি বলতে চাইছিলাম, ভারতবর্ষকে গ্রামভিত্তিক ভেবে, আর শোষণের ভিতটাও গ্রামেই, অতএব শ্রমিকদের কথা ভুলে থাকতে হবে, সেটা আমি মানি নে। বরং শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই ভারতেব লক্ষ্য হওয়া উচিত। গান্ধীবাদ আজ সব দিক থেকেই ব্যর্থ, এটা প্রমাণ হয়ে গেছে।"

"এর পরে তো আর কোনো কথাই চলে না।" সূর্যমোহন হেসে হতাশার ভঙ্গিতে হাত নাড়তেন।

সৌরীন্দ্রর ঠোঁটে সেই বক্র হাসির ঝিলিক, "কেন ? এর পরেও আপনারা বড় গলায় বলে বেড়াবেন, গান্ধীজীর অহিংস নীতির দ্বারা চালিত কংগ্রেসই এ দেশকে স্বাধীন করেছে।"

"আমি তো পাগল হইনি, ওরকম উদ্ভট কথা বলবো।" সূর্যমোহন হাসতেন, "অবিশ্যি সব দলেই কিছু পাগল থাকে। তারা অনেক কিছুই বলে। তাতে কান দিতে গেলে চলে না। হয়তো খুব শীগ্‌গিরই ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে। তার জন্যে কতো মানুষ প্রাণ দিয়েছে, ফাঁসিকাঠে ঝুলেছে। সারাজীবন জেলের অন্ধকারে পচেছে। কংগ্রেস কী বলবে না বলবে, তাতে কী যায় আসে ? বহু মানুষের প্রাণের মূল্যে, দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণার মূল্যেই স্বাধীনতা আসবে। অবিশ্যি জানি নে, সে-স্বাধীনতার কী স্বরূপ। তুমি তো একসঙ্গে অনেক কথা বলছো। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই ভারতের লক্ষ্য। গান্ধীবাদের ব্যর্থতা প্রমাণ হয়ে গেছে। এসব কথার মাঝখানে অনেক ফাঁক থেকে যাচ্ছে। তা যাক, কেন না, এত তর্কে কী লাভ ? তবে তুমি যেমন কিছু কিছু বিষয় মানতে পারো না, তেমনি আমিও গান্ধীবাদের ব্যর্থতা মেনে নিতে পারিনে। আব এটাও ঠিক, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য যে বিশাল সংখ্যক জনগণ তাঁর নেতৃত্বে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, আর কারোর নেতৃত্বেই তা সম্ভব হয়নি। এ যুগে পৃথিবীতে এত বড় নেতা আর একজনই—অন্তত আমার চোখে এখন পর্যন্ত, আর একজনই জন্মেছিলেন। তাঁর

বড় অবদান, তিনি তাঁর দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।"

সৌরীন্দ্রর চোখের দৃষ্টিতে পরম বিস্ময়ের সঙ্গে তাঁর বক্র হাসি বক্রতর হয়েছিল, "আপনি কি লেনিনের কথা বলছেন ?"

"হ্যাঁ, তাঁর কথাই বলছি।" সূর্যমোহনের মুখে প্রসন্ন হাসির সঙ্গে গভীর আগ্রহও প্রকাশ পেতো।

সৌরীন্দ্রর চোখে মুখে বিস্ময় বিদ্রূপ আর হাসি, অনেকটাই যেন পাগলের প্রলাপ শোনার মতো দেখাতো, "লেনিনেব সঙ্গে আপনি গান্ধীর তুলনা করছেন ?"

"করছি।" সূর্যমোহনের হাসির সঙ্গে, তাঁর ঘাড় ঝাঁকানির মধ্যে থাকতো একটা দৃঢ় প্রত্যয, "প্রথমত কোনো দেশের কোনো নেতাকে ঘিরেই, সারা দেশ এমন উত্তাল হয়ে ওঠেনি। এঁদের দুজনকে ঘিরে দেশের কোটি মানুষ তাদের সর্বস্ব ত্যাগ করে বেরিয়ে এসেছিল। দুজনের আদর্শ আর মতবাদ নিশ্চয়ই আলাদা। কিন্তু দুজনেই বিপ্লবী।"

সৌরীন্দ্র হাসতেও ভুলে যেতেন, "বিপ্লবী কোন্ অর্থে, একটু বুঝিয়ে বলতে পারেন ?"

"পারি।" সূর্যমোহন স্মিত হাসলেও, তাঁর দৃঢ় প্রত্যয়ের কোথাও দ্বিধা দ্বন্দ্বের চিহ্ন থাকতো না, "বিপ্লবী বলতে তুমি কী বোঝ, আমি জানিনে। আমি সহজ কথাটাই বুঝি। প্রচলিত সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে যিনি সম্পূর্ণ রূপান্তরিত করতে চান তিনিই বিপ্লবী। কে কীভাবে চান, সেটা আলাদা কথা। তবে, যিনি যে-ভাবেই চান বা করুন, মানুষের কল্যাণ সাধনই তাঁর মূল লক্ষ্য। আর এই কারণেই, তাঁদের পরস্পরের বৈপরীত্যের মধ্যেও থাকে একটা ঐক্য।"

সৌরীন্দ্র বিরক্ত অধৈর্য হয়ে উঠতেন, "কিন্তু আপনার গান্ধী কী বিপ্লবটা করলেন ? কী রূপান্তরই বা তিনি চেয়েছেন ?"

"মহাত্মার সমস্ত জীবনটাই তো রূপান্তরের সাক্ষী।" সূর্যমোহনের কিছুতেই ধৈর্যচ্যুতি ঘটতো না, "তিনিই একমাত্র সেই ব্যক্তি, যিনি বুঝেছিলেন, দেশের মুক্তির উপায় বাইরেব ধ্যানধারণা থেকে আসবে না। কারণ, ভারতের মানুষ এই মুহূর্তে তার জন্য প্রস্তুত নয়। কিন্তু আবার একথাও সত্যি, বিদেশীদের দেশপ্রেমের অভিজ্ঞতাই তাঁকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছে। বিদেশীদের অপমান আর লাঞ্ছনাই আবার তাঁকে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামেও প্রবুদ্ধ করেছে। আর তখনই তাঁকে তাঁর জাতীয় নীতি আর কৌশলের কথা ভাবতে হয়েছে। দেশের মানুষের কথা মনে রেখেই। বিরুদ্ধ শক্তির কথাও তিনি ভোলেননি। তাই তাঁর অহিংসা নীতিই বিপ্লব। যা ছিল একদা একটি পরম ধর্মমত, গান্ধীজী

সেই ধর্মমতকেই রাজনৈতিক সংগ্রামের হাতিয়ার করেছেন।"

সৌরীন্দ্র অধৈর্য ক্ষোভেই হা হা করে হেসে উঠতেন, "এর নাম বিপ্লব ?"

"তার সঙ্গে অসহযোগ।" সূর্যমোহনের মুখের হাসিতে কোনো বৈকল্য ঘটতো না, "আইন অমান্য। ডাণ্ডি অভিযান। অসহযোগের মধ্যে কোথাও ত্রুটি ছিল, তিনি পরে তা হৃদয়ঙ্গম করেছেন। কিন্তু নিরস্ত্র মানুষের বিরাট ব্রিটিশ শক্তির নির্দয় ও নির্মম অস্ত্রের বিরুদ্ধে এই সব আন্দোলন, শাসককে যে কতোখানি খেপিয়ে তুলতে পারে, নিরস্ত্র মানুষের ওপর সশস্ত্রের নির্দয় মার থেকেই তা বোঝা যায়। ভারতীয় সমাজে অস্পৃশ্যতা এক মহাপাপ। এটা দূরীকরণের লক্ষ্য কেবল এই নয়, সবাই একসঙ্গে মন্দিরে গিয়ে উপাসনা করবে। সুদূরপ্রসারী এর পরিণতি। কারা অস্পৃশ্য এদেশে ? দরিদ্রতম মানুষরা। যাদের উদ্দেশ্যে, মহাত্মার উক্তি হল, 'দরিদ্রনারায়ণো কি শ্রীচরণো মে'। এ দরিদ্রনারায়ণই তো তোমাদের ভাষায় প্রলেতারিয়েত।"

সৌরীন্দ্র ফেটে পড়তেন অট্টহাসিতে, "দরিদ্রনারায়ণ মানে প্রলেতারিয়েত ? সেই শেষ পর্যন্ত ধর্ম ! কিন্তু তাদের চরণোমে কেন ?"

"কথাটার অর্থ সেবা।" সূর্যমোহনের প্রসন্ন হাসিতে যেন এক নতুন কিরণ ফুটতো, "সেবার অর্থ শুধু সেবা নয়, তাদের বিরাট শক্তি সম্পর্কে এটা একটা যেমন ধারণা, তেমনি সেই ধারণাটিকে তাদের মধ্যে জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যেই শ্রীচরণো মে। এখানে তোমার রিলিজিয়ান নেই।"

সৌরীন্দ্রর চোখে মুখে প্রকট অবিশ্বাসের অভিব্যক্তি ফুটে উঠতো, এবং যেন শাণিত অস্ত্র হানতেন, "আর রাম ?"

"কোটি কোটি ভারতবাসীর দেবতা রামকে তিনি অগ্রাহ্য করেননি।" সূর্যমোহন যেন আনন্দে হাসতেন, "কিন্তু কেন রাম দেবতা, সেটাই তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। রাম প্রজানুরঞ্জক—প্রজার মনোরঞ্জনের জন্য সব ত্যাগ করতে পারেন। রাম পতিতপাবন। ওটাই আদর্শ নেতার স্বরূপ।"

সৌরীন্দ্র যেন হতাশ হয়ে পড়তেন। মাথা নাড়তেন, আর বিদ্রূপ করে হাসতেন, "এসব ব্যাখ্যার অর্থ আপনিই জানেন। স্বয়ং গান্ধীও এরকম ব্যাখ্যা করেন কি না জানি নে। কিন্তু গান্ধী একজন আদ্যন্ত অধ্যাত্মবাদী, একথা স্বীকার করতে বাধা কোথায় ?"

"কেন অস্বীকার করবো ?" সূর্যমোহনের মুখে অবাক হাসি থাকতো, "কিন্তু দেশের মানুষকে তিনি অধ্যাত্মবাদের শিক্ষা দিতে আসেননি। তিনি তো একজন ধর্মীয় গুরু নন। তিনি একাধারে একজন রাজনৈতিক নেতা এবং দার্শনিক।"

সৌরীন্দ্র ভ্রূকুটি চোখে ঘাড় কাত করে তাকাতেন, "কী তাঁর দর্শন ?"

"বর্তমান জগতের যাবতীয় ব্যবস্থা আর মানুষের মানসিক অবস্থার পরিবর্তন।" সূর্যমোহনের স্বরে গাম্ভীর্য ও সম্ভ্রমের সুর ফুটে উঠতো।

সৌরীন্দ্র ধারালো স্বরে প্রতিবাদ করতেন, "অসম্ভব ! গান্ধীর নামে এ তো আপনি মার্কসের কথা বলছেন !"

"তা কেন বলবো ?" সূর্যমোহন অবাক হাসতেন, "মহাত্মা নাস্তিক নন, বস্তুবাদীও নন। তা বলে, তাঁর ধারণায় কোনো নতুন জগৎ আর মানব সমাজের পরিকল্পনা থাকতে পাবে না ?"

সৌরীন্দ্র সজোরে মাথা নাড়তেন, "না, থাকতে পারে না। তিনি যা করেছেন, তা হল কিছু অবাস্তব উদ্ভট ব্যাখ্যা। আর সে-সব ব্যাখ্যাব সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ভদ্রলোকের কিছু ধর্মীয ধ্যান-ধাবণা। ওবকম দার্শনিক গণ্ডায় গণ্ডায় গোটা পৃথিবীতে জন্মেছেন। কেউ তাঁদের কথা মনে বাখেনি। যাঁর চিন্তা আর ধারণার মধ্যে বিজ্ঞানের লেশমাত্র নেই, তিনি কী কবে বর্তমান জগতের যাবতীয় ব্যবস্থার আর মানুষের মানসিক অবস্থার পরিবর্তনের কথা ভাবতে পারেন ?"

"তা হলে তো কোনো কথাই চলে না।" সূর্যমোহন হেসে মাথা নাড়তেন, "কারণ, তোমার কাছে বিজ্ঞানের একটাই মাত্র ব্যাখ্যা আছে। মার্কসীয় দর্শনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার বাইরে তুমি আর কিছুই ভাবতে পারো না। আর মুশকিলটাও সেখানেই। মার্কসের বিজ্ঞানের ব্যাখ্যাও তোমার কাছে সীমাবদ্ধ। সেইজন্যই তুমি অনায়াসে বলতে পারো, মহাত্মার চিন্তা আর ধারণার মধ্যে বিজ্ঞানের লেশমাত্র নেই। কেন ? না, যেহেতু তিনি তাঁর জগত-ভাবনার মধ্যে বিজ্ঞানের কথাটা বলেননি। কিন্তু ভুলে যাচ্ছো কেন, তিনিও মানুষকে সমাজ থেকে পৃথক করেননি। সমাজকে তিনি শক্তিশালী করতে চেয়েছেন সমস্ত দিক দিয়ে, সেই সমাজেই তিনি মানুষকে বিকশিত হতে দেখতে চেয়েছেন। অবিশ্যিই সেই সমাজ-ভাবনাব সঙ্গে মার্কসের কোনো মিল নেই। মার্কসের সঙ্গে মিল না থাকলেই, জগত-ব্যবস্থার পরিবর্তনের কথা আর কেউ ভাবতে পারবেন না ?"

সৌরীন্দ্রর ঠোঁটে চোখে ঝলকে উঠতো ধারালো বিদ্রূপ, "পারবেন না কেন ? গল্পের গরু গাছে ওঠে, নৌকো পাহাড় দিয়ে যায়। মিস্টার গান্ধী যতো খুশি আজগুবি স্বপ্ন দেখুন, কার কী বলার আছে ?"

"তোমার একথা থেকেই বোঝা যায়, মার্কসের শিক্ষাটাও তোমার কতো সীমাবদ্ধ।" সূর্যমোহনের চোখে হাসি ও কৌতুকের ছটা ফুটতো, "তুমি মার্কসবাদকে একটা পরম সত্য বলে জেনে বসে আছো। কিন্তু তাঁর মতে পরম সত্য বোধটা অজ্ঞানতা ছাড়া আর কিছু নয়। কেন না, পরম সত্যের পরে, জ্ঞান

আর কোনো কাজ করে না। এটা আমার থেকে তোমারই ভালো জানার কথা দ্বান্দ্বিক দর্শন কোনো কিছুকেই চূড়ান্ত, পরম বা পূত বলে মনে করে না। ইয়ং সৎ তৎ ক্ষণিকম্। এ সংসার অনিত্য। মার্কসবাদও অনিত্য। অথচ তুমি তাবে নিত্য বলে ভেবে বসে আছো। অর্থাৎ পরম। আর সেজন্যই, জগত-ব্যবস্থার পরিবর্তনের কথা আর কেউ ভাবতে পাবেন, সেটা তুমি মেনে নিতে পারো না পারলেও, সেটা হবে গল্পেব গরুর গাছে ওঠা, পাহাড়ের ওপর দিয়ে নৌকো ভেসে যাওয়া।"

সৌবীন্দ্রর কপালে ভ্রূকুটি চিন্তাব রেখা ফুটে উঠলেও, তিনি হাসতেন, "মনে হচ্ছে, এঙ্গেলস্-এর হেগেল দর্শনের সমালোচনা থেকে এ যুক্তিটা আপনি পেয়েছেন। কিন্তু আমি তো আপনাকে একবারও বলিনি, পরম সত্য বলে আমি কোনো কিছুকে মানি?"

"সত্যি ? মানো না ? মার্কসবাদকেও না ?" সূর্যমোহন সকৌতুক হাসিতে ঘাড় নাড়তেন জিজ্ঞাসু ভঙ্গিতে, "তা হলে তুমি কি একথা মানো, একেবারে দোষ-ত্রুটিহীন সমাজ বা রাষ্ট্র কেবল কল্পনাই করা যায় ?"

সৌরীন্দ্র দ্বিধার সঙ্গে ঘাড় নাডতেন, "না, এ কথাটা আমি পুরোপুরি মানি নে। কথাটার অর্থ এখন পুরনো হয়ে গেছে, কাবণ পৃথিবীতে সত্যি সত্যি দোষ-ত্রুটিহীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র তৈরি হয়ে গেছে।"

"দোষ-ত্রুটিহীন ?" সূর্যমোহনের চোখে যুটতো অবাক জিজ্ঞাসা, "সেই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রও কি এই দাবী করে ?"

সৌরীন্দ্র দৃঢ়তার সঙ্গে ঘাড় ঝাঁকাতেন, "হ্যাঁ, করে। তা না হলে, পৃথিবীর সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো যখন ফ্যাসিস্টদের কাছে তার পরাজয় চাইছিল তখন সে-সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র শুধু যুদ্ধে জেতেনি। ফ্যাসিস্টদের দেশে নিজেদের দখল কায়েম করেছে।"

"এর জন্য সমাজতন্ত্র নয়, দেশপ্রেমই সব থেকে বড় কথা।" সূর্যমোহন হেসে মাথা নাড়তেন, "যাদের দেশপ্রেম নেই, তাদের কোনো তন্ত্র দিয়েই কিছু হয় না। দেশপ্রেম হল গোড়ার কথা। সারা পৃথিবীর লোক জানে, দেশপ্রেম কতো বড শক্তি, রাশিয়া সেটা এ যুদ্ধে প্রমাণ করেছে।"

সৌরীন্দ্র সজোরে ঘাড় নাড়তেন, "দেশপ্রেমেব কথা বলে, আসল কথাটাই চাপা দেওয়া হয়। ফ্যাসিস্টদের লক্ষ্য ছিল, পৃথিবীর একমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশকে যেমন করে হোক ধ্বংস করতেই হবে। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোও তাই চাইছিল। নিতান্ত দায়ে না পড়লে তারা দ্বিতীয় ফ্রন্ট খুলতো না। এ যুদ্ধের আসল বৈশিষ্টই হল, পৃথিবীর একমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশকে ফ্যাসিস্টদের

করাল থাবা থেকে বাঁচানো। সেইজন্যই দু'কোটি মানুষ প্রাণ দিয়েছে।"

"হ্যাঁ, মানুষ তাঁরা বটে, কিন্তু তাঁদের বড় পরিচয়, দু'কোটি রাশিয়ান।" সূর্যমোহন অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে স্বীকার করতেন, "আর এটাও ঠিক, রাশিয়া পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ। কিন্তু শত্রুর কাছ থেকে দেশ রক্ষাটাই বড় কথা ছিল।"

সৌরীন্দ্রর ঠোঁটে চোখে আবার ঝলকে উঠতো বিদ্রূপের হাসি, "সমাজতন্ত্র নয়?"

"দেশ না বাঁচলে, সমাজতন্ত্র বাঁচতো কী করে?" সূর্যমোহনের মুখে থাকতো শান্ত হাসি, "তোমাদের ভাষায় প্রথম সমাজতন্ত্রী দেশ—তোমাদের 'পিতৃভূমিটি' আসলে তো একটি দেশ। যে-তন্ত্রেরই হোক, দেশটাকে তো আগে বাঁচতে হবে?"

সৌরীন্দ্র সন্দেহে আর অধৈর্য রাগে ঘাড় নাড়তেন, "সমাজতন্ত্র ব্যাপারটাকে আপনি মানতে পারছেন না বলেই, কেবল দেশ বাঁচানোর কথায় জোর দিচ্ছেন। এক্ষেত্রে আমি এটা মানতে রাজী নই। রাশিয়া একটা দেশ বটে, কিন্তু সেটা সমাজতান্ত্রিক দেশ। এটাই হল সব থেকে বড় কথা। আর সেই সমাজতান্ত্রিক দেশকে বাঁচাবার জন্যই দু'কোটি মানুষ প্রাণ দিয়েছে। দেশপ্রেম ছাড়াও, এখানে একটা বড় আদর্শের ব্যাপার রয়েছে। অন্য কোনো দেশের বেলায় সে-আদর্শের কথাটা খাটে না। আর এটাকে আপনি বুঝেও বুঝতে চাইছেন না, কারণ, আপনি বিশ্বাস করেন না, দোষ-ত্রুটিহীন সমাজ বা রাষ্ট্র হতে পারে। আপনি এঙ্গেলস্-এর ঊনবিংশ শতাব্দীর একটা পুরনো ধারণা নিয়ে বসে আছেন, দোষ-ত্রুটিহীন সমাজ বা রাষ্ট্র একমাত্র কল্পনাতেই সম্ভব। আর সেই ধারণা দিয়েই, আপনি আজকের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকেও দোষ-ত্রুটিহীন ভাবতে পারছেন না। এ না পারার কারণটাও কিন্তু আমি বুঝতে পারি।"

"কী কারণ, বলো তো?" সূর্যমোহন অবাক অনুসন্ধিৎসু চোখে তাকাতেন।

সৌরীন্দ্রর চোখে-মুখে ফুটে উঠতো বিদ্রূপের তীব্র ঝলক, "কারণ, গান্ধীজীর জগত-ব্যবস্থার পরিবর্তনের মধ্যেও দোষ-ত্রুটি থাকবে, বা থাকতে পারে, সেটা আগে থাকতেই আপনি জানিয়ে রাখতে চাইছেন।"

"সত্যি ভানু, তোমার কল্পনা শক্তি খুব বেশি।" সূর্যমোহন প্রসন্ন হাসতেন, "মহাত্মার জগত-চিন্তা বিষয়ে তোমার অবিশ্বাসের কারণ বুঝি। তুমি বিশ্বাসই কর না, মহাত্মা কোনো জগত-ব্যবস্থার, মানুষের মানসিক অবস্থার পরিবর্তনের কথা ভাবতে পারেন। যাই হোক, এঙ্গেলস্ সাহেব যা বলেছেন, তার মধ্যে ঐ অনিত্য বিষয়টি আমরা ভারতীয়রা কম বুঝিনি। ইহকালের সবই ক্ষণিকের জন্য,

একথাও আমাদের দেশের মানুষরাই বলেছেন। অথচ এই অনিত্যের মধ্যেও একটা নিত্যের সন্ধান আমরা করেছি।"

সৌরীন্দ্র বাঁকা ঠোঁট টিপে হেসে ঘাড় ঝাঁকাতেন, "এই তো আপনাদের আসল কথা! আর সেই নিত্যের মধ্যে ধর্ম ছাড়া আর কিছু নেই। মানে রিলিজিয়ন।"

"সেই অর্থে ধর্ম আমার কাছে মনুষ্যত্ব।" সূর্যমোহনের মুখে থাকতো শান্ত হাসি, "যে মনুষ্যত্ব মানুষকে সমস্ত রকম নিম্নগামিতার থেকে ক্রমেই ওপরে তোলে। তাকে সাহসী সৎ সংগ্রামী করে তোলে। শুদ্ধ করে তোলে।"

সৌরীন্দ্র হেসে ঘাড় ঝাঁকাতেন, "শুদ্ধ। শুদ্ধ শুদ্ধ। ঐ শুদ্ধতার মধ্যেই ধর্ম আছে। সংজ্ঞাটা কেবলই মনুষ্যত্ব? আপনাদের ঈশ্বরোপলব্ধি নেই?"

"আছে।" সূর্যমোহনের মুখে সেই প্রসন্ন হাসিই থাকতো, "ধর্ম যেমন মনুষ্যত্ব, ঈশ্বরোপলব্ধি হলো তার একটি একান্ত আপন শক্তির সাধনা।"

সৌরীন্দ্রর ভ্রূকুটি চোখে তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসা ফুটতো, "সেটা কী? আর আপনার ঈশ্বরই বা কে? কোন্ ঠাকুর?"

"ঠাকুর?" সূর্যমোহন অবাক হাসতেন, "আমার ঈশ্বর তো কোনো ঠাকুরের মধ্যে নেই। তুমি কি আমাকে কোনো ঠাকুর পুজো করতে দেখেছো?"

সৌরীন্দ্রর ঠোঁটে চোখে থাকতো স্থায়ী বিদ্রূপের হাসি, "না, তা দেখিনি। তবে আপনাকে আমি ছেলেবেলা থেকেই ভোরবেলা একলা চোখ বন্ধ করে চুপচাপ জোড়াসনে বসে থাকতে দেখেছি।"

"হ্যাঁ। সে তো জেলেও দেখেছো।"

"দেখেছি। আপনি জেলে আমাকেও ভোরবেলা গায়ত্রী জপ করতে বলতেন। তখন আমার পৈতে হয়ে গেছলো।"

"ঠিক। তোমাকে আমি আর কোনো শিক্ষা দিইনি। শুধু ঐ জপটাই করতে বলতাম। কারণ তখনও সময় আসেনি, তোমাকে জপ ছাড়া, মনে-প্রাণে একটি রূপের ধ্যান ব্যাখ্যা করবো। জপটাই ঠিক ছিল। জপে মন একাগ্র আর স্থির থাকে। কিন্তু তোমাকে আমি কখনো চৌত্রিশ কোটি দেবতার কথা বলিনি।"

"না, তা বলেননি। সেই পিরিয়ডটা নিয়ে এখন আমার কিছু বলবারও নেই। আপনি যা বলেছেন, তাই করেছি। গায়ত্রী জপ করেছি। গীতা পাঠ করেছি। নিজের লেখাপড়া নিয়ে থেকেছি।"

"সেই সময়টা ছিল আমার কাছে বড় পুণ্যের আর আনন্দের।" সূর্যমোহনের মুখে ফুটে উঠতো এক অনির্বচনীয় সুধা-কিরণ, "আমি তোমার ভবিষ্যতের কোনো ক্ষতি করছি, একবারও মনে হয়নি।"

সৌরীন্দ্রও শান্ত হাসতেন, "আমারও মনে হতো না, আপনি আমার ক্ষতি

করছেন। পরেও মনে হয়নি। আপনি যা বিশ্বাস করতেন, সেই শিক্ষাই আমাকে দিতেন। কিন্তু সে-সময় জেল থেকে ছাড়া পাবার পরে, তিরিশ দশকের মাঝামাঝি আবার আমার জেল হলো। আপনারও হলো। জেলে যাবার আগেই অবিশ্যি আমি আপনার কাছ থেকে সরে যাচ্ছিলাম। তবে সেটা ঠিক সাম্যবাদের দিকে না।"

"এ্যানার্কিজমের—মানে, নৈরাজ্যবাদের দিকে যাচ্ছিলে।" সূর্যমোহনের চোখে ফুটতো হাসি ও কৌতুকের ছটা, "নিত্যানন্দকে তোমার কাছে আসতে দেখেই সেটা বুঝতে পেরেছিলাম। এখন হাসছি বটে, কিন্তু মনটা খুবই মুষড়ে পড়েছিল। তুমি তখন বড় হচ্ছিলে। ডেকে কিছু বলবার ইচ্ছে হলেও, বলতে পারিনি। আমার মনে কেমন একটা বিশ্বাস ছিল, নিত্যানন্দর সঙ্গে গিয়ে, যাঁর কাছ থেকে তুমি দীক্ষা নিয়েছিলে, সেই দীক্ষা তোমাকে বেশি দূর নিয়ে যাবে না। তোমাকে ফিরতে হবে। কিন্তু—"

সৌরীন্দ্রর চোখে-মুখে ফুটতো উজ্জ্বল হাসি, "ফেরা হয়নি। তবে বেশি দূরে নিয়ে যেতে পারেনি, এটা ঠিকই বুঝেছিলেন। আমার সঙ্গে অল্পকালের জন্য জেলে থাকলেও, তখন আপনিও বুঝে গেছেন, আমি আবার নতুন তন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছি। একই জেলে, সেবার আমরা ভিন্ন ওয়ার্ডে ছিলাম।"

"হ্যাঁ।" সূর্যমোহনের হাসিতে কেমন একটা বিষণ্ণতা নেমে আসতো, "তুমি আবার এক নতুন তন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলে। আমি জেলের বাইরে এসে, তোমার সাম্যতন্ত্র সম্পর্কে বইপত্রের খোঁজ করেছিলাম। খোঁজ করতে গিয়ে টের পেলাম, পুলিশের তখন ঐসব বইয়ের ওপর ভীষণ কড়া নজর। ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের লোকেরা, তাদের অনুচরদের হাতে দিতো কাস্তে হাতুড়ি আঁকা ছবি। বলতো, ঐ রকম ছাপওয়ালা বই কোনো বাড়িতে পেলেই যেন খবর দেয়। যাই হোক, মনটা খারাপ হলেও, আমার যে-বিশ্বাসটা তখন জন্মেছিল, এখনো সেটা আছে। বৈপরীত্যের মধ্যেও একটা ঐক্য থাকে। সেটা হল মানুষের কল্যাণ।"

সৌরীন্দ্রর মুখে আবার সেই অবিশ্বাসের হাসি ফুটতো। তিনি ঘাড় নাড়তেন, "ওটাই মুশকিল। আপনার ঐ বৈপরীত্যের মধ্যে ঐক্যের থিসিসটা মেনে নিতে পারি নে। যেখানে ধর্ম আর ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে, সেখানে কল্যাণ থাকে না।"

"তোমার এ বিশ্বাসের কারণ তো একটাই?" সূর্যমোহন জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে হাসতেন, "ইহকালে দুঃখ ভোগ করাটাই, পরকালের সুখের কারণ, বুর্জোয়া আর তাদের ধর্মীয় দালালরা শ্রমজীবী দরিদ্র দুঃখী মানুষদের মনে এ বিশ্বাসটাই ঢুকিয়ে দিতে চায়। এটা হল ধর্ম আর ঈশ্বরকে নিয়ে শোষকদের একটা ব্যবসায়ী চাল। কিন্তু আমরা ধর্ম আর ঈশ্বরকে সেই চোখে দেখি নে।

তোমাকে আমি আগেই বলেছি, ধর্ম আমার কাছে মনুষ্যত্ব, যে-মনুষ্যত্বের ধর্ম মানুষকে ক্রমেই অনেক উঁচু স্তরে তুলে দেয়। এর সঙ্গে নিশ্চয়ই আমার ঈশ্বরোপলব্ধি আছে। তা একান্তই আমার। এর জন্য আমাকে কোনো গুরুর কাছে দীক্ষা নিতে হয়নি। আর সেই উপলব্ধির বিষয়, একজন আইনজীবী হয়ে, আমি আমার মক্কেলদের কাছেও তা ব্যাখ্যা করতে যাই নে। আমরা যাঁরা একই মতবাদ ও আদর্শে বিশ্বাস করি, আমার ঈশ্বরের বিষয় নিয়ে তাঁদের সঙ্গেও আলোচনার কোনো প্রয়োজন হয় না।"

সৌবীন্দ্রর চোখে ভ্রূকুটি সন্দিগ্ধ জিজ্ঞাসা ফুটতো, "আপনার ঈশ্বরের স্বরূপটা তা হলে কী? নিরাকার পরব্রহ্ম?"

"দেখ, এ নিয়ে আমাদের দেশে এক সময়ে বিস্তর বাকবিতণ্ডা হয়েছে।" সূর্যমোহনের মুখে গাম্ভীর্য নেমে আসতো, "কিন্তু আমি এ ব্রহ্মাণ্ডকে নিরাকার ভাবতে পারি নে। নিরাকার পরব্রহ্ম বলতে তুমি যা বোঝাতে চাও, সেটা হল ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তিদের অনুভবের কথা। সে-ক্ষেত্রে আমি ব্রাহ্মও নই। আমার কাছে এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অসীম অনন্ত, অথচ নিরন্তর ধাবমান লক্ষ কোটি গ্রহ সূর্য তারা। আমি অনন্ত জিজ্ঞাসা নিয়ে এই ব্রহ্মাণ্ডের দিকে তাকিয়ে আছি। আর এটাই মনে ভেবেছি, এই অন্তহীন চলমান আকারই ঈশ্বর। তেমনি আমাদের এই পৃথিবীর সমস্ত বস্তুময় জগতের মধ্যেও তিনি রয়েছেন। আবার সকল মানুষের মধ্যেও তিনি রয়েছেন।"

সৌবীন্দ্রর ভ্রূকুটি চোখে দেখা দিতো বিভ্রান্তি আর সংশয়, "খুবই ধাঁধায় ফেলে দিলেন। একটা কথা বুঝলাম, আপনি নির্গুণ পরমাত্মায় বিশ্বাসী নন—"

"নির্গুণ পরমাত্মা, সগুণ পরমেশ্বর, কারোকেই টেনো না।" সূর্যমোহন হেসে মাথা নাড়তেন। "আমি সে-ভাবে ভাবিনি। সব থেকে সহজ করে বলতে হলে, বলতে হয়, আমার ঈশ্বর সর্বভূতেষু! আসলে আমার ধর্মের সঙ্গে ঈশ্বর আছেন সর্বমানবে।"

সৌবীন্দ্র ঠিক বিদ্রূপ না, কিছুটা ঠাট্টাচ্ছলেই জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে হাসতেন, "আপনার সেই সর্বমানবের মধ্যে আমরা কমিউনিস্টরাও আছি তো?"

"না, ওখানে কোনো ভাগাভাগি নেই।" সূর্যমোহন প্রসন্ন হাসতেন, "দলাদলিও নেই। তুমি হয়তো এর মধ্যে শ্রেণী বৈষম্যের প্রশ্ন তুলবে। কিন্তু সর্বমানবের সঙ্গে শ্রেণীবৈষম্যের কোনো যোগ নেই। এই সর্বমানবের মধ্যেই লোভ হিংসা প্রেম ভালবাসা পাপ পুণ্য সব লীলা করছে—মানুষের ভেতরকার যা কিছু ভালো মন্দ। আমার মধ্যেও ঐ প্রবৃত্তিগুলো রয়েছে। যখন লোভ হিংসা

পাপ আমাকে তাড়না করে, তখন আমি আমার ঈশ্বরের শরণ নিই। যখন কোনো কারণে মনে মনে দুর্বল হয়ে পড়ি, তখন তাঁর কাছে শক্তি চাই। তোমাদের কাছে যেমন কোনো 'পরম' বলে কিছু থাকতে নেই, আমার কাছে সর্বমানবের স্বরূপ হলো, সকল শুভাশুভকে ধারণ করে, তিনিই পরম করুণাময় ঈশ্বর। তোমার মতবাদ আর আদর্শ যাই হোক, সর্বমানবে যিনি অধিষ্ঠান করে আছেন, তিনি তোমার মঙ্গল করুন।"...

সুদীপ গান্ধীবাদী পিতামহর কথা যা কিছু সবই শুনেছে ওর মার্কসবাদী গুরু পিতার কাছ থেকে। বিশেষ করে সূর্যমোহনের মতবাদ আদর্শ আর ধর্মতত্ত্ব ঈশ্বর বিশ্বাসের কথা। মায়ের কাছে শুনেছে ব্যক্তি সূর্যমোহনের কথা। যেন, যিনি সংসারের মধ্যে থেকেও ছিলেন একজন আশ্রমবাসী ঋষির মতো। যদিও বিয়ের পরেই, সূর্যমোহন আর বসুন্ধরার আচরণ অনেক কাল তাঁর মনে একটা দুঃখ অভিমান বোধ জাগিয়ে রেখেছিল। অথচ সেই মা পরে সুদীপকে বলেছেন, "আমার শ্বশুর শাশুড়ী সত্যি ঋষি দম্পতি তুল্য ছিলেন।"

সুদীপের নিজের একটা অনুমান, সূর্যমোহন যেমন নিজের ভাবাদর্শে তাঁর একমাত্র পুত্রকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, সৌরীন্দ্রর মনেও সেরকম একটা ইচ্ছা ছিল। ইচ্ছাটাকে প্রেরণা বলাই বোধ হয় সঙ্গত। সূর্যমোহন আর সৌরীন্দ্র, পিতা-পুত্রের মধ্যে, পরবর্তীকালে মতপার্থক্য নিয়ে বিরোধ অবিশ্যিই ছিল! সৌরীন্দ্র কখনও সুদীপের কাছে অস্বীকার করেননি, সূর্যমোহনকে তিনি কঠিন ভাষায় আক্রমণ করতেন। বিদ্রূপ করতেন। না করেও তাঁর উপায় ছিল না। কারণ, সূর্যমোহনকে কিছুতেই ক্ষুব্ধ উত্তেজিত করে তোলা যেতো না। যায়ওনি কখনও। যে কারণে, সূর্যমোহনের কথা শুনতে শুনতে, ওর মনে হতো, তিনি ছিলেন কৃচ্ছ্রসাধক এক সাধুসন্ত। যিনি কোনো অপমান আর শাস্তিতেই বিচলিত হতেন না। তাঁর প্রসন্নতা ছিল যেন এক অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন। কিন্তু স্বয়ং সৌরীন্দ্র, সুদীপের কাছে, তাঁর পিতাকে মানুষ হিসাবে কখনও ছোট করেননি। সূর্যমোহনের গান্ধীবাদ সম্পর্কে বক্তব্য কিছুটা হাস্যকর মনে করতেন। তাহলেও, সেই হাস্যকর মন্তব্যে সূর্যমোহনের ছিল অটল বিশ্বাস। তার মধ্যে কোনো ফাঁকি ছিল না।

সুদীপ খুব অল্প বয়সেই ওর ঠাকুর্দাকে হারিয়েছিল। স্বাধীন ভারতে, বাবা যখন জেলে গিয়েছিলেন, ঠাকুর্দা তখন রোগশয্যায়। সুদীপের বয়স তখন চার। ও ঠাকুরমা বসুন্ধরারও খুবই আদরের পাত্র ছিল। মা প্রণতি ওকে রাত্রে শুয়ে বাবার গল্প বলতেন। তার মধ্যে ঠাকুর্দার কথাও এসে পড়তো। সেটা যেন

অনিবার্যই ছিল। মায়ের কোলে তখন ছিল এক বছরের বোন রঞ্জনা। সুদীপের বেশ কিছুটা সময় কাটতো ঠাকুরমার সঙ্গে। ঠাকুরমা বেশির ভাগ সময় কাটাতেন দোতলায় ঠাকুর্দার শোবার ঘরে। ঠাকুর্দার সত্যিকারের আরাম করার বসবার ঘর ছিল, শোবার ঘরের পাশে, বড় ঘরে। যে-ঘরে এখন সুদীপের বাস।

ঠাকুরমার কাছেও সুদীপ বাবার কথা শুনতো। সেই বয়সে ও বাড়ির সামনেই একটা ছোটদের স্কুলে পড়তো। ওর স্মৃতিশক্তি ছিল বরাবরই বেশ তীক্ষ্ণ। ঠাকুর্দার ঘরে (বড় ঘরে) একটিই মাত্র বাঁধানো ছবি দেওয়ালে টাঙানো ছিল। যষ্টি হাতে খালি গা গান্ধী। ছবিটা ছিল আসলে একটা ফটো। ফটোর নিচে হিন্দিতে যে সইটা ছিল, সেটা নাকি স্বয়ং গান্ধীরই হাতে লেখা। ঠাকুর্দাকে ভালবেসে উপহার দিয়েছিলেন।

স্বাধীন ভারতে, সৌরীন্দ্র জেলে যাবার ছ' মাস আগে, গান্ধী নিহত হয়েছিলেন। সুদীপের সে-কথা অস্পষ্ট হলেও, মনে আছে। ওর যতো দূর মনে পড়ে, দিল্লিতে গান্ধী নিহত হবার সংবাদ রেডিওতে বিকেলের দিকে জানা গিয়েছিল। একতলায় বাবার ঘরে গান্ধীর ছবি ছিল না। দুটো ফ্রেমে বাঁধানো, চারজনের ছবি ছিল। একটা ফ্রেমে কার্ল মার্ক্স আর ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস্। আর একটা ফ্রেমে লেনিন আর স্ট্যালিন। সৌরীন্দ্র জেলে যাবার আগেই, প্রণতি প্রথম পুত্রকে, তার বাবার কথা শোনাতেন, "তোর বাবা হলেন কমিউনিস্ট। এখন তো বুঝবি নে, কমিউনিস্ট কাকে বলে। বড় হলে বুঝবি। তবে একটু মনে রাখলেই হবে, কমিউনিস্টরা হল গরীবদের পার্টি। আর কংগ্রেস হল বড়লোকদের পার্টি। তোর বাবা অল্প বয়স থেকেই জেল খেটেছেন। তুই তখন জন্মাসনি। তুই তো দেখছিস, দেশটা এখন স্বাধীন। আগে স্বাধীন ছিল না। ইংরেজরা আমাদের পরাধীন করে রেখেছিল। তোর ঠাকুর্দাও তখন স্বদেশী করতেন। তোর বাবা তখন ছিলেন তাঁর বাবার সঙ্গে—কংগ্রেস দলের লোক। বাবা ছেলে, দুজনেই জেল খাটতেন। তোর ঠাকুর্দা অনেক দিন জেল খেটেছেন। বাবাও খেটেছেন। তখন দুজনেই কংগ্রেসে ছিলেন। গান্ধী তাঁদের নেতা। তারপরে তোর বাবা যখন কমিউনিস্ট হয়ে গেলেন, তখন আর ঠাকুর্দার সঙ্গে মিল হল না।"

তা হলে বাবা গরীব, আর ঠাকুর্দা বড়লোক, না?" সুদীপের ছিল অগাধ কৌতূহল আর জিজ্ঞাসা।

প্রণতি অস্বস্তিতে পড়ে যেতেন। কথাটার কী জবাব দেবেন, ভেবে পেতেন না। অবিশ্যি এক দিক থেকে, তাঁর শ্বশুর মশাইয়ের আয় ছিল স্বামীর থেকে অনেক বেশি। কিন্তু সেই অসম আয় নিয়ে কখনও কোনো প্রশ্ন ওঠেনি। সেটা

ছিল চিন্তারও অতীত। পিতা-পুত্রের মধ্যে রাজনৈতিক মতামত আর আদর্শের বিরোধ যতোই থাকুক, সংসারটা আসলে ছিল সূর্যমোহনের। তবে উপযুক্ত বয়সের ছেলে হবে উপার্জনশীল, সূর্যমোহনের কাছে সেটা ছিল একটা নৈতিক বিষয়। যে-কারণে, সৌরীন্দ্র কলেজের চাকরি না পাওয়া পর্যন্ত, তিনি বিয়ের ব্যাপারটা স্থির করে উঠতে পারেননি। কিন্তু সংসার খরচের জন্য সৌরীন্দ্রর কাছে তিনি কোনো কালেই অর্থ দাবী করেননি। সৌরীন্দ্রও তা নিয়ে চিন্তিত ছিলেন না। তাঁকে বাবার কাছে হাত পাততে হতো না, সেটাই যথেষ্ট। তবে তিনি একেবারে হাত গুটিয়ে থাকতেন না। তাঁর আয়ের পক্ষে যতো সামান্যই হোক, কিছু টাকা বসুন্ধরার হাতে তুলে দিতেন। সূর্যমোহন সে-খবর জানতেন। প্রণতির পক্ষে সম্ভব ছিল না সুদীপকে মিথ্যা বলবেন। কারণ, স্বামী-শ্বশুরের আয়ে বড় ফারাক থাকলেও, জীবনযাপনে কোথাও সামান্যতম ফারাক ছিল না। অতএব পুত্রের কাছে তাঁর জবাব ছিল, "তোমার বাবা ঠাকুর্দার থেকে অনেক কম টাকার চাকরি করেন ঠিক। তা বলে ঠাকুর্দা কি তোমার বাবার সঙ্গে গরীব বড়লোকের মতো থাকেন? তা তো হয় না। ওঁরা তো বাবা-ছেলে। আসলে তোমার বাবার পার্টি হল গরীবদের পার্টি। ঠাকুর্দার পার্টি হল বড়লোকদের পার্টি।"

"গান্ধী তাহলে বড়লোক?" মাকে কথাটা জিজ্ঞেস করার সময়, দোতলায় ঠাকুর্দার দেওয়ালে টাঙানো ছবিটি সুদীপের চোখে ভেসে উঠতো।

প্রণতি এ জবাবটা অনায়াসেই দিতেন, "হ্যাঁ।"

"আর মার্কস্ এঙ্গেলস লেনিন স্ট্যালিন, ওরা সব গরীব?" সুদীপ নামগুলো অনায়াসেই উচ্চারণ করতো। কারণ ছবিগুলোর পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন সৌরীন্দ্র।

এ জিজ্ঞাসার জবাবেও প্রণতি জবাব দিলেন অনায়াসে, "হ্যাঁ।"

প্রণতি সুদীপকে একথা বোঝাবার প্রয়োজন বোধ করেননি, তাঁরা ছিলেন বড়লোক আর গরীবের নেতা। সুদীপের শিশু মনে, ওর বাবা সৌরীন্দ্রই আদর্শ পিতা ও ব্যক্তির স্থান পেয়েছিলেন। যে-ব্যক্তি ওর জ্ঞানের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে নেতার স্থানও নিয়েছিলেন। অতএব, শিশু বয়স থেকেই ওর ধারণায়, গান্ধী ছিলেন বড়লোক। ঠাকুর্দার নেতা ছিলেন তিনি, আর তাঁদের পার্টিও ছিল বড়লোকের। এ ধারণাটা ওর শিশুর মস্তিষ্কে গেঁথে গিয়েছিল। কিন্তু গান্ধীকে দিল্লিতে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে, এ সংবাদে সারা বাড়িতেই একটা শোক নেমে এসেছিল। কেবল ঠাকুর্দা ঠাকুরমা শোকাহত হননি। সুদীপ দেখেছিল, বাবা মায়ের মুখও কেমন থমথম করছিল। সেই দিন, তারপরের দিন, রেডিও

কখনও বন্ধ হয়নি। বাড়ির কাজের লোকেরাও রেডিও শোনবার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকতো। দফায় দফায় নানা ভাষায় গান্ধী হত্যার কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। আর সেই গানটি, "রঘুপতি রাঘব রাজা রাম/ পতিত পাবন সীতারাম।"

সুদীপ ঠাকুর্দার চোখে জল দেখেছিল। ঠাকুরমা ঠাকুর্দার কাছ থেকে নড়েননি। মাকে শুনিয়ে বাবাকে একবার গম্ভীর মুখে বলতে শুনেছিল, "এসব লক্ষণ খুবই খারাপ।"

কেন খারাপ, সুদীপ কিছুই বুঝতে পারেনি। গান্ধীহত্যায় ওর বাবাও যে ঐরকম বিহ্বল হয়ে পড়বেন, ও ভাবতে পারেনি। কেবল ওদের বাড়ি না। বাড়ির বাইরে, পাড়ায়, স্কুলে, সমস্ত কলকাতাটাই যেন গান্ধীহত্যার সংবাদে কেমন শোকে আর দুঃখে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। তবে ভুলে যেতেও বেশি দেরি হয়নি। আবার আস্তে আস্তে সবই স্বাভাবিক হয়ে এসেছিল। ঠাকুর্দাকেই কেমন অস্বাভাবিক মনে হতো। কোর্ট থেকে ফেরার পরে, সন্ধ্যায় আবার তিনি নিচে তাঁর অফিস ঘরে বসতেন। লোকজনও অনেক আসতো। কিন্তু কাজের বিষয় ছাড়া তিনি কারোর সঙ্গেই বিশেষ কথাবার্তা বলতেন না।

সুদীপ আরও লক্ষ করেছিল, বাবাও যেন কেমন অস্থির হয়ে উঠছেন। মাকে দেখাতো চিন্তিত আর উদ্বিগ্ন। তাঁদের মধ্যে কথাবার্তা হতো চুপি চুপি। এরকম অবস্থার কিছু দিন পরেই, বাবাকে বাড়িতে দেখা যেতো না। পুলিশ এসেছিল তাঁর সন্ধানে। রঞ্জনা—ছোট বোন রুণ্টু তখন এক বছরের। মা সুদীপকে সাবধান করে দিয়েছিলেন, "ছুবু, ইস্কুলে বাবার কথা কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে, বলে দেবে, বাবা কোথায় গেছেন, তুমি কিছুই জানো না।"

মা ভুল কিছু বলেননি। স্কুলে ওকে এলোকেশী বা অন্য কেউ পৌঁছে দিয়ে আসতো। ছুটির পরে বাড়ি নিয়ে আসতো। কিন্তু স্কুলের মধ্যেই, খেলার সময়ে অচেনা লোক ওকে বাবার কথা জিজ্ঞেস করতো। "তোমার বাবা কাল রাত্রে কখন বাড়িতে এসেছিলেন?" সীতানাথ জেঠু তো দুপুরে খেতে এসেছিলেন, না?" ..এরকম নানা প্রশ্ন, যে-গুলো ছিল একেবারেই মিথ্যা। বাড়ির টেলিফোনে অদ্ভুত অদ্ভুত সব লোক বাবার সম্পর্কে অদ্ভুত সব কথা জিজ্ঞেস করতো। সীতানাথ জেঠু বা নিত্যানন্দ জেঠুর পরিচয় দিয়ে. বাবার কথা জিজ্ঞেস করতো। দু' বার গোটা বাড়ি খানাতল্লাসী হয়েছিল। কিন্তু তল্লাসী করতে এসে, পুলিশ কখনও ঠাকুর্দার ঘরে যেতো না।

সেই সময়ে ঠাকুর্দার শরীর ভালো যাচ্ছিল না। তিনি অল্প সময়ের জন্য কোর্টে যেতেন। তারপরে, সে-যাওয়াও বন্ধ হয়েছিল। তিনি একরকম বিছানাই নিয়েছিলেন। তবে শোবার ঘরে সব সময় শুয়ে থাকতেন না। তাঁর বড় ঘরটিতে

বড় সোফায় এলিয়ে বসতেন।

সুদীপ বড় হয়ে শুনেছে, বাড়ির একতলাটা তৈরি করিয়েছিলেন ওর প্রপিতামহ সতীন্দ্রমোহন। তিনি ছিলেন কোনো এক বিখ্যাত ইংরেজ কোম্পানির ক্যাশিয়ার। তাঁর রোজগার নাকি ছিল বিস্তর। দক্ষিণ ঘেঁষে, মধ্য কলকাতায় এ বাড়ি ছাড়াও সেই সময়ে বালিগঞ্জে সস্তায় জমি কিনে, আরও দুটি বাড়ি করেছিলেন। তিনি নিজে থাকতেন এ বাড়িতে। ক্লাইভ স্ট্রিটের অফিসে যেতেন নিজের ঘোড়ার গাড়িতে চেপে। একতলাটা অনেক বড়। বসা-থাকার জন্য ছ'টি ঘব। রান্না ঘরের সীমানা তিনটি ঘরকে নিয়ে। স্নানের ঘর দুটো। পাইখানা তিনটি। দক্ষিণে বিবাট বাগান। আস্তাবল ছাড়াও, গাড়োয়ান, সহিস আর চাকরবাকর, ঝিদের জন্য খুপরি খুপরি চারটি ঘর। সতীন্দ্রমোহন প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পরে আবার বিয়ে করেছিলেন। জীবিত সন্তানের সংখ্যা ছিল কুল্যে আটটি। পাঁচ কন্যা, তিন পুত্র। সূর্যমোহন ছিলেন দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভজাত, পুত্রদের মধ্যে কনিষ্ঠতম। মৃত্যুর আগেই তিনি পাঁচ কন্যাকে উপযুক্ত পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন। তিন পুত্রকে দিয়েছিলেন তিন বাড়ি। জীবিত থাকতেই প্রথম পক্ষের দুই পুত্রকে বিয়ে দিয়ে, বালিগঞ্জের দুই বাড়িতে পাঠিয়েছিলেন বাস করতে। সূর্যমোহনকে দিয়েছিলেন এই বাড়ি। সূর্যমোহন একতলা বাড়ির ওপরে, নিজের পছন্দ মতো ছোট বড় মিলিয়ে চারটি ঘর তুলেছিলেন।

সূর্যমোহন অসুস্থ হয়ে তাঁর দোতলার বড় ঘরটিতে বেশির ভাগ সময় সোফায় এলিয়ে বসে কাটাতেন। বসুন্ধরা প্রায় সব সময়েই থাকতেন স্বামীর কাছে। বাইরের নানা লোকের আসা-যাওয়া ছিল সূর্যমোহনের কাছে। বসুন্ধরার সেখানে থাকতে কোনো বাধা ছিল না। সৌরীন্দ্র বাড়ির থেকে অদৃশ্য হবার মাসখানেক পরে, সূর্যমোহনের ঘরে প্রণতির ডাক পড়েছিল।

সুদীপের মনে আছে, তখন গরমের সময়। পড়ন্ত বিকেল। ও ছিল দোতলার সিঁড়ির ওপরের ধাপে দাঁড়িয়ে। ঠাকুর্দার কাছে শাদা প্যান্ট-সার্ট পরা এক ভদ্রলোক বসেছিলেন। ঠাকুরমা তখন ভিতরের শোবার ঘরে কিছু করছিলেন। মা উঠে এসেছিলেন ঠাকুর্দার ঘরে। তাঁর মাথার ঘোমটায় কপাল অংশত ঢাকা পড়েছিল। সুদীপ চওড়া দালানে গিয়ে, ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়েছিল। মা গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন ঠাকুর্দার সামনে। শাদা সার্ট-প্যান্ট পরা ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁকে হাতের ইশারায় দেখিয়ে, ঠাকুর্দা মাকে যেন কী বলেছিলেন। মায়ের গলায় হঠাৎ একটা স্খলিত চাপা আর্তনাদ শোনা গিয়েছিল। তারপরেই তিনি দু' হাতে মুখ ঢেকে, শব্দ করেই কেঁদে উঠেছিলেন।

সুদীপ মাকে কোনো দিন ঐরকম কেঁদে উঠতে দেখেনি। ওর শিশু মন একটা

আচমকা ভয় ও উৎকণ্ঠায় শিউরে উঠেছিল। আর আশ্চর্য, ওর মনে হয়েছিল, নিশ্চয়ই ঠাকুর্দা বাবার বিষয়ে মাকে কিছু বলেছেন। ও মায়ের কাছে এগিয়ে গিয়েছিল। ঠাকুরমাও শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে, মায়ের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। ঠাকুর্দার কোল-বসা বড় বড় চোখ দুটোতে জল ছিল না। কিন্তু সুদীপের মনে হয়েছিল, তিনি যেন কাঁদছেন। তাঁর মুখ গম্ভীর দেখাচ্ছিল না। ঠিক কেমন যে দেখাচ্ছিল, চার বছরের সুদীপের তা বোঝার মতো ক্ষমতা ছিল না। কেবল তাঁর মুখ দেখেও ওর মনে কষ্ট হয়েছিল। ঠাকুরমা প্রায় আর্তস্বরে ঠাকুর্দাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "কী হয়েছে? বউমা কাঁদছে কেন?"

ঠাকুর্দা ঠাকুরমার দিকে তাকিয়ে একটু মাথা ঝাঁকিয়েছিলেন। তারপর সেই সার্ট-প্যান্ট পরা ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে, যেন ঠাণ্ডা লাগা, সর্দি ভরা মোটা গলায় বলেছিলেন, "খবরটা দিয়ে বড় উপকার করলেন। তবু জানা গেল। ডঃ রায়কে বলবেন, তিনি যে আপনাকে খবর দেবার জন্য আমার কাছে পাঠিয়েছেন, সেজন্য আমি বড়ই কৃতজ্ঞতা বোধ করছি।"

"আমি তা হলে এখন আসি।" ভদ্রলোকের গম্ভীর স্বরে সম্ভ্রমের সুর ছিল। ঠাকুর্দা সোফায় সোজা হয়ে বসবার চেষ্টা করেছিলেন, "হ্যাঁ আসুন। আমি··· ।"

"আপনি ব্যস্ত হবেন না।" ভদ্রলোক মা ঠাকুরমা সকলের দিকে দেখে, কপালে দু' হাত ঠেকিয়ে, চলে গিয়েছিলেন।

ঠাকুর্দা ঠাকুরমার দিকে তাকিয়েছিলেন, "পরশু রাত্রে ভানুকে পুলিশ কলকাতার বাইরে এক বাড়ি থেকে অ্যারেস্ট করেছে। সে এখন আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে আছে।"

"স্বাধীন দেশে আমার ছেলেকে কংগ্রেস সরকার জেলে নিয়ে গেল?" ঠাকুরমার রুদ্ধ স্বরে অভিযোগ আর অভিমান ঝরে পড়েছিল। ঠাকুর্দার প্রতি তাঁর দৃষ্টিতেও ছিল সেই অভিযোগ আর অভিমানের সুর।

ঠাকুর্দার খুব কাছেই দাঁড়িয়েছিল সুদীপ। তিনি ওর দিকে একবার তাকিয়ে দেখেছিলেন। তারপর দক্ষিণের জানালার দিকে মুখ ফিরিয়েছিলেন, "হ্যাঁ। আমরা স্বাধীনতা চেয়েছিলাম। পেয়েছি। কংগ্রেস শাসন ক্ষমতা চেয়েছিল, তা তারা পেয়েছে। এখন তাদের হাত থেকে যারা শাসন ক্ষমতা কেড়ে নিতে চাইবে, তাদের তারা জেলে পুরবে। ঠিক যেমন ইংরেজরা আমাদের জেলে পুরতো। হয়তো এই নতুন শাসকরা ইংরেজদের থেকে আরও বেশি কড়া হাতে শাসন করবে। বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়ো হয়। ভানুরাও ঘোষণা করেছে, এ স্বাধীনতা মিথ্যে। ওরা জেহাদ ঘোষণা করেছে, এ সরকারকে ওরা উৎখাত করবে।"

"কিন্তু ওঁর শিষ্য সেবকরা আজ আমাদের ছেলেদের জেলে পুরবে ? গুলি করে মারবে ?" ঠাকুরমা দেওয়ালে টাঙানো গান্ধীজীর ছবির দিকে তাকিয়েছিলেন, "জহরলাল, বিধান রায়, তারা কি ওঁরই মন্ত্রশিষ্য নয় ?"

ঠাকুর্দাও দেওয়ালের ছবির দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছিলেন। তাঁর চোখে জল ছিল না। কিন্তু সুদীপের মনে হয়েছিল, ঠাকুর্দার চোখে জল চিকচিক করছে। তিনি কেমন একরকম হেসেছিলেন। সুদীপের মনে হয়েছিল, উনি কাঁদছেন। আর ওঁর গলার স্বর শুনিয়েছিল সেইরকম, ঠাণ্ডা লাগা সর্দি ভরা মোটা গলা। ছোট বউ, (ঐ নামেই তিনি বসুন্ধরাকে সম্বোধন করতেন, কারণ বসুন্ধরা সতীন্দ্রমোহনের গৃহে ছোট বউ-ই ছিলেন।) তুমি মন্ত্রশিষ্য বলতে যা বোঝ, ওরা তা নয়। জওহর নিশ্চয় এক সময় তা ছিল। কিন্তু ওঁকে যেদিন গুলি করে মারা হল, সেই দিন তোমাকে একটা কথা বলেছিলাম, ভুলে গেছ ? বলেছিলাম, স্বাধীনতার থেকেও আর এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হল আমাদের দেশে। জওহর সেই জওহর নেই। এ লোককে আমি চিনি নে। বিধান রায়কে তো আরোই চিনি নে। তবে ভানুদেরও কি আমি চিনি ? চিনি নে। তোমাকে আরো বলেছিলাম, মহাত্মা আর কংগ্রেস নামে কোনো দলের নেতা নন। দলীয় রাজনীতির সঙ্গে তিনি সম্পর্ক ত্যাগ করেছেন। ছোট বউ, মহাত্মাকে দায়ী করো না। জওহর, বিধান, তোমার ছেলে ভানু, ওরা সবাই এখন নতুন পথে চলেছে। বোঝাপড়া হবে ওদের নিজেদের মধ্যে। আজ তুমি আমি, এমন কি বউমাও কাঁদলে কিছু হবে না।"

"তা হলে কংগ্রেসের অহিংসা বলে আর কিছু নেই ?" ঠাকুরমার স্বর ছিল কান্নারুদ্ধ। ঠাকুর্দাও যেন সেই কান্নার মতো হেসেছিলেন, "না। শাসক হলেই বোঝা যায়, অহিংসা দিয়ে দেশ শাসন করা যায় না। শাসকেরা চিরকাল হিংসাকে হিংসা দিয়েই দমন করে। অহিংসাকেও যে করে, সে তো ভালোই জানো।"

"আমি আজ থেকে রাত্রে বউমার কাছে থাকবো।" ঠাকুরমার চোখ থেকে জল পড়ছিল।

মা মাথা নেড়ে, চোখ মুছেছিলেন। তাঁর গলা শুনিয়েছিল ভেজা আর ভাঙা ভাঙা, "না মা, আপনাকে কষ্ট করে রাত্রে আমার কাছে থাকতে হবে না। আমি ছবু আর রণ্টুকে নিয়ে ঠিক থাকবো। তা ছাড়া শেফালি মেয়েটি বেশ কাজের। রাত্রে রণ্টুকে ও দেখাশোনা করে। বাবা অসুস্থ। আপনি বরং বাবার কাছেই থাকবেন। আমার একটাই কথা—"

মাকে চুপ করে যেতে দেখে ঠাকুর্দা মুখ তুলে তাকিয়েছিলেন। তাঁর চোখে ছিল জিজ্ঞাসা, "আমাকে কিছু বলছো বউমা ?"

"হ্যাঁ বাবা।" মা একবার ঠাকুর্দার মুখের দিকে তাকিয়েই, চোখ নামিয়ে নিয়েছিলেন, "আপনার ছেলেকে আমরা দেখতে যেতে পাবো না ?"

ঠাকুর্দা ঘাড় ঝাঁকিয়েছিলেন, "পাবে বই কি বউমা। নিশ্চয়ই পাবে। সপ্তাহে একদিন দেখা কবতে দেবে। আমি সহদেবকে পাঠিয়ে খবর নেবো, সপ্তাহের কোন্ দিন ভানুব সঙ্গে তোমাদের দেখা করতে দেবে। অথবা এস· বি· অফিসে টেলিফোন করেও জেনে নেওয়া যেতে পারে। যে-ভদ্রলোক আজ এসেছিলেন, উনি একজন এস· বি· অফিসার। চিফ্ মিনিস্টাব ডঃ বিধান রায় ওঁকে পাঠিয়েছিলেন। যাই হোক, বিধানের কাছে আমি সেজন্যও কৃতজ্ঞ, খবরটা একজন বিশেষ অফিসারকে দিয়ে পাঠিয়েছে। তুমি ওটা নিয়ে ভেবো না বউমা, আমি জেনে নিয়ে, তোমাকে বলবো।"

"আমি নিচে যাচ্ছি।" মা ঠাকুর্দা-ঠাকুরমা, দুজনের দিকেই একবার তাকিয়ে ঘর থেকে বেবিয়ে গিয়েছিলেন।

ঠাকুবমা ঠাকুর্দার কপালে গালে হাত দিয়ে দেখেছিলেন। তারপরে সুদীপকে কোলের কাছে টেনে নিয়েছিলেন। তার আগে পর্যন্ত সকলের কান্না ও কষ্টও দেখেছিলেন। কাঁদেনি। ঠাকুরমা কোলের কাছে টেনে নিতেই, ওর কান্না পেয়েছিল। সেই যেন প্রথম বুঝতে পেরেছিল, বাবাকে জেলে ধরে নিয়ে গিয়েছে। ঠাকুরমা একটা সোফায় বসে, ওকে কোলেব ওপর বসিয়েছিলেন। ও ঠাকুরমার বুকে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল। ঠাকুরমা ওর মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর চোখ শুকনো ছিল না। গলার স্বর ছিল কান্না রুদ্ধ, "কাঁদিসনে ভাই। যে-বংশে জন্মেছিস, সে-বংশে জেলে যাওয়া নতুন কিছু নয়। শুধু এটুকু জানবি, তোর বাবা অনেক বড় মানুষ।"

সুদীপের সাঁইত্রিশ বছব বযসের জীবনের মাত্র কয়েকটা বছর আগে পর্যন্ত সেই বিশ্বাসটা ছিল অটল। সেই অটল বিশ্বাসের ঠাঁই থেকে বাবা ওকে আস্তে আস্তে নামিয়ে দিয়েছেন। অথচ সেই চার বছর বয়সে ঠাকুরমার কথাটা ওর কাছে আদৌ নতুন মনে হয়নি। সেই বয়সেই বাবা ছিলেন ওর কাছে এক মাত্র আদর্শ মানুষ। মনে আছে, বাবাকে প্রথম জেলে দেখতে গিয়ে ও গুঙিয়ে কেঁদে উঠে বাবার গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। বাবার কোমর জড়িয়ে ধরেছিল তখনই একটি বড় শক্ত হাত ওর হাত ধরে, বাবার কাছ থেকে টেনে সরিয়ে দিয়েছিল। ঠেলে দিয়েছিল টেবিলের ওপারে, মায়ের কাছে। আর শোনা গিয়েছিল তার শক্ত স্বর, "ধরে রাখতে পারেন না ?"

"না, পারেন না।" বাবার স্বরে গর্জনের ঝাঁজ ছিল। মা'র প্রতি আঙুল তুলে দেখিয়েছিলেন, "ঐ ভদ্রমহিলা জীবনে এই প্রথম আপনাদের নরকে

এসেছেন। উনি এই নরকের নিয়মকানুন তো জানেন না যে এখানে ছোঁয়াছুঁয়ি চলে না। তাই ছেলেকে ধবে রাখার কথা ভাবেননি।"

লোকটার মুখে চাটুকারের হাসি ফুটেছিল, "আহা, রাগ করছেন কেন সৌরীন্দ্রবাবু। আমরা সব চুনো পুঁটি লোক, হুকুমের চাকর। কী করবো বলুন ?"

"কী আর কববেন ?" বাবার স্বর একটু নবম হয়েছিল। ঠোঁটে ছিল বক্র হাসি, "শিশুটিকে এতটা অবিশ্বাস না করলেও পারতেন। আর যদি মনে করেন, আমার ঐ ছেলে কেঁদে জড়িয়ে ধরতে এসে, আমার পকেটে গোপন কাগজপত্র চালান করে দিয়েছে, তা হলে দুজনকে সার্চ করুন। কিন্তু ঐ মহিলাকে ওভাবে ধমকানোটা মোটেই ভদ্রতা হল না।"

লোকটার মুখে ছিল সেই একই রকম হাসি। টেবিলের এক ধারে, একটা টুলের ওপর বসেছিল, "যা চাকরি করি, তাতে আর ভদ্রতা-টদ্রতা সব মাথায় উঠে গেছে। নিন্, আপনারা বসুন, কথা বলুন।"

টেবিলের এপাবে ওপারে বাবা মা মুখোমুখি বসেছিলেন। লোকটা বসেছিল টেবিলের এক ধারে। সুদীপের বসবার কোনো আসন ছিল না। ও মায়ের পাশে দাঁড়িয়েছিল। ততক্ষণে ও নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়েছিল। রণ্টুকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল টেবিলের ওপর। বাবা সুদীপের দিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে হেসেছিলেন, "তোমার এত কাঁদবাব কী আছে ? দেখছো তো, আমি বেশ ভালো আছি।"

সুদীপের শিশু প্রাণে হাজার জিজ্ঞাসা জমেছিল। কিন্তু জিজ্ঞাসাগুলো যে কী, ; খুঁজে পায়নি। কেবল বাবার দিকে তাকিয়ে, চোখে জল এলেও, সলজ্জ হেসেছিল। বাবা ওর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে, মায়ের দিকে তাকিয়েছিলেন। মা চোখ মুছে হেসেছিলেন, "সত্যি ভালো আছো ?"

"জেলে থাকার ভালো মন্দ আর কী আছে ?" বাবা হেসে সুদীপকে দেখিয়েছিলেন, "ও বোধহয় খুবই ভয়ে ভয়ে ছিল। তাই না ছুবু ?"

সুদীপ ঘাড় ঝাঁকিয়েছিল, "তোমাকে এরা মেরেছে ?"

"এখনো মারেনি।" বাবা হা হা করে হেসে উঠেছিলেন, "আর যদি মারেই, তার জন্যেও তুমি মোটেই ভাববে না, ভয়ও পাবে না। বড় হয়ে হয়তো তোমাকেও আমার মতো এখানে আসতে হতে পারে। ওসব নিয়ে একটুও ভয় ভাবনা করবে না। মন দিয়ে লেখাপড়া কর। বড় হয়ে বুঝতে পারবে, কেন পুলিশ আমাদের ধরে এনেছে।"

সেই লোকটা সিগারেট টানছিল। তার মুখে হাসি ছিল না, "আহা সৌবীন্দ্রবাবু, এখানে বসে ছেলের সঙ্গে এসব আলোচনা করে কী লাভ ?"

"লোকসান কিছু নেই, আর এমন কিছু বিপ্লবী কথাও বলিনি।" বাবার মুখ কেমন শক্ত হয়ে উঠেছিল, গলার স্বরও তেমনি শুনিয়েছিল। তারপরে আবার সুদীপের দিকে তাকিয়ে হেসেছিলেন, "যাই হোক, এখন কিছু না ভেবে, খুব ভালো করে লেখাপড়া শেখো। আর মায়ের কথা শুনে চলবে।" তিনি মায়ের দিকে তাকিয়েছিলেন।

সুদীপ সে-সব কোনো কথাই ভোলেনি। বাবার সমস্ত কথা ও সবদিক থেকেই গুরুবাক্য হিসাবে মেনে নিয়েছিল। ভারতীয় সেই প্রাচীন পিতৃভাবনা ওর মস্তিষ্কে বিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, পিতা স্বর্গ, ধর্ম, পরমগুরু। পরবর্তীকালে 'পরম'-এর চিন্তাটা, অতি নির্মমভাবে ছিন্ন করেছিল ওর চেতনাকে। তখন ও ওর খাতায় লিখেছিল, "জয় গুরু এঙ্গেলস! হিন্দুর টিকি থেকে যে একটা অলৌকিক বিদ্যুৎ রশ্মি ঠিকরে বেরোয়, এ কথাটা আপনি বোধহয় জানতেন না। কিন্তু টিকির থেকেও মারাত্মক শক্তি, আমার পিতৃদেব আর তাঁর বন্ধুরা আয়ত্ত করেছেন। আপনি হেগেলের মতো দার্শনিকের টিকিতে হাত দিতে সাহস পেয়েছিলেন, কেননা তাঁর একটা পরম বা চরমের বোধ বিশ্বাস ছিল। দ্বান্দ্বিকতার স্রষ্টা হওয়া সত্ত্বেও, এই 'পরম সত্য' বোধের অন্ধ গলিতে তাঁর যাত্রা, জগতের অশেষ নিরন্তরতার বুকে যবনিকা টেনে দিয়েছিল। এখানে এসেই জানলুম যে, ঈশ্বরের অস্তিত্বকে আপনারা সেই একই এবং আরও বহু কারণে অস্বীকার করেছেন, আমাদের ঈশ্বর বিশ্বাসী কবির ঘোষণা করতে বাধেনি, 'শেষ নাহি যার শেষ কথা কে বলবে?' এর দ্বারা আমি জনগণকে ঈশ্বরে বিশ্বাসী হবার প্রেরণা যোগাবার কথা ভাবিনে। কিন্তু 'পরম সত্য' বোধের অন্ধকার ছিন্ন হল, আমাদের ঈশ্বর বিশ্বাসী কবির হাতে। কারণটা এই, কবির ঈশ্বর তাঁর বিজ্ঞানের উপলব্ধিকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। কিন্তু আপনাদের সৃষ্ট, আমার পিতৃদেবদের 'পরম সত্য' বোধের টিকির নাগাল তো পাবেন না গুরু! এঁরা বিপ্লব তো করবেনই। এই 'পরম সত্য'-কে এঁরা ভবিষ্যতে প্রমাণ তো করবেনই। এই সর্বহারার নেতারা, পরিবর্তিত পরিস্থিতির অসহায়তার মধ্যেও, দুধে-ভাতে থেকে, কী অপরিসীম পরিশ্রমে 'বর্তমান পরম সত্য'-কে ব্যাখ্যা করে যাচ্ছেন, দেখে যান। প্রচণ্ড এঁদের শক্তি! এঁদের টিকির নাগাল এমনকি এঁদের ক্যাডাররাও পাবেন না। আর এঁদের শত্রুরা, এঁদের টিকির বৈদ্যুতিক শক্তিতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মরবে। আমার পরম গুরুই, 'পরম'-এর শিক্ষাটা দিলেন। আর অন্ধ গলির যবনিকা গেল সরে। আমার চোখ গেল ধাঁধিয়ে..."

সুদীপের চোখ ধাঁধানোর সূর্যোদয়টা খুবই সাম্প্রতিক কালের। তার আগে পর্যন্ত, ওর মন প্রাণ সবই সমর্পিত ছিল গুরুর ধ্যানের সঙ্গে লীন হয়ে থাকার

মধ্যে। সেই চার বছরের শিশুকাল থেকেই, বাবার সম্পর্কে 'পরম' বোধটা ওর ছিল। তার বাহিরে, এবং "তাঁহার বাইরে" জ্ঞানও রহিত ছিল। কিন্তু ঠাকুর্দা মানুষটিকে ও কী ভাবে নেবে, সেটা কিছুতেই স্থির করতে পারতো না। বিশেষ করে শিশু বয়সে। ঠাকুরমা যখন দেওয়ালে গান্ধীজীর ছবি দেখিয়ে, ঠাকুর্দাকে অভিযোগ করেছিলেন, তখন ঠাকুর্দা যে-কথাগুলো বলেছিলেন, ও ঐ বয়স থেকে তা ভোলেনি। ঠাকুর্দা মনে করতেন, তাঁর মহাত্মা আর স্বাধীন ভারতের কংগ্রেসের নেতা ছিলেন না। অতএব তাঁকে ভুল বোঝার কোনো কারণও ছিল না। জওহরলাল আর বিধান রায়কে তিনি আর গান্ধীবাদী বলে চিনতেন না। তাঁরা ছিলেন ঠাকুর্দার কাছে অচেনা। অচেনা ছিলেন বাবাও। জওহরলাল, বিধান রায়, বাবা এবং তাঁদের পার্টি, একটা আলাদা জগৎ। ঠাকুর্দা আর তাঁর মহাত্মা আলাদা একটা জগৎ।

সুদীপের ঐ বয়সে মনে প্রশ্ন জেগেছিল, বাবাদের যে-কংগ্রেস জেলে পাঠিয়েছিল, সেই কংগ্রেসের সঙ্গে ঠাকুর্দার আর কোনো সম্পর্ক ছিল না ? তাঁর মুখ দেখে মনে হয়েছিল, বাবার গ্রেপ্তারের সংবাদে তিনি কষ্ট পেয়েছেন। ঠাকুর্দার সেই চোখ মুখ ভোলবার না। তিনি কাঁদেননি। অথচ সুদীপের মনে হয়েছিল, তাঁর চোখে জল। তাঁর হাসিকেও সেই বয়সে ওর মনে হয়েছিল, তিনি কাঁদছেন। তাঁর কথা থেকে বেশ বোঝা গিয়েছিল জওহরলাল, বিধান রায়দের কংগ্রেসের সঙ্গে বাবাদের লড়াই লেগেছে। বাবার কথা শুনেও, ওর সেই বিশ্বাসই হয়েছিল।

ঠাকুর্দা মারা যাবার আগে, বেশির ভাগ সময় অন্যমনস্ক থাকতেন। বাবা জেল থেকে মুক্তি পেয়ে আসার মাত্র কয়েকমাস আগে ঠাকুর্দা মারা গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সুদীপকে দেখলেই কাছে ডাকতেন। বাবার জেলে যাবার সংবাদ যখন প্রথম এসেছিল, আর ঠাকুরমা যখন ওকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন, তখন ওর সেই কান্নার কথা ঠাকুর্দা ভোলেননি। পরের দিনই ওকে ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াতে দেখে, হাতের ইশারায় কাছে ডেকেছিলেন। ঐ রকম তিনি প্রায়ই ডাকতেন। জিজ্ঞেস করতেন নানা কথা। বাবার গ্রেপ্তারের সংবাদের পরের দিন কাছে ডেকে, তাঁর চওড়া দীর্ঘ সোফার পাশে সুদীপকে বসিয়েছিলেন। নিজেও একটু সোজা হয়ে বসবার চেষ্টা করে, ওর দিকে তাকিয়েছিলেন। তাঁর কোল-বসা-চোখে দৃষ্টি ছিল করুণ, গলার স্বর সেইরকম সর্দিজড়ানো মোটা, "বাবার জন্য তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে, না ?"

সুদীপ ঠাকুর্দার চোখের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকিয়েছিলেন, "হুঁ।"

"তুমি কি জানো, তোমার বাবা আগেও অনেকবার জেল খেটেছেন ?"

"জানি।"

"কার কাছে জানলে? তোমার বাবা বলেছেন?"

"বাবার কাছে একটু একটু। মা'র কাছে বেশি।"

"কিন্তু তোমার বাবা আগে যখন জেল খেটেছেন, তখন তোমার মায়ের সঙ্গে বাবার বিয়ে হয়নি।"

"জানি।"

"জানো?" ঠাকুর্দার কোল-বসা বড় বড় চোখে, মুখের ভাঁজে কৌতুকোজ্জ্বল হাসি ফুটতো। "কে বললেন?"

"মা।"

"বেশ।" ঠাকুর্দা সুদীপের পিঠে হাত রেখে, ওর চোখের দিকে তাকিয়ে হাসতেন, "তুমি বাবার জন্য কষ্ট পাচ্ছো, কিন্তু একটা কথা জানবে, তোমার বাবা একজন খুব— কী বলবো— খুবই বড় মানুষ। তিনি আগে যখন অনেকবার জেলে গেছেন, তখন আমাদের দেশ ছিল পরাধীন। দেশ স্বাধীন করার জন্যই তখন তিনি জেলে গেছেন। এখন স্বাধীন দেশেও, তোমার বাবা দেশের দুঃখ দুর্দশা দূর করতে চান বলেই আবার জেলে গেছেন। তুমি খুব শীগগিরই তোমার বাবাকে দেখতে জেলে যাবে। মনে হয় তখন তোমার মনের কষ্ট অনেক কমে যাবে।"

ঠাকুর্দা যে মিথ্যা বলেননি, সুদীপের কাছে সেটা প্রমাণ হয়েছিল। কিন্তু ওর মনের ভয়ের কথাটা তার আগে কারোকেই বলতে পারেনি। তবে ও স্বীকার করেছিল, "মা বলেছেন, বাবা খুব বড় মানুষ। কিন্তু পুলিশ বাবাকে মারবে না তো?"

"মারবে?" ঠাকুর্দা যেন বিভ্রান্ত হয়ে, নিজেকেই জিজ্ঞেস করেছিলেন। এবং উদ্বিগ্ন উৎসুক পৌত্রকে জবাব দিতে তাঁর কয়েকটি মুহূর্ত কেটেছিল, "ছুবু, তোমাকে আমি মিথ্যে বলবো কেমন করে? পুলিশের কাজই হল, তাদের মনোমতো কিছু না হলেই, তারা সব কিছু করতে পারে। তবে আমার মনে হয়, একবার যখন তোমাব বাবাকে জেলে ঢুকিয়ে দিয়েছে, তখন আর মারবে না।"

সুদীপের শিশু মনে কৌতূহল আর জিজ্ঞাসা জেগেছিল, "জেলে নিয়ে গেলে আর মারে না?"

"মারে, তাও মারে।" ঠাকুর্দা যেন বেশ চিন্তিত হয়ে উঠেছিলেন, "তবে জেলে তো তোমার বাবার অনেক বন্ধুরাও রয়েছেন। সেখানে মারধোর করাটা মুশকিল। তখন মারতে হলে, সবাইকেই মরতে হয়। আর তা নইলে, জেলে ঢোকাবার আগেই, পুলিশ নিজেদের দরকারে মারতে পারে।"

সুদীপ পরবর্তীকালে ওর বাবার কাছ থেকে যে-সব অভিজ্ঞতার কথা শুনেছে, তার কিছু আভাস পেয়েছিল প্রথম ঠাকুর্দার কাছ থেকেই। ঠাকুর্দার কথা শুনে, ভবিষ্যতের মেধাবী সুদীপের মনে কৌতূহলী জিজ্ঞাসা আরও বেড়ে উঠেছিল, "তুমিও তো অনেকবার জেল খেটেছো।"

"তা খেটেছি।"

"তখন তোমাকে পুলিশ মেরেছে?"

"মেরেছে, তবে জেলের মধ্যে নয়, বাইরে। মিছিলে মিটিং-এ তেড়ে এসে ব্যাটন দিয়ে পিটিয়েছে। কিন্তু জেলের মধ্যে আমি মার খাইনি।"

"বাবার বেলায় পুলিশ তাহলে কোথায় তাঁকে মারবে?"

"সে-সব ওদের অনেক জায়গা আছে।"

"কেন মারবে?"

"মারবেই বলছিনে। তবে ঐ যে বললুম, পুলিশের মনোমতো সব না হলে—এই যেমন ধরো, তারা তোমার বাবার কাছে কিছু জানতে চাইলো, কিন্তু তোমার বাবা তা বলতে অস্বীকার করলেন, তখন তারা মারতে পারে। তবে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, তোমার বাবাকে ওরা মারেনি।"

ঠাকুর্দা যে ভুল বলেননি, জেলে বাবার কথা শুনে তা বুঝেছিল সুদীপ। ঠাকুর্দার সঙ্গে ওর আরও অনেক কথাই হতো। বাগানের গাছপালা, কাঠবেড়ালি, পাখি, ইত্যাদি নিয়ে যেমন কথা হতো, তেমনি স্কুলের পড়া নিয়েও দুজনের মধ্যে কথা হতো। তাছাড়া, যে-সপ্তাহে ও জেলে বাবার সঙ্গে দেখা করতে যেতো, সেই দিনটিতে জেল থেকে ফিরেই ওর প্রথম কাজ ছিল, ঠাকুর্দাকে সব কথা জানানো। ঠাকুর্দা মা'র মুখ থেকেও শুনতেন। ঠাকুরমা দু-একবার বাবাকে দেখতে জেলে গিয়েছিলেন। কিন্তু ঠাকুর্দার সঙ্গে বেশি কথা হতো সুদীপের সঙ্গেই।

সুদীপ গান্ধীজীর ছবি দেখিয়ে, দাদুর মুখের দিকে বড় বড় চোখে তাকাতো, "ওঁকে তুমি খুব মানো, না?"

"হ্যাঁ।" উনিই ছিলেন আমার একমাত্র নেতা, আর গুরু।" জবাব দিতে গিয়ে তিনি দেওয়ালের ছবির দিকে তাকিয়ে আনমনা হয়ে যেতেন।

সুদীপের আজও মনে আছে, ঠাকুর্দা কোনোদিন গান্ধীজীর কথা যেচে ওকে বলেননি। ওকে নিজেকেই জিজ্ঞেস করতে হয়েছিল। ঠাকুর্দাকে আনমনা হয়ে যেতে দেখে, ও অবাক চোখে একবার দেওয়ালের ছবির দিকে দেখতো। আবার ঠাকুর্দার মুখের দিকে তাকাতো। এক সময়ে ওর মনে হতো, ঠাকুর্দার দুই চোখের কোণ যেন জলে চিকচিক করছে। তিনি বিড়বিড় করে কিছু বলতেন। সুদীপের

পক্ষে কৌতূহল দমন কবা কঠিন ছিল, "ঠাকুর্দা !"

"হ্যাঁ ?" ঠাকুর্দা যেন আচমকা ঘুমের ঘোর থেকে জেগে উঠতেন। "ছুবু, কি বলছো ?"

সুদীপ ঘাড় ঝাঁকাতো, "হ্যাঁ, তুমি কি কোনো মন্ত্র পড়ছিলে ? গান্ধীজীকে কি তুমি ভগবান মনে করো?"

"তা একবকম তা-ই বলতে পারো।" ঠাকুর্দার চোখে হাসি ফুটে উঠতো, "তুমি এখন বুঝবে না দাদু। সৎ গুরু ভগবানেব মতোই। তবে আমি কোনো মন্ত্র পড়ছিলুম না। বলছিলুম, ওঁব মতো মানুষকেও কেউ গুলি করে মারতে পারে ? কতোদিনই বা আব বাঁচতেন ? কিন্তু আমার কথাব তো কোনো দাম নেই। যারা ওঁকে গুলি কবে মেরেছে, তাবা একদিন নিশ্চয় বুঝবে, কতো বড় একটা আত্মাকে ওবা মেরেছে।"

শিশু সুদীপেব ডাগব কালো চোখে অপাব কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা জাগতো "ওঁকে যাবা মেরেছে, তাবা কি গরীব লোক ?"

"এ কথা কেন তোমাব মনে এলো ?" ঠাকুর্দার চোখেও জেগে উঠলো বিস্মিত জিজ্ঞাসা।

"উনি তো গরীব ছিলেন না। উনি ছিলেন বড়লোক।"

"বড়লোক মানে কী ? অনেক টাকাপয়সাওয়ালা ধনী লোক ?" ঠাকুর্দার চোখেব জিজ্ঞাসা বিস্ময় আরও তীব্র হয়ে উঠতো।

সুদীপ ঘাড় ঝাঁকাতো। "হ্যাঁ।"

"কে বলেছেন তোমাকে একথা ? তোমার বাবা ?"

"না, মা !"

"না ছুবু, তোমাব মা ঠিক বলেন নি।" ঠাকুর্দা মাথা নাড়তেন। পৌত্রের দিকে তাকিয়ে ম্লান হাসতেন, "তোমাব বাবাব কথাটা মা একটু গুলিয়ে ফেলেছেন তোমার বাবা হয়তো বলেছেন, উনি ছিলেন ধনী লোকদের বন্ধু আর নেতা। সেই শুনেই হয়তো তোমাব মা ওঁকে বড়লোক ভেবেছেন। সর্বত্যাগী কাকে বলে, তুমি জানো ?"

সুদীপ ঘাড় নাড়তো, "না।"

"যিনি ঘব বাড়ি টাকা পয়সা সম্পত্তি, সব ছেড়ে দেন, তাঁকে বলে সর্বত্যাগী। উনিও সেইরকমই একজন সর্বত্যাগী ছিলেন।"

"ওঁকে কি আমাব বাবারা মেরেছেন ?"

"না না, তোমাব বাবারা ওঁকে মারেন নি। বরং তোমার বাবারা কষ্টই পেয়েছেন।"

"তা হলে ওকে কারা মেরেছে ?"

"যারা এ দেশের সব থেকে বড় শত্রু, তারাই মেরেছে।"

সুদীপের চেতনা আর অনুভূতি ছিল অন্ধকারে আবৃত। ওর ভুরু কোঁচকানো অবাক জিজ্ঞাসা ছিল, "হিটলার ?"

"না।" ঠাকুর্দা ঘাড় নেড়ে ম্লান হাসতেন, "তবে তারা হিটলারের মতোই।"

সুদীপের চোখে অপার বিস্ময় ফুটে উঠতো, "হিটলারের মতোই ? ওদেরও কি হিটলারের মতো ট্যাংক কামান বোমা ফেলার এ্যারোপ্লেন আছে ?"

"এখনো নেই।" ঠাকুর্দা হাসতে হাসতেই মাথা নাড়তেন। কিন্তু তাঁর চোখে থাকতো একটা উদ্বেগের ছায়া। আর গলার স্বরেও থাকতো সেই উদ্বেগের সুর, "তবে যোগাড় করতেও পারে। তুমি হিটলারের কথা কিছু শুনেছো ?"

সুদীপ ঘাড় ঝাঁকাতো। "একটু একটু বাবার মুখে শুনেছি। লোকটা ফ্যাসিস্ট ছিল।"

"সেটা কী ?" ঠাকুর্দার চোখে কৌতুকের হাসি ঝিলিক দিতো।

সুদীপের ভুরু কুঁচকে উঠতো, "কী আবার ? ফ্যাসিস্টরা ছিল সব থেকে খারাপ। তারা কেবল খুন করতেই জানতো। তারা সারা পৃথিবীর মানুষের শত্রু।"

"মহাত্মাকে যারা মেরেছে, তারাও সারা পৃথিবীর শত্রু।" ঠাকুর্দা মাথা ঝাঁকাতেন। তাঁর মুখের উদ্বেগে গাম্ভীর্য নেমে আসতো, "আসলে কি জানো ছবু, খুনোখুনি করা কাজটা খুবই খারাপ। ওটা একটা মহা পাপ। কোনো ভালো লোকই মানুষকে মারতে পারে না।"

ঠাকুর্দার এই কথাটার জবাব পাঁচ-ছ বছরের সুদীপ দিতে পারেনি। পরে, ওর কৈশোরে বাবার শিক্ষায়, আর বই পড়ে বুঝতে পেরেছিল, ঠাকুর্দা ঠিক কথা বলেন নি : যে-সব মানুষ ফ্যাসিস্ট ছিল, ভালো মানুষরাই শেষ পর্যন্ত তাদের মেরেছিল। মানুষের শত্রুদের অস্ত্রের মোকাবিলা অস্ত্র দিয়েই করতে হয়। কিন্তু ঠাকুর্দা ছিলেন একজন গান্ধীবাদী। গান্ধীবাদীরা ভারতের শত্রু বৃটিশদের অস্ত্রের বিরুদ্ধে অহিংস আন্দোলন করেছিলেন। সেটা ছিল একটা ভুল পন্থা। ভারতের মানুষকে গান্ধী ভুল শিক্ষা দিয়েছিলেন। সুদীপ যখন ওর চৌদ্দ-পনরো বছর বয়সের মধ্যেই এই জ্ঞান লাভ করেছিল, তখন ঠাকুর্দা আর বেঁচে ছিলেন না। তা হলে ও তাঁকে জানিয়ে দিতে পারতো, ব্রিটিশ শক্তির অস্ত্রের বিরুদ্ধে ভারতের মানুষের অস্ত্র ধারণ করাই উচিত ছিল। যেমন ভারতের দক্ষিণপন্থী জাতীয় সরকারের বিরুদ্ধে, কমিউনিস্টদের অনিবার্য ভবিষ্যৎই হচ্ছে, বিপ্লবের দ্বারা ক্ষমতা দখল। আর দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস সরকার বিপ্লবীদের ওপর সশস্ত্র পুলিশ আর সেনাবাহিনীকে লেলিয়ে দেবে, নির্বিচারে হত্যার জন্য। তখন বিপ্লবীদেরও

অস্ত্র দিয়েই তার মোকাবিলা করতে হবে। এটাই হচ্ছে ভারতের ভবিষ্যতের ঐতিহাসিক সত্য। হ্যাঁ, ঊনপঞ্চাশে কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লবের দ্বারা ক্ষমতা দখলের নীতিটা ঠিক ছিল না। কারণ পার্টি তখন তার জন্যে প্রস্তুত ছিল না। ভারতের স্বাধীনতাকে মেনে না নেওয়াটাও ভুল হয়েছিল। আর ভবিষ্যতের বিপ্লবের সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দেবার জন্য, সেই সময়ে বাবাদের খুব তাড়াতাড়ি সংসদীয় রীতি মেনে, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নির্বাচনের মোকাবিলায় নামতে হয়েছিল। নির্বাচনও তো একটা যুদ্ধ। তবে সশস্ত্র না।

সুদীপের মনে আছে, এক শীতের বিকেলে ও বসেছিল ঠাকুর্দার কোল ঘেঁষে। ঠাকুর্দার গলার স্বর তখন কেবল ভাঙা ভাঙা শোনাতো না। তাঁর কথায় নিশ্বাসের একটা কষ্টদায়ক টান টের পাওয়া যেতো, "তোমার ঠাক্‌মা তো আর তেতলায় বনমালীর ঘরে যেতে পারেন না। তোমার মা যান। তুমিও কি যাও ?"

"হ্যাঁ, সন্ধেয় যাই। পুজুরি ঠাকুর যখন পুজো আর আরতি করতে আসে, তখন মায়ের সঙ্গে যাই।"

ঠাকুর্দা আস্তে আস্তে ঘাড় ঝাঁকাতেন, "পুজো, আরতি ও-সব তোমার কেমন লাগে ?"

"মজা লাগে।" সুদীপ হাসতো, "বনমালী তো পাথরের মূর্তি। দুপুরের খিচুড়ি, ভাজা, তরকারি কিছুই খেতে পারে না। সন্ধে বেলার সন্দেশও খেতে পারে না। একটা পুরো সন্দেশ আমিই খাই।"

ঠাকুর্দা মাথা ঝাঁকিয়ে সুদীপের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতেন, "তার মানে, তুমিই বনমালী।"

"আমি কেন বনমালী হবো ?" সুদীপ ওর কচি দাঁত দেখিয়ে হাসতো, "আমি তো আর পাথরের মূর্তি নই। আর আমার রাধারাণীও নেই।"

ঠাকুর্দার চোখে মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়তো, "বড় হলে, তোমারও একটি রাধারাণী আসবেন। তা, পুজোর শেষে, তুমি কি বনমালীকে প্রণাম করো ?"

"করি।" সুদীপ ঘাড় কাত করতো, "মা করেন, আমিও করি।"

ঠাকুর্দা জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতেন, "প্রণাম করার সময় কিছু বলো ?"

"না তো।" সুদীপ মাথা নাড়তো, "মা করেন বলেই আমি করি।"

ঠাকুর্দা আস্তে ঘাড় ঝাঁকিয়ে, হঠাৎ কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যেতেন, "ছুবু, আমার মনে একটা বড় দুঃখ, আমি বোধহয় তোমার উপনযন দেখে যেতে পারবো না।"

"উপনয়ন তো পৈতেকে বলে।" সুদীপ ঠাকুর্দার মুখের দিকে তাকিয়ে

হাসতো, "আমি জানি। ঠাকমা বলেছেন, তুমি খুব ঘটা করে বাবার পৈতে দিয়েছিলে। কিন্তু বাবা তো পৈতে ফেলে দিয়েছেন।"

ঠাকুর্দা বিষণ্ণ হেসে ঘাড় ঝাঁকাতেন, "জানি। জেলে যখন তোমার বাবা কমিউনিস্ট হয়েছিলেন, তখনই পৈতে ত্যাগ করেন। তুমি যদি বাবার মতো হও—"

"মা বলেছেন, বাবা হয়তো আমার পৈতেই দেবেন না।" সুদীপ ঠাকুর্দার কথার মাঝখানেই, মায়ের কথার প্রতিধ্বনি করতো, "বাবা ও-সবে বিশ্বাস করেন না। ভগবানও মিথ্যে। বাবা বিশ্বাস করেন না।"

ঠাকুর্দার সারা মুখের রেখাগুলো কাঁপতে থাকতো। এমন কি গলার কাছে, আর ঠোঁট দুটোও কাঁপতো। তাঁর সেই মুখে কেমন একটা আতঙ্ক ফুটে উঠতো। সুদীপের চোখের দিকে তাকিয়ে, যেন অতি কষ্টে উচ্চারণ করতেন, "তুমি?"

"আমিও বিশ্বাস করি নে।" সুদীপ হেসে ঘাড় নাড়তো।

ঠাকুর্দার বুকে যেন ছুরি বিঁধে যেতো। অথবা বন্দুকের গুলি। তাঁর মুখে যন্ত্রণা আর কষ্ট ফুটে উঠতো। বুকে হাত চেপে ধরা অবস্থায় তাঁর মুখ থেকে কেবল বেরিয়ে আসতো, "হা ঈশ্বর!"

সুদীপ দেখতো, ঠাকুর্দা চোখ বুজে আছেন। ওর পিঠের ওপর রাখা হাতটাও থরথর করে কাঁপতো। তাঁর ফিসফিস্ স্বর শোনা যেতো, "তোমাকে ওরা একটু বড় হতে দিল না। তোমার বোঝবার বয়স পর্যন্তও অপেক্ষা করতে পারলো না?"

সুদীপের সব কথাই মনে ছিল। বড় হয়ে, বাবার শিক্ষায় আর বই পড়ে ও বুঝতে পেরেছিল, ঠাকুর্দা একজন ঈশ্বরবিশ্বাসী ধার্মিক মানুষ ছিলেন। ও বাবার মুখে শুনেছে, সমস্ত কর্তব্যকর্মের মধ্যেও ঠাকুর্দা 'ধর্ম' শব্দটিকে চাপিয়ে দিতেন। ধর্মের নামে, চিরকাল গরীবদের শোষণ করে আসা হচ্ছে। কিন্তু ঠাকুর্দা তাঁর ধর্ম ঈশ্বর সম্পর্কে এমন ব্যাখ্যা দিতেন, যেন তিনি শোষকদের ধর্মীয় চিন্তায় বিশ্বাসী ছিলেন না। ওর মতে ঠাকুর্দার ঐসব ব্যাখ্যার মধ্যে ছিল, বেশ সুন্দর ছলনা। গান্ধীর দরিদ্রনারায়ণকে তিনি যেমন ভারতীয় প্রলেতারিয়েত বলে হাস্যকর ব্যাখ্যা করেছিলেন। সুদীপের সেই সময়ের বাস্তব বোধ ও বৈজ্ঞানিক ধারণায়, অহিংসার বীজেই ছিল অবিশ্বাস। ওর কাছে গান্ধী ছিলেন আসলে একজন প্রতিক্রিয়াশীল মানুষ। অতএব ঠাকুর্দাও।

সেই সময়টা ছিল উনিশশো একান্ন সালের মাঝামাঝি। বাবা তখন বকসার জেলে। সুদীপের তখন ছ'বছর অতিক্রম করার আর বেশি বাকি ছিল না।

ঠাকুর্দা ওকে একদিন কাছে ডেকেছিলেন, "ছুবু, তোমার বাংলা লেখাব খাতাটা নিয়ে এসো তো ?"

সুদীপ অবাক হয়েছিল। ঠাকুর্দা ওব কোনো পড়াব বই খাতা কোনো দিন দেখতে চান নি। কিন্তু ও পাল্টা কিছু জিজ্ঞেস করেনি। নিচে গিয়ে ওব বাংলা লেখাব খাতা নিয়ে এসেছিল। ঠাকুর্দা চশমা ছাড়াই ভালো পড়তে পাবতেন। সুদীপের বাংলা খাতার পাতা ওলটাতে ওলটাতে, তাঁর চোখে মুখে খুশির ছটা ছড়িয়ে পড়েছিল, "বাঃ, বাহবা বাহবা হে ছুবু বাঁড়ুজ্জে। এত সুন্দর তোমাব হাতেব লেখা ! আমি ভাবতেই পাবিনি। আব দেখছি, তোমাব বানানও বেশ শুদ্ধ। হুঁ, আজ হল কী বাব ?"

"শুক্রবাব।" সুদীপের মনে ছিল।

ঠাকুর্দা মাথা ঝাঁকিয়েছিলেন, "কাল নিশ্চয়ই তোমাব ইস্কুল যাওয়া আছে ?"

"আছে।" সুদীপও ঘাড় ঝাঁকিয়েছিল, "হাফ ডে।"

ঠাকুর্দার গলার স্বর নেমে গিয়েছিল, "তা হলে কালকের দিনটিও থাক। বোববাবে সকালে কি তোমার মাস্টাব মশাই পড়াতে আসেন ?"

"না।" সুদীপ ঘাড় নেড়েছিল।

ঠাকুর্দাব মুখের রেখায় ও ভাঁজে হাসি ফুটে উঠেছিল, "তা হলে বোববার সকালে জলখাবাব খেয়ে তুমি আমাব কাছে চলে আসবে। তোমার কলমটি নিয়ে আসবে। কাগজ আমি বেখে দেবো। আমাব হাত দুর্বল, কাঁপে। আমি এখন আর ঠিক মতো লিখতে পাবিনে। তুমি আমাকে একটি চিঠি লিখে দেবে। তলায় সই করবো আমি।"

"শ্রুতলিপি ?" সুদীপ জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়েছিল।

ঠাকুর্দার মুখে ছিল স্নিগ্ধ হাসিব কিবণ। ঘাড় ঝাঁকিয়েছিলেন, "ঠিক বলেছো, শ্রুতলিপি। আমি বলবো, তুমি লিখবে। দেখছি যুক্তাক্ষবেও তুমি বেশ পাকা। তবে একটি কথা। চিঠির কথা এখন কাবোকে বলবে না।"

সুদীপ ঘাড় কাত কবে সম্মতি জানিয়েছিল। রবিবার সকালে, জলখাবার খেয়ে ঠিক সময়ে দোতলায় ঠাকুর্দার ঘরে গিয়েছিল। ঠাকুর্দাও প্রস্তুত ছিলেন। শোফাব সামনেই ছিল টেবিল। টেবিলের ওপরে ছিল ঠাকুর্দাব লাল হয়ে যাওয়া পুবনো কাগজের নাম ছাপা চিঠি লেখার প্যাড। কিন্তু টেবিলের ওপর ছিল শিশি বোতল আব মোড়াকে মোড়া গুচ্ছের ওষুধ। ঠাকুর্দা ওকে শোফায় বসে, টেবিলের ওপর প্যাড রেখে লিখতে বলেছিলেন। ও ঘাড় নেড়েছিল, "আমি মেঝেতে বসে লিখবো।"

"বেশ তাই লেখো।" ঠাকুর্দা নিজেই একটু সোজা হয়ে বসেছিলেন। তাঁর

চোখ বোজা, মুখ ছিল চিন্তামগ্ন।

সুদীপ চিঠি লেখার প্যাড আর কলম নিয়ে, ঠাকুর্দার শোফার পাশেই মেঝেতে বসেছিল। জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়েছিল তাঁর মুখের দিকে।

"একেবারে ওপরে লেখো, ওঁ।" ঠাকুর্দা চোখ না খুলেই উচ্চারণ করেছিলেন, "একটু নিচে, ডান দিকে লেখ আমাদের এ বাড়ির ঠিকানা, আর আজকের তারিখ। তারিখটা ঠিক মতো লিখতে পারবে তো?"

সুদীপ ঠাকুর্দার কথা মতো লিখতে আরম্ভ করেছিল, "পারবো। আজ হচ্ছে, বারো আট একান্ন।"

"চমৎকার!" ঠাকুর্দা চোখ খুলে, হেসে সুদীপের দিকে তাকিয়েছিলেন। তারপরে চিঠির কাগজের দিকে, "এবার সম্বোধন লেখ, 'কল্যাণীয়েষু'। লিখেছো? বেশ, এবার নিচে থেকে শুরু কর, 'তোমার এবারের কারাবাসে, আমি তোমাকে একটিও পত্র লিখি নাই, তুমিও লেখ নাই। তবে তোমার মাতৃদেবী, বউমা ও ছুবুকে লেখা পত্রাদিতে, তোমার আমার পরস্পরের কুশল জিজ্ঞাসার কথা অবগত আছি।' লিখেছো?" ঠাকুর্দা যথেষ্ট থেমে থেমেই কথাগুলো উচ্চারণ করেছিলেন। সুদীপের লিখতে কোনো অসুবিধে হয়নি। এবং চিঠিটি যে বাবাকে উদ্দেশ্য করে লেখা হচ্ছে, তাও ও দু লাইন লিখেই বুঝতে পেরেছিল। ওর গলা দিয়ে কেবল একটি শব্দ নির্গত হয়েছিল, "হুঁ।"

"বেশ।" ঠাকুর্দা শোফা থেকে একটু ঝুঁকে চিঠির কাগজের দিকে দেখেছিলেন, "হুঁ, পরস্পর বানান ঠিক লিখেছো। এবার লেখ, 'জানিয়া নিশ্চয় সুখী হইবে, আমার দুর্বল হাতের দায়িত্ব লইয়া, শ্রীমান ছুবু পত্রটি লিখিয়া দিতেছে। ছুবুকে দেখিয়া তোমার শৈশবকাল আমার স্মরণ হয়। সে অতিমাত্রায় পিতৃভক্ত পুত্র হইয়াছে. মহাত্মা সম্পর্কে তাহার ধারণা পিতারই বশবর্তী এবং শিশুটি ঈশ্বরেও বিশ্বাস করে না।' কী, ঠিক কথা বলেছি তো?"

সুদীপ লেখা শেষ করে, হেসে ঠাকুর্দার দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছিল, "হ্যাঁ।"

"বেশ।" ঠাকুর্দা মাথা তুলে নিয়েছিলেন। তাঁর মুখের হাসিতে ছিল তখন বিষণ্ণতা, "ঐ একই লাইনে লেখ, 'জানিয়া আমার মনের অবস্থা কী রূপ হইয়াছিল, আশা করি তুমি অনুমান করিতে পার। কিন্তু তাহাতে কিছু আসে যায় না। ছুবুর মনের কথা জানিয়া তাহাকে দিয়া এ পত্র লিখাইতে আমার কোনো রূপ দ্বিধা বা সংকোচ হয় নাই।' লিখেছো? বেশ, এবার নতুন প্যারাগ্রাফ শুরু করো। নতুন প্যারাগ্রাফ শুরু মানে জানো তো?"

"জানি।" সুদীপ জবাব দিয়ে, নতুন প্যারাগ্রাফ শুরুর জন্য অপেক্ষা করেছিল।

ঠাকুর্দা আবার একবার একটু ঝুঁকে চিঠির দিকে দেখেছিলেন, "লেখ, 'তুমি কবে জেল হইতে মুক্তি পাইবে, জানি না। আমার মনে একটা বিশেষ সংশয় দেখা দিযাছে, যে তোমার মুক্তি পাওযা পর্যন্ত আমি বাঁচিয়া থাকিব না। আমার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া তুমি কী করিবে, আমি জানি না। না জানিয়াও আমি একটি অনুরোধ জানাইয়া রাখি। মহাগুরু নিপাত ভাবিয়া তুমি এমন কোন হিন্দু আচরণ করিও না, যাহাতে তোমার আদর্শ ও মতবাদের স্খলন হয়। যে যাহা কিছু সমালোচনা করুক, আমি নীতিভ্রষ্টতাকে কোনো কালে মানিয়া লই নাই। তুমিও লইবে না, আমি এই বিশ্বাস লইয়া মরিতে চাহি।' লিখেছো?"

"হুঁ।" মাথাব ওপর পাখা চললেও, সুদীপ ঘেমে উঠেছিল। ওর হাতের লেখা আর একরকম থাকছিল না। একটানা ঐ সব শব্দ লেখার অভ্যাস ওর ছিল না। কিন্তু ও পরাজয় স্বীকার করেনি। জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়েছিল ঠাকুর্দার দিকে।

ঠাকুর্দা সুদীপের দিকে তাকিয়ে একটু যেন অনুতপ্ত হয়েছিলেন, "তোমাকে খুব কষ্ট দিচ্ছি। তবে আব বেশি কিছু লেখার নেই।"

"আমাব কষ্ট হচ্ছে না।" সুদীপ ভাঙলেও মচকাতে রাজী ছিল না। আসলে ওব প্রতি ঠাকুর্দার বিশ্বাস ও নির্ভরতাকে ভাঙতে দিতে চায় নি।

ঠাকুর্দা নিজেই শোফায এলিয়ে পড়ে, চোখ বুজেছিলেন, "লেখ, 'বাড়ির সকলের পত্রেই তুমি সব খবর পাইয়া থাকো। সবই যথাযথ রূপ চলিতেছে, তাহা জানো। আমবা সকলেই অবিলম্বে তোমার মুক্তি কামনা করি। সর্ব বিষয়ে তোমাব মঙ্গল হোক। সার্থক হোক তোমার জীবনের সাধনা। —ইতি,

স্নেহাশীর্বাদান্তে,' লিখেছো?"

"লিখেছি।" সুদীপ সোজা হয়ে বসেছিল।

ঠাকুর্দাও সোজা হয়ে বসেছিলেন। সুদীপের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, "দাও দেখি।"

সুদীপ প্যাডশুদ্ধ চিঠি তুলে দিয়েছিল ঠাকুর্দার হাতে। ঠাকুর্দা চোখের সামনে নিয়ে গোটা চিঠিটা একবার পড়েছিলেন। পড়তে পড়তে তাঁর সারা মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। সুদীপের দিকে স্নেহমুগ্ধ চোখে তাকিয়েছিলেন, "চমৎকার! জয় হোক তোমার। দাও, কলমটা আমাকে দাও।"

সুদীপ ঠাকুর্দার হাতে কলম এগিযে দিয়েছিল। ঠাকুর্দা চিঠি লেখা প্যাড টেবিলের ওপর রেখেছিলেন। কলম নিয়ে, ঝুঁকে পড়ে, 'স্নেহাশীর্বাদান্তে'-এর নিচে, কাঁপা কাঁপা হাতে নিজের নাম লিখেছিলেন, "শ্রীসূর্যমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়"। কলম সুদীপকে ফিরিয়ে দিয়ে, চিঠির পাতাটি খুলে

নিয়েছিলেন প্যাড থেকে।

"আর কিছু লিখবে না ?" সুদীপের চোখে ও গলার স্বরে ছিল অবাক জিজ্ঞাসা। ঠাকুর্দা তখন চিঠিটা ভাঁজ করছিলেন, "আর কী লিখবো ?"

"তুমি তো বাবার বাবা হও।" সুদীপের সেই একই বিস্ময়, "স্নেহাশীর্বাদান্তে-এর পরে 'বাবা' লিখলে না ?"

ঠাকুর্দা সুদীপের মুখের দিকে তাকিয়ে হেসেছিলেন, "আমি যে তোমার বাবার বাবা, সেটা আবার লিখবো কেন ? আমার নামেই তো প্রমাণ, আমি তার বাবা। কিন্তু শুধু বাবা লিখলে কি প্রমাণ হয়, চিঠিটা বাবাই লিখেছেন ? কোনো ছেলে কি তার বাবার চিঠির নিচে লেখে, ইতি প্রণামান্তে, ছেলে ?"

সুদীপ বেশ একটু অপ্রস্তুত ও অবাক হয়ে গিয়েছিল। ঠাকুর্দা ভুল কিছু বলেন নি। ও যখন বাবাকে চিঠি লিখতো, তখন, ইতি-র পরে নিজের নামই লিখতো, 'ছুবু'। ইতি, 'ছেলে' কখনও লেখা যায় না। কিন্তু বাবা তো, ইতি,'বাবা'-ই লিখতেন ?

"কী ? খুব ভাবনায় পড়ে গেলে মনে হচ্ছে ?" ঠাকুর্দা হেসে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়েছিলেন।

সুদীপ মাথা ঝাঁকিয়েছিল, "কিন্তু বাবা যে চিঠিতে শুধু 'বাবা'-ই লেখেন ? নাম তো লেখেন না ?"

"এখন লেখেন না, তুমি ছেলেমানুষ বলে।" ঠাকুর্দা হাসতে হাসতে, ভাঁজ করা চিঠি টেবিলের ওপর রেখে, একটা ছোট ওষুধের শিশি চাপা দিয়েছিলেন, "বড় হলে, তোমার বাবাও তাঁর নামই লিখবেন।"

সুদীপের কাছে ঠাকুর্দার কথা পুরোটা মনোমতো হয় নি। কিন্তু ও-বিষয়ে ও আর কিছু জিজ্ঞেস করে নি। ওর মনে তখন চিঠির বিষয়েই অনুসন্ধিৎসু জিজ্ঞাসা, "ঠাকুর্দা, তোমার কি সত্যি মনে হয়েছে, বাবা জেল থেকে ছাড়া পাবার আগেই তুমি মরে যেতে পারো ?"

"হ্যাঁ, মনে হয়েছে বলেই তো লিখলুম।" তাঁর সেই সর্দি জড়ানো মোটা স্বরে ক্লান্তিও নেমে এসেছিল।

সুদীপের মনে তখনও অনুসন্ধিৎসু জিজ্ঞাসা, "কিন্তু কী লিখলে তুমি বাবাকে ? তোমার কথাগুলো আমার সব মনে আছে। মানে একটুও বুঝতে পারি নি।"

"বড় হয়েও যদি মনে রাখতে পারো, তা হলে মানে বুঝবে।" ঠাকুর্দা হেসে তাঁর ডান হাতটা সুদীপের মাথায় রেখেছিলেন।

সুদীপ বড় হয়ে ঠাকুর্দার কথাগুলোর অর্থ উপলব্ধি করতে পেরেছিল। আর ঠাকুর্দাকে নিয়ে ওর মনের মধ্যে একটা দ্বিধার ভাব ছিল সেই কারণেই। ও ওর বাবার শিষ্য হিসাবে, বরাবরই ছিল, ঘোর দ্বান্দ্বিক ও বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদী। কয়েক বছর আগেও, কোনো কারণেই গান্ধীবাদী ঠাকুর্দার সঙ্গে ক্ষীণ মাত্র সহমর্মিতার সন্ধান পায় নি। ছ'বছর বয়সে, তাঁর যে-বয়ান ও লিখে দিয়েছিল, তার অর্থ ছিল, বাবা যেন কোনো কারণেই তাঁর মতবাদ আদর্শকে ক্ষুণ্ণ না করেন। নীতিভ্রষ্ট না হন। ঠাকুর্দার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে যেন তিনি কচ্ছোটিকা ধারণ বা হবিষ্যি গ্রহণ না করেন। শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া বা মাথা মুণ্ডন ইত্যাদি থেকে বিরত থাকেন।

বাবা ঠাকুর্দাকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলেন, "বাঁচা মরার বিষয়ে কিছুই বলা যায় না। তবে আমার আশা, জেল থেকে মুক্তি পেয়ে আপনাকে আমি দেখতে পাবো। আর নিতান্তই যদি আমার আশা ব্যর্থ হয়, তা হলেও, আপনি নিশ্চিন্ত থাকবেন, আপনি যদি পত্র না দিতেন, তা হলে, আমি কখনও নীতিভ্রষ্ট হতাম না।"

ঠাকুর্দা কিছু ভুল ভবিষ্যৎবাণী করেন নি। বাবা জেল থেকে মুক্ত হয়ে আসার চার মাস আগে তিনি মারা গিয়েছিলেন। এবং তিনি হিন্দুর ধর্মীয় কোনো প্রথাই পালন করেন নি। সুদীপকে তিনি নিজেই সে-কথা পরে জানিয়েছিলেন। কিন্তু মায়ের কথায় সুদীপকে এক দিক থেকে ওর বাবার কর্তব্য করতে হয়েছিল। মা ঠাকুর্দার মৃত্যুকে মহাগুরু নিপাত বলেই মনে করতেন। পুত্রবধূ হিসাবে, তেল সাবান কিছুই ব্যবহার করতেন না। হবিষ্যি খেতেন। সুদীপকেও খাওয়াতেন। সুদীপই ঠাকুর্দার মুখাগ্নি করেছিল। সুদীপ ওর ঠাকুরমাকে কাঁদতে দেখে নি। সধবার বেশ ত্যাগ করে বিধবা হয়েছিলেন। কথাবার্তা প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিলেন। সংসার থেকে নিজেকে যতোটা সম্ভব গুটিয়ে নিয়েছিলেন। পারতপক্ষে নিচে নামতেন না। দোতলার ঘরেই তিনি তাঁর হবিষ্যান্ন রান্না করতেন। খেতেন সারাদিনে একবার।

ঠাকুর্দার ব্যাংকে গচ্ছিত নগদ টাকা কিছু কম ছিল না। তবে তিনি সম্পত্তি হিসাবে নতুন বাড়ি ঘর তৈরি করেননি। কেনেননি। গাড়ি আগেই বিক্রি করে দিয়েছিলেন। তাঁর উইলটা ছিল একটু অদ্ভুত। তিন কন্যা ও এক পুত্রের কারোকেই কিছু দিয়ে যাননি। বাড়ির সমস্ত একতলার সম্পূর্ণ স্বত্ব দিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর একমাত্র পুত্রবধূকে। দোতলার স্বত্ব ঠাকুরমাকে দিলেও, একটি শর্ত আরোপ করা ছিল, ঠাকুরমার মৃত্যুর পরে দোতলার স্বত্বাধিকারী হবে সুদীপ। ব্যাংকে গচ্ছিত নগদ টাকা ও তার সুদ দিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর পুত্রবধূ ও স্ত্রীকে, সমান ভাগে। তাঁদের মৃত্যুর পরেও যদি সেই অর্থের যে কোনো পরিমাণ

গচ্ছিত থাকে, তা পাবে সুদীপ। এটাও একটা শর্ত ছিল।

সুদীপ এক সময়ে ভাবতো, ঠাকুর্দার সঙ্গে রাজনৈতিক আদর্শগত বিরোধের জন্যই, বাবাকে তিনি কিছুই দিয়ে যাননি। বিশেষ করে, গান্ধীবাদী ঠাকুর্দাকে যতোকাল ও কেবল ভাববাদী প্রতিক্রিয়াশীল ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারতো না, ততোকাল ঐ বিশ্বাসটাই ছিল বদ্ধমূল। কিন্তু পরবর্তীকালে ওর মনে হয়েছে, নিজের স্ত্রী আর পুত্রবধূকে সমস্ত কিছু দিয়ে যাবার পেছনে তাঁর কারণ ছিল একটাই। এই সমাজে নারীই সর্বাপেক্ষা অসহায়। কন্যাদের তিনি যথোপযুক্ত পাত্রস্থ করেছিলেন, এবং তাঁদের দানও কিছু কম করেননি। তাঁর পুত্র নাবালক ছিলেন না। অযোগ্যও না। অতএব নিজের স্ত্রী আর পুত্রবধূ, এই দুই নারীকেই তিনি সহায়তা করে গিয়েছিলেন।

বাবা জেল থেকে আসার পরে, ঠাকুরমাকে তিনি প্রণাম করেছিলেন। ঠাকুরমা বাবাকে ভালো মন্দ, কোনো কথাই জিজ্ঞেস করেননি। কিন্তু বাবার পক্ষে তখন সে-সব চিন্তা করার সময় ছিল না। তিনি জেলে থাকতেই, উনিশ শো বাহান্নর নির্বাচনের তোড়জোর শুরু হয়ে গিয়েছিল। পার্টির যাঁরা জেলে গিয়েছিলেন, তাঁরা অধিকাংশই তখন মুক্ত। নির্বাচনের আগে প্রায় সকলেই মুক্ত হয়েছিলেন।

যথার্থভাবে দেখতে গেলে, সংসদীয় গণতন্ত্রের পথে কমিউনিস্ট পার্টির সেই প্রথম যাত্রা। জেল থেকে এসে বাবার নাওয়া-খাওয়ার সময় ছিল না। তিনি নিজেই ছিলেন পার্টির মনোনীত অ্যাসেমবলির প্রার্থী। সুদীপের কাছে সেটা ছিল এক নতুন অভিজ্ঞতা। পোস্টার ফেস্টুনের ছড়াছড়ি। বাড়িতে সব সময় পার্টিকর্মীদের ভিড়। প্রতিদিনই মিটিং মিছিল আর বক্তৃতা লেগে থাকতো। বাবা নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন। জয়ী হয়ে ফেরার সেই দিনটি সুদীপের অনেককাল মনে ছিল। কী উত্তেজনা আর উল্লাস! বাবার নির্বাচনে জয়ী হওয়াটাও তখন ছিল যেন একটা বৈপ্লবিক ব্যাপার। সুদীপের নিজের মধ্যেও ছিল সেই উত্তেজনা আর উল্লাস। বাবার ভাবমূর্তি ওর কাছে পেয়েছিল এক নতুন মাত্রা।

বাবা জেল থেকে ফেরার এক বছর পরে ছোট ভাই বুবুর জন্ম হয়েছিল। সুজিত ওর ভালো নাম।

সুদীপ যে একজন মেধাবী ছাত্র, এটা প্রমাণ হয়ে গিয়েছিল মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে, ওর প্রথম শ্রেণী নিয়ে হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করা। অবিশ্যি বয়সটা বাড়িয়ে দেখাতেই হয়েছিল। সেই সঙ্গেই চলছিল দ্বান্দ্বিক বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের মর্মোদ্ধার। কমিউনিস্ট আন্দোলনের ধারা আর তার নীতিগত দিকগুলোর বাস্তবতাকে সঠিক জ্ঞান করে, কেবল নিজের ধারণাকেই পুষ্ট করেনি,

ধারণাগুলো লাভ করেছিল বাবার কাছ থেকে। যে-কারণে বাবা ছিলেন ওর গুরু। ফিজিকস-এ অনার্স নিয়ে পড়বার সময়ে, কলেজে রাজনীতি করেছে। বিতর্কে যোগ দিয়ে ধরাশায়ী করেছে ও প্রতিটি প্রতিদ্বন্দ্বীকে। সেই সময়ে, তিন বছরের অনার্স কোর্সের শেষ পরীক্ষা ওকে দিতে হয়েছিল বাষট্টিতে, জেলের ভিতরে। চীনা আগ্রাসন ও যুদ্ধের সময়। তারপর মেকানিকাল এঞ্জিনিয়ারিং-এর পাঠ।

সুদীপের কাছে একটা বিষয় পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। সেটা ছিল, বাবা কোনো দিনই ওকে পার্টির একজন কর্মঠ নিয়মিত কর্মী হিসাবে গড়ে তুলতে চাননি। তিনি কোনো দিন ওকে পার্টির সভ্য হবার জন্য আগ্রহ দেখান নি। এবং কোনো দিনই ও পার্টির সভ্য পদের জন্য আবেদন করেনি। অথচ ও প্রায়ই কলকাতার পার্টির প্রধান অফিসে যেতো। সারা ভারতের পার্টি নেতাদের সঙ্গে ওর পরিচয় ঘটেছে। চৌষট্টিতে অল্প দিনের জন্য হলেও, বাবার সঙ্গে ওকে জেলে যেতে হয়। পার্টি আদর্শে আর মতবাদের বিরোধিতায় দ্বিধাবিভক্ত হয়েছিল। বাবার সঙ্গে ও ছিল জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের পক্ষাবলম্বী। কলেজ থেকে বেরিয়ে আসার পর, ও প্রকাশ্যে কোনো দিন পার্টির সভায় বক্তৃতা করেনি। যতোকাল ছাত্র আন্দোলন করেছে, ততোকাল ওর রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সীমাবদ্ধ ছিল সেখানেই। ও পার্টির নীতি ও আদর্শগত তাত্ত্বিক দিক নিয়ে পার্টির পত্রিকায় অল্পবিস্তর লেখালেখি শুরু করেছিল।

ইতিমধ্যে সুদীপদের পরিবারে স্বাভাবিক ভাবেই কিছু পরিবর্তন ঘটেছিল। ঠাকুরদা মারা যাবার সাত বছর পরে ঠাকুমা মারা গিয়েছিলেন। সেই বছরটাই ছিল সুদীপের হায়ারসেকেণ্ডারি পরীক্ষার সময়। আর মা সেই সময়েই সুদীপের উপনয়নের প্রশ্ন তুলেছিলেন। সুদীপের বিশ্বাস ছিল, উপবীতত্যাগী বস্তুবাদী বাবা কখনও সম্মত হবেন না। কিন্তু সম্মত না হলেও, তাঁর মধ্যে একটা দ্বিধার ভাব দেখা দিয়েছিল। কথাটা উঠেছিল পার্টির নেতৃত্ব পর্যায়ে। বিষয়টিকে ধর্মীয় চোখে দেখার থেকেও, লোকাচারের মর্যাদাই বেশি দেওয়া হয়েছিল। অতএব, সুদীপের উপনয়ন হয়েছিল। কেবল সীতানাথ জেঠু হেসে বাবাকে বলেছিলেন, "গীতার মূল মর্মটা ছুবুকে বুঝিয়ে দিও। উপবীত ধারণ করলেও, ব্রাহ্মণ সন্তানের ডাকাত হতে বাধা নেই। তেমনি ছুবুর উপবীত ওর মার্কস্-এর তত্ত্বে, পার্টির জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব করতে কোনো বাধা হবে না।"

সুদীপ এখন ওর মন থেকে যে ব্যাখ্যাটা করতে পারে, যতো মেধাবীই হোক, চৌদ্দ বছর বয়সে, উপনয়নের দিন কেন ঠাকুর্দার কথা মনে হয়েছিল, বুঝতে পারেনি। মনে হয়েছিল, ঠাকুর্দা বেঁচে থাকলে সুখী হতেন। এবং ঠাকুর্দার জন্য

ওর মন খারাপ হয়েছিল। কিন্তু সে-কথা ও কারোকে বলোনি। বুবুরও উপনয়ন হয়েছিল। রুন্টুর প্রেমের পাত্রের সঙ্গে হিন্দু মতেই ঘটা করে বিয়ে হয়েছিল। রুন্টু পেয়েছিল ঠাকুরমার অনেক গহনা। ঠাকুর্দার টাকা খরচ করে হাজার লোককে খাওয়ানো হয়েছিল।

ঠাকুর্দার মতো, বাবাও চেয়েছিলেন, সুদীপ বিলাতে বা আমেরিকায় যাবে। ওর মেকানিকাল এঞ্জিনিয়ারিং-এর রেজাল্ট হয়েছিল খুব ভালো। সুদীপ যেতে চেয়েছিল কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পিতৃভূমি সোভিয়েত-রাশিয়ায়। সেটা উনসত্তর সাল। রাজ্যের রাজত্ব যুক্তফ্রন্টের হাতে। রাজ্যের রাজনীতিতে যাঁরা ছিলেন বরাবর বিরোধী দলে, তাঁরা তখন শাসক। সাম্প্রতিক কালে, সুদীপের ভাষায়, "সংসদীয় প্রথায় নির্বাচনে জিতে, ক্ষমতা লাভের পর, দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে এ রাজ্যের বিপ্লবীদের সেই প্রথম ক্ষমতা নামক মদের পাত্রে চুমুক। কিন্তু সে-আঁতাত ছিল অসম্ভব। ক্ষমতাব দ্বন্দ্বে ফ্রন্ট ভেঙে গিয়েছিল। যদিও সেই দ্বন্দ্বটাকে বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছিল, আদর্শগত। যুক্তফ্রন্ট বজায় থাকতেই ঘটেছিল নকশাল অভ্যুত্থান। অবস্থা কোনো দিক থেকেই সামাল দেবার মতো ছিল না। সংসদীয় গণতন্ত্রেব পথে গিয়ে, বিপ্লবীদের ক্ষমতা ভোগের গোলাপী নেশা জমে ওঠবার আগেই তা ভেঙে গিয়েছিল।"

সুদীপ চেষ্টা করলে, হয়তো সোভিয়েত রাশিয়ায় যেতে পারতো। কিন্তু নকশাল অভ্যুত্থানের ঘটনাটা ওকে থমকে দিয়েছিল। সেই প্রথম ওর মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছিল, বাবা হয়তো ঠিক পথে চলছেন না। ওর ভিতরে এক দুরন্ত প্রত্যাশা আর উত্তেজনা। ও বিশ্বাস করেছিল, নতুন একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। তাব আগেই চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব ওর মনে একটা নতুন ক্রিয়া করেছিল। বাবার সঙ্গে বিতর্কে যাবার মতো মনের শক্তি তখনও ওর ছিল না। নকশাল আন্দোলনকে বাবা শুধু একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলেই ক্ষান্ত থাকেননি। বলেছিলেন, এটা তাঁদের পার্টির বিরুদ্ধেই বিশ্বাসঘাতকতা।

সুদীপ কোনো বিতর্কে যায়নি। কিন্তু সমস্ত ঘটনা পর্যবেক্ষণ করছিল গভীর ঔৎসুক্যের সঙ্গে। আর চব্বিশ বছর বয়সেই ও সেই বিখ্যাত ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফার্মে এঞ্জিনিয়ারের চাকরিটা পেয়ে গিয়েছিল অনায়াসে। ইতিমধ্যে, এক বছর যেতে না যেতেই, নকশালদের সম্পর্কে ওর স্বপ্নভঙ্গ ঘটতে আরম্ভ করেছিল। নকশালরা যে কেবল নিজেদের স্থান থেকেই সরে আসেনি, তা নয়। আসলে কোথাও ওদের কোনো শিকড়ই ছিল না। অথচ প্রচলিত বিপ্লবী ধারণাগুলো এমন ভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল, শহরের তরুণরা নকশাল আন্দোলনের আদর্শটাকে গিলে ফেলতে দেরি করেনি। যার পরিণামটা হয়েছিল আরও খারাপ। গ্রামে

ওরা কয়েকজন জোতদারকে হত্যা করেছিল। কিন্তু জোতদার আর পুলিশের ক্ষমতার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে নি। অতএব চলো শহরেই। শুরু হয়েছিল ব্যক্তিহত্যা। ওরা চীনের চেয়ারম্যানকে ঘোষণা করেছিল নিজেদের চেয়ারম্যান বলে। কলকাতায় যে-সব কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবী কোনো দিনই কোনো আন্দোলনে এগিয়ে আসেননি, তাঁরা হঠাৎ নকশাল আন্দোলন নিয়ে মাথা ঘামাতে বসে গিয়েছিলেন। পত্রিকা প্রকাশ করছিলেন। বই লিখছিলেন।

সুদীপ ভ্রূকুটি বিস্ময়ে লক্ষ করেছিল, নকশালদের ক্ষেত্রে পার্টি ভাগ হয়ে যাওয়ার সেই অশুভ নিয়তির অনিবার্য আবির্ভাব ঘটেছিল। ব্যক্তি হত্যার দ্বারা ওরা প্রমাণ করছিল, অসহায় আর গরীব মানুষ ছাড়া ওদের শিকার আর কেউ ছিল না। মন্ত্রী, পুলিশের বড় কর্তা, ধনী কোটিপতি, যারা সমাজের প্রকৃত শোষক, তাদের একজনের গায়েও ওরা হাত দিতে পারেনি। তবু একটা সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল। আর সেই সন্ত্রাসের বিভীষিকার মধ্য দিয়ে নকশাল আর সমাজবিরোধীদের আলাদা করা হয়ে উঠেছিল অসম্ভব।

সুদীপ বাবার সঙ্গে আলোচনা করে, গুরুকেই মেনে নিয়েছিল। লেনিন আর মাওৎসেতুং-এর সার বাক্য নিয়ে যারা ঝাঁপ দিয়েছিল, সেই বাক্যকে অসার প্রতিপন্ন করে, নিজেদের পতনকে ডেকে নিয়ে এসেছিল। তবে, ওদের নেতাদের বাদ দিয়ে, সুদীপের একটা বিশ্বাস আজও নষ্ট হয়নি। ওদের মধ্যে যে-সব তরুণ পুলিশের হাতে প্রাণ হারিয়েছিল বা এখনও বেঁচে থেকে, গোপনে সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা করছে, তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন খাঁটি এবং বিশ্বাসী। ওর নিজের এই বিশ্বাসটা নিয়ে, ও বাবার সঙ্গে আলোচনা বা বিতর্কে যায়নি। মনের কথাটা আভাসে জানিয়েছিল সীতানাথ জেঠুকে। সীতানাথ জেঠু স্বীকার করেছিলেন, 'তোমার সঙ্গে আমি এক মত। তবে এখনো যারা সারা দেশ ঘুরে ঘুরে সংগঠন গড়ে তোলবার চেষ্টা করছে, আর যে-ভাবে করছে, তাতে সারা দেশব্যাপী অভ্যুত্থান ঘটানো সম্ভব নয়। ভারতবর্ষের মতো এত বড় দেশে, কেবল গুপ্ত সংগঠনের দ্বারা অভ্যুত্থান ঘটানো যায় না। ওদের খোলা জায়গায় বেরিয়ে আসতে হবে। সঠিক নীতি ঘোষণা করে, আন্দোলনের দ্বারাই নিজেদের শক্তিকে প্রমাণ করতে হবে।'

কংগ্রেস তখন চুটিয়ে রাজত্ব করছিল। এলাহাবাদ কোর্টের বিচারে, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বিপদের গন্ধ পেয়েছিলেন। পঁচাত্তরে ঘোষিত হল এমারজেন্সি। জয়প্রকাশনারায়ণ তখন ময়দানে। জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবীরা জয়প্রকাশকে ফ্যাসিস্ট বলে আখ্যা দিল, আর তাঁর ইন্দিরাবিরোধী আন্দোলনের বিরুদ্ধে নানাভাবে প্রচার শুরু করেছিল। সুদীপ শুনেছিল, জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবীদের

নাকি লিঙ্ক করা হবে। কিন্তু তাবা তখন এমন একটা তৃষ্ণীভাব গ্রহণ কবেছিল, যার মধ্যে কোনো ঝুঁকি ছিল না। অতএব তাদেব লিঙ্ক করা হয়নি। বরং, জরুরি অবস্থা ঘোষণার পরিণামে, সাধারণ মানুষের অসন্তুষ্টির সুযোগ নিয়েছিল একশো ভাগ। উনিশশো সাতাত্তর সালে, নির্বাচনেব বিশাল জয়ে, রাজ্যে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল বামফ্রন্ট সবকার। কেন্দ্রেও তখন কংগ্রেস পরাজিত। মতে আর আদর্শে, কোনো দিক থেকে মিল নেই, এমন কতগুলো দল, সেই একই অপবিণামদর্শী জরুবি অবস্থাব সুযোগে কেন্দ্রে সরকাব গঠন করেছিল।

বামফ্রন্টের জয়ে, সুদীপ তখন দারুণ খুশি আর উত্তেজিত। বাবা জীবনে একবার মাত্র নির্বাচনে পরাজিত হয়েছিলেন। সেটা ছিল বাহাত্তরের নির্বাচন। সাতাত্তরে বাবা কেবল একজন দাযিত্বশীল বিভাগের মন্ত্রী নন, এক বছব পরেই, ফ্রন্টেব তাত্ত্বিক নেতাদেরও একজন হযে পড়েছিলেন। কিন্তু উনআশিতে বুবুর ব্যাংকে একটা ভালো চাকরি পাওয়াটা সুদীপকে বিচলিত করেছিল। ও বুবুকে ছোট ভাই হিসাবে যথেষ্ট স্নেহ কবতো, ভালবাসতো, আর এটাও বিশ্বাস করতো, বংশের সব ছেলেরাই একবকম হয না। বুবু লেখাপড়ায় আদৌ ভালো ছিল না। কোনোরকমে বি-এ পাশ করেছিল। বাবা ওকেও কোনোকালেই পার্টির নিয়মিত কর্মী হিসাবে গড়ে তোলেন নি। বুবু পার্টিব সভ্যও ছিল না।

অথচ পার্টির লোকাল কমিটির সঙ্গে ওর যেমন মেলামেশা ছিল, তেমনি পার্টির সম্পর্ক, কিন্তু বকবাজদের সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব ছিল প্রগাঢ়। সুদীপের সঙ্গে বাবাব যে-সম্পর্ক ছিল, বুবুর সঙ্গে কখনও তো ছিল না। তবে, বুবু বলতে দ্বিধা করতো না, "এই জয় আব সরকাব গঠনই প্রমাণ কবছে, আমরা বিপ্লবের পথে এগিযে চলেছি।"

বুবুর ব্যাঙ্কে চাকবি পাওযার বিষযটি বাবা একবাবও সুদীপকে বলেননি। যেন উনি ব্যাপারটার মধ্যেই ছিলেন না। খববটা ও প্রথম পেয়েছিল মা'র কাছ থেকে। তাবপবে বুবুব কাছ থেকে, "জানো দাদা, ব্যাঙ্কে আমার একটা চাকরি হযেছে। সব মিলিযে এখন পাবো দু'হাজাবেব মতো। এ চাকরি করার ইচ্ছে আমার নেই। চাকবি করে কেউ কোনোদিন বড়লোক হয় না। আমি চাই ব্যবসা করতে। চাকরি পেলেও, আমি সেই তালেই আছি।"

"চাকবি হঠাৎ পেলি কেমন করে?" সুদীপের চোখে ছিল সন্দিগ্ধ জিজ্ঞাসা।

বুবুর জবাব ছিল খুবই অনায়াস, "কেন, এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে আমার নাম ছিল। তাছাড়া আমাদের পার্টির ট্রেড ইউনিয়ন লিডাব কমরেড হৃদয় ব্যানার্জি, আমাদের ব্যাঙ্ক ইউনিয়নেব সারা পশ্চিমবঙ্গের লিডারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। ব্যাঙ্কে ইউনিয়নই হল সব। হয়ে গেল।"

মা'র তো কালীঘাটে পুজোর আর শেষ ছিল না। সুদীপ যখন চাকরি পেয়েছিল, তখনও মা পুজো দিয়েছিলেন। বাবার সাতাত্তরে নির্বাচনে বিপুল জয়ের পর পুজো দিয়েছিলেন। মন্ত্রী হবার পরে, আবার পুজো দিয়েছিলেন। বুবুর চাকরি হবার পরেও পুজো দিতে ছুটেছিলেন। গৃহদেবতা বনমালী তো প্রকৃতই জাগ্রত দেবতা ছিলেন। তাঁর আশীর্বাদ পরিবারে অজস্র ধারায় ঝরে পড়ছিল। বুবুর কথায়, তথাপি সুদীপ না হেসে থাকতে পারেনি, "কিন্তু ট্রেড ইউনিয়ন লিডার হৃদয় ব্যানার্জির কাছে যাবার বুদ্ধিটা তোকে কে দিল ? লোকাল কমিটি, না তোর পার্টি ক্যাডার বন্ধুরা ?"

"তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে দাদা ?" বুবুও হেসেছিল, "পার্টি পাওয়ারে আসার পরে, মুন্না (জয়তী) আমাকে বছরখানেক ধরেই পরামর্শ দিচ্ছিল, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের কার্ড নিয়ে কমরেড হৃদয় ব্যানার্জির কাছে যাবার জন্য। অবিশ্যি ব্যাঙ্কে চাকরি হবে, এমন কথা ও বলেনি। তারপর আমি বাবাকে বলেছিলাম। বাবা কেবল আমাকে একটা কথাই জিজ্ঞেস করেছিলেন, হৃদয়বাবুর কাছে কবে যাবি ? আমি বলেছিলাম, সেটা এখনো ঠিক করিনি। বাবা বলেছিলেন, ঠিক আছে। দু-তিন দিন বাদে যাস। আমি তিন দিন বাদে গেছলাম। উনি আমাকে বলে দিয়েছেন, এসব নিয়ে কারোর সঙ্গে কোনোরকম আলোচনা করো না। আমি বাবাকে বলেছি। আর তোমাকে বললাম।"

সুদীপ বুবুর ধূর্ত চোখের দিকে তাকিয়ে হেসেছিল, "তা তোর বন্ধুরা কিছু বলেনি ?"

"বলেনি আবার ?" বুবু প্রাণ খুলে হেসেছিল, "সবাই জানতে চেয়েছিল, চাকরিটা কেমন করে পেলাম। আমি স্রেফ বলে দিয়েছি, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের কার্ড দেখিয়ে। ওরাও ছুটোছুটি কম করেনি। কেবল লোকাল কমিটির শিশির কোনার আমাকে বলেছে, 'কী বিপ্লবী মন্ত্রীর ছেলে, চাকরিটা কোন্ বিপ্লবী কায়দায় জোটালে ?' সবাই জানে, ঐ শিশির কোনারটা বাবার বিরুদ্ধে। ও লোকাল কমিটির আরও অনেককে বাবার বিরুদ্ধে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। শিশির কোনারের ঐ কথা শোনার পরে, আমি আর লোকাল কমিটির অফিসে যাইনে।"

সুদীপ আর বুবুর সঙ্গে চাকরির বিষয়ে কোনো কথা বলেনি। বুবুর চাকরি পাওয়ার ঘটনায়, ও যেমন বিচলিত হয়েছিল, তেমনি বাবার প্রতি ওর অভিমানও হয়েছিল। বুবুর চাকরিটা আদৌ বাবার অজ্ঞাতসারে হয়নি। বরং বুবুর কথা থেকেই বোঝা গিয়েছিল, মন্ত্রী সৌরীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বয়স্ক ট্রেড ইউনিয়ন নেতা হৃদয় ব্যানার্জির কথা হয়েছিল। সেই কারণেই বাবা, বুবুকে হৃদয়

ব্যানার্জির কাছে দু-তিন দিন বাদে যেতে বলেছিলেন। উভয়ের মধ্যে কথা হয়ে গিয়েছিল নিশ্চয়। অবিশ্যি সৌরীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলের অর্থোপার্জনের একটা ব্যবস্থা হওয়া এমন কিছু আশ্চর্যের ব্যাপার না। তাঁর ছেলে সুজিত বন্দ্যোপাধ্যায় যদি নিজের বুদ্ধিতে কোনো ব্যবসা গড়ে তোলার চেষ্টা করতো, তাকে সাহায্য করার জন্য অনেক হাত এগিয়ে আসতো। এবং তখনও সুদীপ জানতো না, বুবু নতুন কিছু করবে কি না। কারণ বুবু নিজেই সুদীপকে বলেছিল, 'চাকরি করে কেউ বড়লোক হয় না। আমি চাই ব্যবসা করতে। চাকরি পেলেও, আমি সেই তালেই আছি।'

বুবুর পক্ষে একটা চাকরি বা একটা কোনো ব্যবসায় লেগে পড়া, কোনোটাই অসম্ভব ব্যাপার ছিল না। মন্ত্রীর ছেলে না হয়েও, একজন তা পারে। চারপাশে যখন লক্ষ লক্ষ ছেলে বেকার জীবন কাটাচ্ছে, তখনও কোনো কোনো ছেলে, অলৌকিকভাবেই যেন চাকরি পেয়ে যাচ্ছে। ব্যবসায় সফল হচ্ছে। সে সব সাফল্যের ক্ষেত্রে, কৃতিত্বও নিশ্চয়ই আছে। অলৌকিক ঘটনা কোনোটাই না। বরং সকলের কাছে, বুবুর চাকরি পাওয়াটাই অলৌকিক ঘটনা। ও যে-পদ্ধতিতে চাকরিটা পেয়েছিল, স্বাধীন ভারতে ঐ পদ্ধতিটা, সত্তর দশকের শেষে, মোটেই আশ্চর্যের ঘটনা কিছু ছিল না। কিন্তু সুদীপের মনটা অশান্তি আর অস্বস্তিতে ভরে উঠেছিল। বুবু তো কেবল ওর ভাই ছিল না। ছিল ওর গুরুপুত্রও বটে।

সুদীপ বাবাকে কোনো কথা জিজ্ঞেস করেনি। বস্তুতপক্ষে, সাতাত্তরের নির্বাচনের কয়েক মাস পর থেকেই, বাবার সঙ্গে ওর দেখাসাক্ষাৎ খুব কমে গিয়েছিল। কথাবার্তা তো দূরের কথা। খবরের কাগজেই বাবার সংবাদ বেশি পাওয়া যেতো। তার জন্য ওর মনে কোনো দুঃখ বা ক্ষোভ ছিল না। বাবা বা পার্টির প্রতি ওর বিশ্বাস ছিল অনড়, অটল। ও বিশ্বাস করতো, সংসদীয় প্রথায় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে, জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে দেশকে সাময়িকভাবে শাসন করার মধ্যে, কোনো তত্ত্বগত ভুল ছিল না। কিন্তু সেই শাসন পদ্ধতি অবিশ্যিই দক্ষিণপন্থী বুর্জোয়াদের পদ্ধতির থেকে হবে অনেক ভিন্ন। আর দুটো চরিত্র গুণগতভাবেই সম্পূর্ণ আলাদা। সাময়িকভাবে, বুর্জোয়া সংসদীয় কাঠামোর মধ্যে, একটা রাজ্যে ক্ষমতা লাভের অর্থই হল, সারা দেশে, শ্রেণীবৈষম্যের বিরুদ্ধে, জনমতকে তৈরি করার আরও বেশি সুযোগের সদ্ব্যবহার করা। সংসদীয় নির্বাচনের পথ একটা খুব ছোট পর্যায় মাত্র। তাও যদি কাল আর পরিস্থিতির পক্ষে সঙ্গত বলে মনে হয়। এ পর্যায়টা একদিক থেকে রক্ষণশীল নিঃসন্দেহে, তবে সেটা আপেক্ষিক। অনাপেক্ষিক হল এর বৈপ্লবিক তাৎপর্য। আর সেটাকেই ত্বরান্বিত করা ছিল পার্টির সব থেকে বড় কাজ। সাতাত্তর থেকে

উনআশির মধ্যে, পার্টি তার সেই বৈপ্লবিক তাৎপর্য হারিয়েছিল, এমন সন্দেহ সুদীপের মনে আসেনি। অতএব, বাবার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ কমে যাওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক। বাবা তো শুধু একজন মার্ক্সবাদী মন্ত্রী নন। নেতা আর কর্মীও বটেন। তাছাড়া, সুদীপ নিজেও যথেষ্ট ব্যস্ত মানুষ। ওর কর্মক্ষেত্রে, প্রথমে একজন সামান্য মেকানিকাল এঞ্জিনিয়ার হয়ে চাকরিতে ঢুকলেও, ও কাজের বিষয়ে ছিল খুবই সচেতন। কোনো বিষয়কেই আধখেচড়া ভাবে নেওয়া ওর ধাতে ছিল না। ও কোনো সমাজতান্ত্রিক দেশের কারখানায় 'হিরো' হবার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামেনি। কিন্তু ও ওর কাজে ছিল একাগ্র।

সুদীপ জানে, সমস্ত বিশ্বসংসারের মানুষের জীবনে একটা বড় অভিশাপ হল, যে-কাজের প্রতি তার কোনো আকর্ষণ নেই, জীবনধারণের জন্য সে-কাজই তাকে করতে হয়। ফলে, সে-কাজের উৎকর্ষের প্রতি কর্মীর কোনো আগ্রহ থাকে না। সাধারণ চাকরির ক্ষেত্রেই কথাটা বেশি খাটে। কিন্তু শৈশব থেকে, যে লক্ষ্য নিয়ে কেউ কেউ এঞ্জিনিয়ারিং অথবা ডাক্তার ইত্যাদি জাতীয় শিক্ষা লাভ করে, তাদেরও দেখা গিয়েছে, সে-লক্ষ্য থেকে তার আকর্ষণ অন্য পথে চালিত হচ্ছে। সৌভাগ্যবশত, সুদীপের ক্ষেত্রে তা ঘটেনি। ও ওর কাজটাকে ভালবাসে। যন্ত্রের মধ্যে কেবল যান্ত্রিকতা নেই। যন্ত্রের সঙ্গে কাজ করতে গেলেই, জানা যায়, তার নিজস্ব কতগুলো দাবী আছে। সেই দাবীগুলো না মিটলে, সে বিগড়ে যায়। আর এই অভিজ্ঞতা থেকেই, মানুষের জীবনকেও বোঝা যায়। অতএব যন্ত্র নিয়ে কাজ করার মধ্যেও একটা আকর্ষণ থাকে। যে-আকর্ষণ, কাজের উৎকর্ষ আর উৎপাদনকে সার্থক করে। কিন্তু সুদীপ কখনও আশা করতে পারে না, যে-সব শ্রমিকরা যন্ত্রের সঙ্গে কাজ করে, তারা তাদের কাজকে ভালবাসে। তা ছাড়া, কাজের উৎকর্ষ আর উৎপাদনের প্রয়োজনে, তাদের আগ্রহকে বাড়িয়ে তোলার কোনো নীতিই মালিকশ্রেণীর নেই। শ্রমিকদেরও কাজের প্রতি অসীম অনীহা।

সুদীপের পক্ষে শ্রমিক ইউনিয়নের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রাখার কোনো পথ ছিল না। কিন্তু ব্যবহারের দিক থেকে, ও অধিকাংশের প্রীতি লাভ করেছিল। কর্তৃপক্ষের সপ্রশংস দৃষ্টি ছিল ওর কাজের প্রতি। ফলে, ওর ক্রমোন্নতি ঘটেছিল। সাতাত্তরের নির্বাচনের আগে পর্যন্ত, ওদের কলকাতার অফিস, আর উপকণ্ঠে কারখানার শ্রমিক কর্মচারীর একমাত্র ইউনিয়ন ছিল কংগ্রেসের অধিকারে। নতুন সরকার গঠনের পরেই, শাসক পার্টির ইউনিয়ন যেন স্বাভাবিকভাবেই মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। দক্ষিণ আর বামপন্থী ইউনিয়ন। অবিশ্যি বিনা যুদ্ধে বামপন্থীরা ঢুকতে পারেনি। পরস্পরের বিবাদকে

কেন্দ্র করে, কারখানা আর অফিসের কাজও যথেষ্ট ব্যাহত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত সহাবস্থানে রফা হলেও, বামপন্থীবা নিজেদেব প্রভাবকে বাড়াবাব জন্য কয়েকটি ছোটখাটো দাবীর ভিত্তিতে আন্দোলন শুরু করেছিল। দক্ষিণপন্থীরা প্রথমে আন্দোলনের বিরোধিকা কবলেও, নিজেদের প্রভাব বজায় রাখবাব জন্য, বামপন্থীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। কর্তৃপক্ষ দু-একটি দাবী সম্পর্কে বিবেচনার আশ্বাস দেওযাতেই, আন্দোলন তুলে নেওয়া হয়েছিল।

সুদীপ বামপন্থী ইউনিযনের দাবীগুলো সম্পর্কে যথেষ্ট দ্বিধান্বিত ছিল। কারণ, ঐ দাবীগুলো নিযে আন্দোলনের কোনো যুক্তি ও খুঁজে পাযনি। শ্রমিকদের সঙ্গে ওব সরাসবি যোগটা ছিল কাজের মধ্য দিয়ে। ও তাদেব কাছে জানতে চেয়েছিল, নতুন ইউনিয়নের দাবীগুলো তাবা আগে ভেবেছিল কি না, বা সমর্থন করে কি না। ও জবাব পেয়েছিল, "ও সব ভাবাটাবা আর সমর্থনের কথা ছাড়ুন তো সাহেব। যা পাওয়া যায়, তাই লাভ। পাইয়ে দিলেই আমরা খুশি।"

সুদীপ শ্রমিকদের কথায় নিজেকেই কেমন অসহায় বোধ করেছিল। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন কোন্ দিকে যাচ্ছে, ও কিছুই বুঝে উঠতে পাবেনি। তবে এটাও ঠিক, দক্ষিণপন্থী ইউনিয়নেব কিছুটা বিপর্যয়ের পবে, শ্রমিকদের মধ্যে কযেকজন জঙ্গী নেতাব আবির্ভাব হয়েছিল। কিন্তু শ্রমিক ইউনিয়ন নিয়ে প্রথমদিকে ও তেমন চিন্তিত ছিল না। কারণ ওর তখনও বিশ্বাস ছিল, বাবা এবং তাঁদের পার্টির কৌশল অনুযায়ী, শ্রমিকদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তোলার ভিতর দিয়েই, প্রচ্ছন্নভাবে বিপ্লবকেই সংগঠিত করাই হল প্রধান উদ্দেশ্য। অতএব, ইউনিয়নেব জবরদখলেব বিষয়ে, যে-কৌশলই গ্রহণ করা হোক, তাতে ওর কোনো দ্বিধা থাকা উচিত না। কিন্তু সেই কৌশলের সঙ্গে, অন্যায় দাবী আর উৎপাদনকে ব্যাহত করার অর্থ, মূলে খড়্গাঘাত করা। এই সব বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে গিয়েই, বুবুর চাকবি পাওয়ার বিষয়টা সুদীপ মেনে নিতে পারেনি।

ঊনআশিতে, সুদীপের জীবনে সেই প্রথম ঘটনা, যা নিয়ে ও বাবার সঙ্গে আলোচনা করেনি। ও প্রথমে জযতীর কাছে সব জানতে চেয়েছিল। কারণ, জয়তীই বুবুকে এক বছর ধরে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের কার্ড নিয়ে হৃদয় ব্যানার্জির সঙ্গে দেখা করার পরামর্শ দিয়েছিল। জয়তী আর বুবুর মধ্যে একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। ওর সঙ্গে বুবুর পরিচয়ও হয়েছিল আগে। বুবু পার্টির সদস্য না হলেও, পার্টির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থাকতো। সুদীপ বুবুর মুখ থেকেই প্রথম জয়তীর কথা শুনেছিল। বুবুর কথা থেকে, জয়তীকে সম্পূর্ণ বুঝে ওঠা সম্ভব ছিল না। কিন্তু বুবু জয়তী সম্পর্কে এক অপার কৌতূহল, বিস্ময় আর আগ্রহ জাগিয়ে তুলেছিল সুদীপের মনে। তারই পরিণতি, ওর সঙ্গে জয়তীর গড়ে

উঠেছে এক জটিল সম্পর্ক।

সুদীপের জানতে চাওয়ার জবাবে, জয়তী একটু বিব্রত হয়েছিল। ওর হাসিতে ছিল কুণ্ঠা, "কেন, বুবুর চাকরি পাওয়াতে তুমি খুশি হওনি ?"

"না।" সুদীপ জয়তীর টানা কালো চোখের দিকে অসহায় বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল, "বুবুর যোগ্যতাব কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। কিন্তু যে পদ্ধতিতে ও চাকরিটা পেয়েছে, তাতে খুশি হবো কেমন করে ?"

জয়তীর কুণ্ঠা দূর হয়নি। ও সুদীপের প্রশ্নটা সরাসরি এড়িয়ে গিয়েছিল, "বুবুর কিন্তু একটা চাকরির খুবই দরকার ছিল।"

"কে তা অস্বীকার করছে ?" সুদীপের চোখমুখের অভিব্যক্তিতে, গলার স্বরে, অবাক জিজ্ঞাসা যেন অসহায় হয়ে উঠেছিল, "একটা ছাব্বিশ বছরের ছেলে, তার কতোরকমেব খরচ থাকতে পাবে। বুবুব হাতে ইদানীং আমি দামী সিগারেটের প্যাকেট ছাড়া দেখিনি। বুঝতেই পারতাম, ওকে মা'ব কাছে হাত পাততে হয়। গত বছরও ও আমাব সিগারেটে ভাগ বসিযেছে। হঠাৎ কিছুকাল দেখছি, আমার কমদামী, এই ভাজা তামাকেব সিগারেট ওর আর ভালো লাগে না। ওর একটা চাকরি তো নিশ্চয়ই দবকার ছিল। আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ বেকাব ছেলেমেযেব চাকরি দরকাব। তাদেবও আছে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের কার্ড। সে-কার্ড তারা নিয়মিত রিনিউ কবায়। সে-বেকারেব দলে বুবুর বন্ধুরাও আছে। তাদের তো তুমি হৃদয়বাবুব কাছে যেতে বল না ?"

জয়তী যেন জবাব দেবার মতো স্বস্তিদায়ক, মানসিক অবস্থা ফিরে পেতো। "হৃদয় ব্যানার্জির কাছে যেতে না বললেও, আমাদেব ছেলেদের বসিয়ে রাখা হয় না। তাবাও যাতে কাজ পেতে পাবে, সে-চেষ্টা সব সমযেই কবা হয়ে থাকে। তবে, ওদেব কিছুটা কম্পিটিশন ফেস কবতে হয়। কিন্তু তা যাতে না করতে হয়, আমরা সেটাও দেখি।"

"মুন্না, তোমার এ কথাটা আমাব কানে আবো খারাপ ঠেকছে।" সুদীপের চোখে অসহায় অবাক জিজ্ঞাসা, 'আমাদের ছেলে মানে কী ?' পার্টির সিমপ্যাথাইজারস, ক্যাডার্স ?"

জয়তীর চোখে আবার অস্বস্তি দেখা দিতো। কুণ্ঠা থাকতো হাসিতে, "পুরোটাই তা কী কবে হয ? বাইরের বহু বেকার ছেলেকেও আমরা সাহায্য করার চেষ্টা কবি। যে-পরিস্থিতি আর কাঠামোর মধ্যে আমাদের কাজ করতে হয়, সেখানে পার্টির স্বার্থকে তো আমরা ছোট করে দেখতে পারিনে। তোমার তো বোঝা উচিত, পার্টির শক্তিকে বাড়াবার জন্য, আমাদের সবরকম চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। সামনেই বিরাশি সাল আসছে। সেদিকে আমাদের লক্ষ রাখতে

হবে না ?"

"তার জন্যে তো পার্টির নৈতিক দিক আছে।" সুদীপের চোখে সেই অসহায় অনুসন্ধিৎসা, "বামপন্থীদেব—বিশেষ করে কমিউনিস্ট আদর্শের জোব তো দক্ষিণপন্থী বুর্জোয়াদের থেকে অনেক বেশি। সরকারে আসা মানে তো, আমাদের সপক্ষে জনমতকে তৈরি করার বাড়তি সুযোগগুলোকে ব্যবহার কবা। কিন্তু তুমি যা বলছো, তার সঙ্গে আদর্শ বা নৈতিকতা থাকছে ন্যা !"

জয়তীকে যেন বাধ্য হয়েই ওর সমস্ত কুণ্ঠাকে ঝাপটা দিয়ে ঝেড়ে ফেলতে হতো, "ছুবু, তুমি বড় বেশি শুদ্ধতার কথা বলছো। নির্বাচনে জিতে, ক্ষমতা পাওয়ার ব্যাপারটা, কেবলমাত্র তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে যেটুকু পাওয়া যাবে, তা নিয়ে আমাদের চলতে পারে না। তুমি কি জানো, আমরা এবারে ক্ষমতায় আসার আগে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদে ওরা নির্বিচারে হাজার হাজার ছেলেমেয়েদের ঢুকিয়ে দিয়েছে। যাদের ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে, তাদের বেশির ভাগেরই কোনো যোগ্যতা নেই। আর আমাদের অনেক ছেলেকে ওরা মেরে তাড়িয়েছে। দু-চারজন নেতৃস্থানীয় ছেলেকে খুন করতেও ছাড়েনি। কিন্তু আমরা কী করেছি ? আমরা কি ক্ষমতায় এসেই ওদেব সেই হাজাব হাজার ছেলেমেয়েকে তাড়িয়ে দিয়েছি ? দিইনি। আমরা এখন যাদের ঢোকাবার, নিজেদের ছেলেদের ঢোকাচ্ছি। তার মধ্যেও ওদের সঙ্গে আমাদের একটা ফাণ্ডামেন্টাল তফাৎ হল, আমরা যোগ্যতার বিচার করি।"

"মুন্না, কথাটা বিশ্বাসযোগ্য শোনালো না।" সুদীপ কিছুটা অস্থির হয়ে উঠতো, "তুমি যে পদ্ধতিতে শক্তি বাড়াবার কথা বলছো, সেখানে ওদের পক্ষে যেসব গুণের বিচার সম্ভব হয়নি, তোমাদেব ক্ষেত্রেও তা সম্ভব নয়। তুমি শুদ্ধতার কথা বললে। কিন্তু সংসদীয় প্রথায়, নির্বাচনে জিতে ক্ষমতায় আসার মধ্যে, তোমাদের কতগুলো শর্ত পালন করতেই হবে। যদি সত্যি তোমরা শ্রেণী বিপ্লবে বিশ্বাস করো। দেশের মানুষকে স্বাধীনতার পর থেকেই কেবল মিথ্যা স্তোক দিয়ে আসা হচ্ছে। যে-কোনো সৎ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকেই ওরা সেজন্য হারিয়েছে। তোমরাও কিন্তু জনসাধারণের কাছে অনেক ব্যাপারে দায়বদ্ধ। আমাদের ছেলে বলতে, আমি কেবল পার্টি কর্মীদেরই বুঝি। সাধারণ বেকার ছেলেমেয়েদের কাজ দেবার ব্যাপারে, 'ওদের বা আমাদের' বলে কিছু থাকতে পারে না। থাকা উচিত নয়। এতে বিপদের সম্ভাবনাই বেশি। আদর্শকে তুলে ধরাটাই এই সরকারের বড় কাজ, আর তার জয়টাও সেখানেই।"

জয়তী যেন সকৌতুকে হাসতো, "কিন্তু ছুবু জানো, বিদ্যুৎ পর্ষদের কথাই বলছি। ওরা যে হাজার হাজার ছেলেদের ঢুকিয়ে দিয়ে গেছলো, আজ তারা

আমাদেরই সমর্থক হয়ে উঠছে।"

"কাল তোমরা যাদের কাছে হারবে, ওরা তখন তাদেব সমর্থন করবে।" সুদীপ মাথা নেড়ে অসহায়ভাবে হাসতো, "ওবা সব দলেব দুর্বলতাটা বুঝে ফেলেছে, নিজেদের বাঁচার তাগিদে।"

জয়তী ঘাড় কাত করে, ওব আযত কালো চোখের কোণে ভ্রূকুটি দৃষ্টি হানতো, "আমবা হারবো, এরকম ভাবছো কেন ?"

"এসব ক্ষেত্রে, পার্টিগুলো হারে তাদের নৈতিক দুর্বলতা আর দলীয় স্বার্থপরতার জন্য।" সুদীপ বারে বাবেই মাথা নাড়তো। একটা অসহায় বিষণ্ণতা ওর মুখে ছড়িয়ে পড়তো।

জয়তীও মাথা নাড়তো, "ছুবু, তোমার জ্ঞানকে আমি ছোট করে দেখিনে, বরং শ্রদ্ধা করি। কিন্তু তুমি পার্টির কর্মী নও। তাই তোমার সমস্ত দেখা আর বিচারটাই কেবল আদর্শকে ঘিরে। দলীয় স্বার্থ মানে কী ? সে স্বার্থ তো আমরা দেখবোই। পার্টিকে আমবা শক্তিশালী কববো। আর নৈতিকতার কথা বলছো ? অনৈতিক কাজ আমবা কী করেছি ? আমাদের ছেলে বলতে, কেনই বা কেবল পার্টি সমর্থক আর সভ্যদের বোঝাবো ? দেশের সমস্ত ছেলেদেরই যাতে আমাদের ছেলে করে তুলতে পারি, সেটাই আমাদের লক্ষ্য। যেখানেই দেখবো, আমাদের বিরুদ্ধতা করছে, তাদেব আমবা কিছুতেই কোনো সুযোগ দেবো না। তা যদি কারোর চোখে অনৈতিক বলেও মনে হয়, তবুও না। তুমিই বলো না, সাবা ভারতে যারা আজ সবচেয়ে বড় ক্ষমতাশালী দল, তাদের কাছে নৈতিকতার কী দাম আছে ? তারা কি দলীয স্বার্থেব ঊর্ধ্বে ? ববং তারা ক্ষমতার লোভে, যে-কোনো অন্যায় কাজ করতে পারে। যেমন করছে তারা আমাদের সঙ্গে। যতো রকমের প্রতিবন্ধকতা তেরি করা সম্ভব, সবই তারা কবছে আমাদের বিরুদ্ধে।"

"তাদেব যা করবার, তারা তা করবেই।" সুদীপের স্বরে থাকতো হতাশা, "আর তোমাদের যা করবার তোমরা তাই করবে। কিন্তু তোমাদের আর ওদের মধ্যে তফাৎ অনেক। এ রাজ্যের মানুষের কোনো প্রত্যাশা ওদের কাছে নেই বলেই, তোমরা ক্ষমতায় এসেছো। আমি কেবল আদর্শ দিয়ে তোমাদের বিচার করবো কেন ? জনসাধারণ কি অন্ধ মূর্খ নাকি ? তোমাদের একটা আলাদা আদর্শ আছে, যে-আদর্শের সঙ্গে ন্যায়ের প্রশ্ন জড়িত। তোমাদের নির্বাচনী ইস্তাহার আর ওদেরটা কি এক ? সাধারণ মানুষের কাছে তোমাদের ইমেজ আলাদা। দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলদেব সঙ্গে বামপন্থী প্রগতিশীলদের মধ্যে দুস্তর ফারাক। এটা সাধারণ লোকের বিশ্বাস। ওদের অন্যায়ের জবাব কি অন্যায় দিয়ে হবে ?

তোমাদের কাছেই সকলের সমভাবের প্রত্যাশা। পার্টি ক্যাডাররা বিশ্বাস করে, এ সংসদীয় ব্যবস্থা সাময়িক। বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করাই আসল কাজ, কারণ বিপ্লব হবেই। আমি আপাতত যে-আদর্শের কথা বলছি, সেটা হল, তোমরাই একমাত্র প্রমাণ করতে পারো, সংসদীয় গণতন্ত্রের স্বরূপ।" সুদীপ হতাশার মধ্যেও হাসতো, "আর বাংলায় আমার চেয়ে তোমার বেশি দখল থাকারই কথা। দলীয় স্বার্থ আর স্বার্থপরতা কি এক কথা?"

জয়তী হেসে মাথা নাড়লেও, ওর ভিতর থেকে কেমন একটা প্রতিবাদ মাথা তুলে দাঁড়াতো, "না, এক কথা নয়। তবে, তুমি কেন স্বার্থপরতার কথা বলছো, আমি বুঝিনে। তুমি অনেক কথাই বললে। তবু ঐ কথাটা না বলে পারছিনে, তোমার সমস্ত দেখাটাই কেবল আদর্শ দিয়ে। যাই বলো ছুবু, ওটা কিন্তু দূর থেকে দেখা। আমাদের ছেলেদের কথা আমরা ভাববোই। তাদের সুযোগ সুবিধে আমরা দেবোই। যে-সব ছেলেরা বাইরে রয়েছে, তাদেরও আমরা দরকার মতো সুযোগ দিয়ে, আমাদের শিবিরে নিয়ে আসবো। কে বলেছে, সব ন্যায়ের দায়িত্ব কেবল আমাদেরই মাথা পেতে নিতে হবে? আমরা আমাদের সমস্ত রকম স্বার্থে, ক্ষমতাকে ব্যবহার করবো। কিন্তু তার মানে তো এই নয়, আমরা জনগণের স্বার্থ দেখবো না? দেখবো। ওদের থেকে অনেক বেশি দেখবো, তবে নিজের অস্তিত্বটা বাঁচিয়ে। বিসর্জন দিয়ে নয়।"

"এ ধরনের কথা তুমি নিশ্চয়ই বাইরে সকলের সামনে বলবে না?" সুদীপের চোখে জিজ্ঞাসু হাসি থাকতো।

জয়তীও হাসতো মাথা নেড়ে, "না। কিন্তু অন্যভাবে তো বলতেই হবে। জনগণের পার্টিকে জনগণকেই রক্ষা করতে হবে। পার্টি জনগণকে রক্ষা করবে। দরকারে, জানপ্রাণ দিয়েও। আর দলীয় স্বার্থপরতার মানে কী? আমাদের রুক্ষ মাথায় যদি একটু তেল পড়েই, তা হলেই কি আমাদের বিপ্লবীয়ানা অশুদ্ধ হয়ে যাবে?"

"না।" সুদীপের চোখের হাসিতে তখন কৌতুকের ছটা ফুটতো। "এমন কি কিঞ্চিৎ ফুলেল তেলের গন্ধ ছাড়লেও ক্ষতি কী? তবে তোমাদের অস্তিত্বের সঙ্গে বিরুদ্ধ অস্তিত্বের ভেদটা যেন স্পষ্ট থাকে। কিন্তু বুবুর চাকরি পাওয়ার পদ্ধতিটা আমার কাছে একটা অশুভ ইঙ্গিত বলে মনে হচ্ছে। এ ব্যাপারে তুমিই ওকে এগিয়ে দিয়েছো, পরামর্শ দিয়েছো।"

জয়তী ঘাড় ঝাঁকিয়ে হাসতো, "তা দিয়েছি। না দিয়েই বা কী উপায় ছিল বলো? কেউ যদি তার প্রাপ্য পাওয়ানাটাও হাত বাড়িয়ে না নিতে পারে, তাকে কি কমরেড সৌরীন্দ্র ব্যানার্জি ডেকে পরামর্শ দেবেন? না, হৃদয়দার মতো একজন

এত বড ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ওকে ডেকে চাকরি দেবেন ?"

"প্রাপ্য পাওয়ানা ?" সুদীপের দু চোখে ফুটে উঠতো অপরিসীম বিস্ময়। গলার স্বরে থাকতো আচমকা আঘাতের আহত সুর, "কিসের প্রাপ্য পাওয়ানা ? কেন ?"

জয়তীর মুখে নেমে আসতো গাম্ভীর্য, "ছুবু, জানি, আবার তুমি নৈতিকতার সেই একঘেয়ে কথাটাই তুলবে। যখন বললাম, চাকরিটা বুবুর দরকার ছিল, তখন তুমি যোগ্যতার কথা তুলেছিলে। এখন প্রাপ্য পাওয়ানার কথায় তুমি যেন যন্ত্রণায় মরে যাচ্ছো। তাহলে তোমাকে সোজা বলতে হয়, আমাদের হাতে সুযোগ আছে। বুবুকে সেই সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এবার তুমি নিশ্চয় দুর্নীতির কথা বলবে ?"

সুদীপ উদ্বিগ্ন চোখে তাকিয়েছিল জয়তীব আয়ত কালো চোখের দিকে। একটু হাসবার চেষ্টা কবেছিল। মাথা নেড়েছিল আস্তে আস্তে, "না। কথাটা তোমার উপলব্ধির মধ্যে আছে বলেই তো বললে। আমি আর নতুন করে কেন বলবো। প্রথম থেকে একটা ব্যাপার বুঝতে পারছিলাম না। বুবুকে সচেতন করে তোলার দায়িত্ব তোমাকে দেওযা হয়েছিল। কারণ সেটাই ছিল সব থেকে সহজ আর স্বাভাবিক। কিন্তু মুন্না... "

জয়তী জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়েছিল সুদীপের বিষণ্ণ উৎকণ্ঠিত চোখের দিকে। সুদীপের স্বর যেন কোনো এক অতল গহ্বরে ডুবে গিয়েছিল। সুদীপের চোখের বিষণ্ণ উৎকণ্ঠায় একটা করুণ ব্যাকুলতা ফুটে উঠছিল আস্তে আস্তে। জয়তী চোখ নামিয়ে নিয়েছিল। ও উঠে দাঁড়িয়েছিল। ওর গলার স্বর ছিল অস্ফুট, "আমি যাচ্ছি।"

সুদীপ ওর সেই চোখে জয়তীর দিকে তাকিয়ে, নির্বাক ছিল। কিন্তু জয়তী পা বাড়াতে পারেনি। মুখ নিচু করে দাঁড়িয়েছিল। সুদীপ চেষ্টা করেও ওর স্বরের প্রচ্ছন্ন আর্তি গোপন করতে পারেনি, "মুন্না, কোনো ধর্মান্ধ অলৌকিক ভাবনায় তোমাকে আমি দেবীর চোখে দেখিনি। তোমাকে যে আমি শক্তিস্বরূপিণী মনে করি, সে-শক্তি কোনো ঐশী শক্তি নয়। যে-শক্তি সমস্ত অশুভ অন্ধকারকে ছিন্নভিন্ন করতে পারে, তোমার প্রাণের সেই শক্তিকেই আমি ঐ নামে ডেকেছি। তোমার জীবনটাই তার প্রমাণ..."

"ছুবু, তোমার কথা আমি আর শুনতে পারি না।" জয়তীর স্খলিত স্বরে সিক্ততার আভাস ফুটে উঠতো, "আমি যাচ্ছি।"

জয়তী তথাপি যেতে পারতো না। সুদীপ ওর বাধাপ্রাপ্ত কথার জের টানতো, "আর সেই জীবন তুমি কোথায় সঁপে দিতে যাচ্ছো ? তুমি প্রতিবাদ করবে না ?"

"না, করবো না।" জয়তীর মাথা নাড়ানোর মধ্যে কেমন একটা অস্বাভাবিক অস্থিরতা ফুটে উঠতো, "আমি নিজেকে সঁপেছি পার্টির কাছে। আমার আনুগত্যের মধ্যে কোনো প্রশ্ন নেই।"

সুদীপ যেন আতঙ্কে উঠে দাঁড়াতো, "তোমার শক্তিকে তুমি অন্ধ আনুগত্য দিয়ে ঘিরে রাখবে? তাকে সর্বব্যাপী হতে দেবে না?"

"না, পার্টির বাইরে আমার কোনো আনুগত্য নেই। আমার শুভাশুভ, সব উৎসর্গ করেছি সেখানে। কেবল—" জয়তীর স্বর রুদ্ধ হয়ে আসতো। ও দ্রুত পা বাড়াতো, আর রুদ্ধস্বর যেন বাতাসে ফিসফিস করে ভাসতো, "কেবল তুমি আমার যেখানটায় দাঁড়িযে আছো, সেখানটা শূন্য হবাব কথা ভাবতে ভয় পাই।"

সুদীপ তবু সেই ঊনাশিতেও বিশ্বাস করতো, জয়তীর শক্তি কখনও কোনো অশুভ আনুগত্যে বন্দী থাকবে না। বুবুর চাকরির ঘটনাও একটি ঝরে পড়া পালকের মতো। পার্টির সৎ সত্যনিষ্ঠ আদর্শ শরীরে কোথাও ক্ষতের সৃষ্টি হয়নি। পচ ধরেনি। বিচ্যুতি ঘটেনি। পার্টি বড় হতে থাকলে, সংসদীয় প্রথায় নির্বাচনের দ্বারা সাময়িক সরকার গঠন করলে, ছোট খাটো কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটতে পারে। কিন্তু পার্টি নেতৃত্ব তা কঠোর হাতে দমন করবে। ওর বাবার মতো মানুষ যে পার্টির নেতা, সেখানে বুর্জোয়া দক্ষিণপন্থী পার্টিগুলোর স্খলন পতনের মতো কিছু ঘটতে পারে না। তবু ও সীতানাথ জেঠুর কাছে গিয়েছিল। পার্টির সরকার গঠনের সঙ্গে সঙ্গেই সীতানাথ মজুমদারও ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। একজন বিশিষ্ট নেতা হিসাবে তাঁকে সংগঠনের বিশেষ দায়িত্ব নিতে হয়েছিল। তাঁকে যেমন জেলাস্তরে ঘুরে ঘুরে জি বি মিটিং করতে হতো, জেলা কমিটিগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ বেখে নানা সমস্যার সমাধান করতে হতো, তেমনি ফ্রাই কমিটির মধ্যেও তাঁর ভূমিকা ছিল অনেকখানি। ফলে তিনি আগে যেমন প্রায়ই সুদীপদের বাড়ি আসতেন, সাতাত্তরের পর সেটা কমতে কমতে দু' বছরের মধ্যে একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

সুদীপ হেসে ঠাট্টা করতো, "সীতানাথ জেঠু, পার্টি সরকার গড়লে কি সবাইকেই ব্যস্ত হয়ে পড়তে হয় নাকি?"

"তাই তো হয়, দেখতে পাচ্ছিসনে?" সীতানাথও সুদীপকে তুই সম্বোধন করেন। সুদীপের কথায় হাসতেন, "সরকার করা মানেই দায়িত্ব বেড়ে যাওয়া। এটা হচ্ছে পপুলারিটির দায়। তোর বাবাকে দেখছিস তো, কী রকম মাঝে মাঝেই দিল্লি ছুটতে হয়। সরকার গড়ার বড় দায়, বুঝলি?"

সুদীপ পার্টির প্রধান দফতরে টেলিফোন করেছিল। সীতানাথের কাছে জেনে নিয়েছিল, কখন গেলে একটু কথা বলা যেতে পারে। আগে থেকে না জানিয়ে

গেলে দেখা না হতেও পারতো। সুদীপ গিয়েছিল সময় মতোই। সীতানাথ জেঠুর আলাদা ঘব ছিল পার্টি অফিসে। যদিও তাঁর বাসস্থান ছিল অন্যত্র। চিরকুমাব, বাবার থেকে কয়েক বছরের বড়, সীতানাথ মজুমদার মানুষটির আত্মীয়স্বজন বলতে কলকাতায় তেমন কেউ ছিলেন না। জন্ম অখণ্ড বাঙলার ঢাকা জেলায়। কলেজের শিক্ষা পর্যন্ত ছিলেন ঢাকায়। তার মধ্যেই রাজনৈতিক কারণে কাবাবাস করেছেন। কলকাতায় এসে এম এ পাশ করার পরেই রাজনীতিব টানে ভেসে গিয়েছিলেন। বাবাব মতোই তাঁরও কমিউনিস্ট মতবাদে দীক্ষা হয়েছিল।

সীতানাথ সৌবীন্দ্রর থেকে বয়সে কয়েক বছরের বড় হলেও, তাঁকে দেখে তা বোঝা যায় না। এখনও তিনি রীতিমতো স্বাস্থ্যবান, ঋজু, কর্মঠ পুরুষ। পুরানো স্বদেশী যুগেব বাজনীতিকরা অধিকাংশই নিয়মিত ব্যায়াম করতেন। ছোলা আর আখের গুড়ের সরবত ছিল সকালের অবশ্য খাদ্য ও পানীয়। সুদীপ দেখেছে, সীতানাথ জেঠু এ বযসেও কিছু ব্যায়াম আর আসন করেন। এখনও ছোলা আর আখেব গুড়ের সববত খান। জীবনযাপন অতি সাদাসিধা। কমিউনিস্ট হলেও, এখনও পর্যন্ত খদ্দরের খাটো ধুতি আর লম্বা পাঞ্জাবি ব্যবহাব করেন। পার্টির এক ধনাঢ্য সমর্থক তাঁকে একটি ঘড়ি উপহার দিয়েছিলেন। সুদীপকে যে-বিষযটি সব থেকে অবাক করেছে, মাথা নত হয়ে পড়েছে গভীর শ্রদ্ধায়, তা হল, সীতানাথ জেঠু এখনও স্বপাকে রান্না করে খান। তিনি নিরামিষাশী নন। কিন্তু বেশির ভাগ দিনই নিরামিষ বান্না করে খান। তবে প্রায়ই তাঁকে কমরেডদের বাড়িতে জোর করেই খাওযানো হয়। যেমন সুদীপদের বাড়িতে। তিনি যেদিনই রাত্রে আসেন, মা তাঁকে না খাইয়ে ছাড়েন না। এমন অনেক পার্টির সভ্য বা সমর্থকের পরিবার আছে, যাঁদেব বাড়ি থেকে প্রায়ই তাঁকে রান্না করা মাছ বা মাংস পাঠানো হয়। তিনি যে-বাড়ির তিন তলার এক টেরের একটি ঘরে থাকেন, সেই বাড়ির অধিবাসীরা কেউ পার্টি সমর্থক নয়। অথচ সীতানাথ মজুমদারের প্রতি তাদের আছে একটি বিশেষ শ্রদ্ধা। সীতানাথ জেঠুর কোনো কাজের লোক নেই। সুদীপ অনেক দিনই দেখেছে, তাঁর এঁটো বাসনপত্র ধোয়া থেকে, ঘর ঝাঁটপাট দিয়ে পরিষ্কার করছে ঐ বাড়িরই কোনো মেয়ে বা বউ। তাঁর যথেষ্ট আপত্তিটাকে কেউই আমল দেয় না। অথচ সীতানাথ জেঠু যে কোনো কাজেই অক্ষম নন, তাও সকলের জানা।

পার্টি এখন সরকাব নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। সরকার না থাকা কালেও, সুদীপ দেখেছে, পার্টির সর্বক্ষণের কর্মীনেতা সীতানাথ মজুমদার পার্টির কাজে, প্রায়ই কলকাতা, কলকাতার বাইরে যেতেন। বিভিন্ন ইস্যুকে কেন্দ্র করে সভায়

বক্তৃতা করতেন। আর তাঁর পড়াশোনা একটা বড় ব্যাপার। এবং তাঁর পড়াশোনার বিষয়বস্তু কোনো কঠোর নিয়মের নিগড়ে বাঁধা নেই। মার্কসীয় তত্ত্ব থেকে ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, বিজ্ঞান, সাহিত্য, সবই তিনি পড়েন। তার থেকে শিশু সাহিত্য যেমন বাদ পড়ে না, তেমনি তাঁকে একদিন একটি নাম করা ইংরেজি গোয়েন্দা উপন্যাস পাঠ করতে দেখে, সুদীপ অবাক হয়েছিল, "আপনি গোয়েন্দা উপন্যাস পড়ছেন ?"

"আর বলিস কেন !" সীতানাথ তাঁর নিটুট শক্ত দাঁতে হেসেছিলেন, "এ বুড়ো বয়সে চরিত্রটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। কোথা থেকে যে এসব বুর্জোয়া অভ্যাস এসে পাকড়াচ্ছে, বুঝতে পারি না ! সব থেকে আশ্চর্য কাণ্ড হল, পড়তে বেশ ভালো লাগে। কিন্তু এ নেশাটা ভালো নয়। সময়কে একেবারে এমন খাবলে খাবলে খেয়ে নেয়, টেরই পাওয়া যায় না !"

সুদীপ জানে, সীতানাথ জেঠু গোয়েন্দা উপন্যাসের নিয়মিত পাঠক কোনো কালেই ছিলেন না। আর যে কোনো বই নিয়ে বসলেই, তাঁর সময় খাবলে খাবলে, নিঃসাড়ে খেয়ে নেয়। তবু ও ঠাট্টাচ্ছলেই হেসেছিল। "গোয়েন্দা উপন্যাস কি কেবল বুর্জোয়ারাই পড়ে নাকি ?"

"তা নয় তো কী ?" সীতানাথ জেঠু বেশ গম্ভীর হয়ে উঠেছিলেন। "ও সব ছাইপাঁশ পড়ে সময় নষ্ট করে এক মাত্র বুর্জোয়ারাই। তোর বাবাকে কখনো এসব পড়তে দেখেছিস ?"

সুদীপ ঘাড় নেড়েছিল। "না। আমি দু'চারখানা বই কখনো কখনো পড়েছি। বাবা দেখতে পেয়ে বলেছেন, কী সব আজেবাজে বই পড়ে সময় নষ্ট করিস। যত্তো সব গাঁজা আর গুলি।"

"তবে ?" সীতানাথ জেঠু ঘাড় ঝাঁকিয়ে হেসেছিলেন। "তা হলেই বুঝতে পারছিস। এ সব হল এক রকমের নেশা। খুব খারাপ নেশা। আমি পাঁড় নেশাখোর নই বটে, কিছুটা আছি। যেমন ধর, শার্লক হোমস্ লোকটাকে বেশ ভালো লাগে। এইজ. জি ওয়েলস্-এর সাইন্স ফ্যান্টাসি দারুণ এনজয় করি। এডগার এ্যালেন পো-এরও আমি ভক্ত। কিন্তু এ সব পড়ে, পার্টির কোন্ উপকারটা হয় ? আর পার্টির উপকারেই যদি না লাগে, তা হলে ওসব বই ছাই-পাঁশ ছাড়া আর কিছু নয়।"

সুদীপ আগে বুঝে উঠতে পারতো না, সীতানাথ জেঠুর কথার মধ্যে কোনো রহস্য থাকতো কি না। এখন বুঝতে পারে, তাঁর কথার মধ্যে থাকতো একটি সূক্ষ্ম বিদ্রূপ-রস। একদিকে তাঁর যেমন মার্কসীয় তত্ত্বজ্ঞানে যথেষ্ট দখল ছিল, তেমনি আরও বহু বিষয়েই তাঁর ছিল আগ্রহ আর কৌতূহল। ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব,

নৃতত্ত্ব, বিজ্ঞান ইত্যাদি ছাড়াও তাঁকে আধুনিক গল্প উপন্যাস কবিতার বইও পড়তে দেখা যায়। মন্তব্য করতেও দ্বিধা করেন না। এবং বিশিষ্ট বয়স্ক পার্টি নেতাদের মধ্যে একমাত্র তিনিই, অখণ্ড পার্টির মার্কসিস্ট বুদ্ধিজীবীদের মতো, মাঝে মাঝে সাহিত্যের ওপরে লিখেও থাকেন। নীরেন রায়, অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র, গোপাল হালদার, সোমনাথ লাহিড়ী, হীরেন মুখার্জি বা চিন্মোহন সেহনবীশের মতো ব্যক্তিদের নাম তাঁর মুখেই শোনা যায়। ভাষাবিদ্ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায়, এঁরা সকলেই তাঁর পাঠ্য আর আলোচ্য তালিকায় থাকেন। রবীন্দ্রনাথ কেবল নয়, তাঁর পরের অনেক কবি সাহিত্যিকের রচনাও তাঁর পাঠ্যতালিকা থেকে বাদ যায় না। এবং কে তাঁর মতে প্রতিক্রিয়াশীল, প্রগতিশীল, তা কঠোর ও বক্র তীক্ষ্ণ ভাষায় প্রকাশ করতে দ্বিধা করেন না।

সুদীপ যেমন তাঁকে গোয়েন্দা উপন্যাস পড়তে দেখে অবাক হয়েছিল, তেমনি অধিকতর অবাক ও সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছিল যখন দেখেছিল তিনি শ্রীম লিখিত কথামৃত পড়ছেন। ব্যাপারটা ছিল এমনই অভাবিত, ও মুখ ফুটে কিছু জিজ্ঞেস পর্যন্ত করতে পারেনি। এর আগে বিবেকানন্দের রচনা পাঠ করতে দেখেছে। বিস্ময়ের ধাক্কাটা তখন তেমন জোরে লাগেনি। ওর সেই হতবাক্ সন্দিগ্ধ মুখের দিকে তাকিয়ে সীতানাথ জেঠু হেসেছিলেন, "ঘাবড়ে গেলি, না ক্ষেপে গেলি ? কোনটা ?"

"দুই-ই।" সুদীপ হাসতে পারেনি।

সীতানাথ তাঁর তক্তপোষের ওপর জোড়াসনে বসেছিলেন। সুদীপের হাত টেনে ধরে পাশে বসিয়ে, অনেকটা ভণ্ড তপস্বীদের মতো চোখ আধ বোজা করে হেসেছিলেন। "সৌবীন তোকে লেনিনের শিক্ষাটা কেমন দিয়েছে, বুঝে উঠতে পারছি না। এসব তো লেনিনের পাঠক্রমের মধ্যেই পড়ে।"

"শ্রীম'র কথামৃত ?" সুদীপের অবাক স্বরে ছিল অবিশ্বাসের সুর।

সীতানাথ সেই একই ভঙ্গিতে হেসেছিলেন, "হ্যাঁরে। এসবের নেশায় যারা বুঁদ হয়ে আছে, এসব না পড়লে নেশার মর্মটা বুঝবি কেমন করে ? আর মর্মটাই যদি বুঝতে না পারিস, তবে নেশাটাই বা ছাড়বি কেমন করে ? যদি তুই মনে করিস, শ্রীম'র কথামৃত সাধারণ মানুষের পক্ষে আফিম, তা হলে কারণটা ব্যাখ্যা করবি না ? ব্যাখ্যা করতে হলে তো পড়তে হবে।"

"বাবা তো আমাকে সে-ভাবে কিছু বলেননি ?" সুদীপ সীতানাথকে বুঝতে চেয়েছিল, "তবে লেনিনের কথাতেই পেয়েছি, বুর্জোয়াদের দর্শন সাহিত্য আর মতবাদ বিষয়ে খুব ভালো অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। আর তা অবশ্য পাঠ্য।

নইলে…”

সীতানাথ হাত তুলে সুদীপকে থামিয়ে দিয়েছিলেন, “জানিস তো দেখছি। তবে আমাকে কথামৃত পড়তে দেখে অমন ব্যোম্‌কে গেলি কেন ?” পরমুহূর্তেই তাঁর দু'চোখ একটা প্রত্যয়ের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। “কিন্তু ছুবু, তোকে একটা কথা বলি। রামকৃষ্ণের মতো গুরু ছিলেন বলেই, বিবেকানন্দর মতো শিষ্যের আবির্ভাব হয়েছিল। এই আবির্ভাবের শব্দটার মধ্যে কোনো অধ্যাত্মের গন্ধ খুঁজতে যাস না। আর কথামৃতটা নিতান্তই আফিম নয়। ঈশ্বর-বিশ্বাসী রবীন্দ্রনাথের কাছে যেমন আমাদের মন-প্রাণকে পরিচ্ছন্ন করার জন্য কিছু পাওয়ানা আছে, তেমনি রামকৃষ্ণের কাছ থেকেও আছে। একটি মানুষ, আমাদের ভাষায় অশিক্ষিত। লেখাপড়া কিছুই শেখেননি। অথচ এমন সব কথা বলে গেছেন, যার মধ্যে আছে সত্যিকারের বাস্তববোধ, জ্ঞান আর সততা। তিনি তাঁর ধর্ম নিয়ে জনসাধারণকে একসপ্লয়েট করেননি। ওসব ধারণা তাঁর ছিল না। তাঁকে নিয়ে অন্যরা ব্যবসা করতে পারে। তবে রামকৃষ্ণর সব কিছুই আমি গ্রাহ্য করবো, তাও নয়। আমি তাঁর অলৌকিক অতীন্দ্রিয়তাবাদের মধ্যে নেই। মানুষ তার বিশ্বাসের জোরে, কতো আশ্চর্য বাস্তব জ্ঞানের পরিচয় দিতে পারে, রামকৃষ্ণের অনেক কথার মধ্যেই তার প্রমাণ। এখানে আমরাও পরমহংস, বুঝলি তো ?”

“না।” সুদীপ ওর সমস্ত সারল্য দিয়ে ঘাড় নেড়েছিল, “পরমহংস-টংস কাকে বলে, আমি একদম জানিনে।”

সীতানাথ ঘাড় ঝাঁকিয়ে হেসেছিলেন। “ঐ তো মুশকিল ! এসব জেনে রাখা দরকার। এমন কি, যদি এসব ব্যাপারকে ধর্মীয় বুজরুকি বলেও মনে হয়, তবু জেনে রাখা ভালো। পরমহংস হলেন তিনি, যিনি দুধের পাত্র থেকে, দুধটুকু খেয়ে, জলটা ফেলে দেন। আসল কথা, হাঁসের দুধ খাওয়ার মতো। রামকৃষ্ণের কাছ থেকে আমার যেটুকু নেবার, সেটুকুই নেবো। তারপরে জল নিয়ে যারা কীর্তন করবে, আর ব্যবসা ফাঁদবে, তাদের মুখোশ খোলার দায়টাও বহন করবো। এখন বুঝলি তো, কেন কথামৃত পড়ছি ?”

“কিছুটা।” সুদীপ ঘাড় ঝাঁকিয়ে হেসেছিল।

সীতানাথ ঘাড় বাঁকিয়ে তাকিয়ে হেসেছিলেন, “পুরোটা বুঝতেই বা অসুবিধে কোথায় ? সব ঘাঁটবি। ঘাঁটলেই দেখবি বিস্তর পচা-পাত্‌কো মালও যেমন বেরিয়ে আসছে, তেমনি খাঁটি বস্তুর সন্ধানও পেয়ে যেতে পারিস। আর যাই হোস্ বাবা, কোনো ব্যাপারেই রক্ষণশীল আর গোঁড়া হোস না। তাতে তুই-ই ঠকবি। আমি জানি, তোর গুরু, মানে, সৌরীনের মধ্যে একটা গোঁড়ামি আছে।

তা নিয়ে ওর সঙ্গে আমার কিছু কথাও হয়েছে। তোর গুরুর আসল ভয়টা কী, তা জানিস ?"

"ভয় ?" সুদীপের চোখে ভ্রূকুটি জিজ্ঞাসা জেগে উঠেছিল, "বাবার মধ্যে তো আমি কোনো ভয়ের চিহ্ন আজ পর্যন্ত দেখতে পাইনি ?"

সীতানাথ হেসে ঘাড় নেড়েছিলেন, "সে-ভয়ের কথা বলছি না। সৌরীনকে মানুষ হিসেবেই বল, আর একজন কমিউনিস্ট হিসেবেই বল, এখনো পর্যন্ত ওর কোনো ভীরুতা আমি দেখিনি। কিন্তু যে-কারণে ও গোঁড়া, সেই কারণেই ও ভীতু। ও যে মার্কসবাদ শিক্ষার জন্য, তোর চোখ আর মনকে কোথাও ছড়াতে দিতে চায় না, একেবারে কুলুপ এঁটে রাখতে চায়, সেটাই হল গোঁড়ামি আর ভয়। তুই নিজেই তো লেনিনের শিক্ষার কথা বলছিলি। আমি চাই, তোর চার পাশের দরজা খুলে দেওয়া হোক। যেমন তুই একটা এঞ্জিনিয়ারিং ফার্মে এঞ্জিনিয়ারের কাজ করছিস, তাতে কি তোর নতুন নতুন অভিজ্ঞতা ঘটছে না ?"

"ঘটছে তো।" সুদীপ ঘাড় কাত করে অনিবার্য সত্যটাকে প্রকাশ করেছিল। "সেই অভিজ্ঞতার মধ্যে, আমি মার্কস্ এঙ্গেলস্ লেনিনের তত্ত্বকে মিলিয়ে নেবার চেষ্টা করি।"

সীতানাথ হেসে, খুব উৎসাহের সঙ্গে শূন্যে হাত ছুঁড়ে দিয়েছিলেন, "তার মানে, তুই একেবারে আসল জায়গায় বসে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছিস। ট্রেড ইউনিয়নের আন্দোলনের গতিবিধি বোঝবারও চেষ্টা করিস ?"

"তাও করি।" সুদীপের কথার মধ্যে কিঞ্চিৎ দ্বিধা প্রকাশ পেয়েছিল। "কিন্তু সব সময় আমি আন্দোলনের ব্যাপারগুলো বুঝে উঠতে পারিনে। যেমন দক্ষিণপন্থী, তেমনি বামপন্থী নেতাদের ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কে ধারণাগুলো কেমন যেন ভাসা ভাসা মনে হয়। শ্রমিকদের নেতৃত্বে কিছুই ঘটে না। নেতা তৈরি হবার মতো পরিবেশও নেই। দলাদলি আর গালাগালি, মারামারি আর খুনোখুনি যেন দিন দিন বাড়ছে। বাবা বলেন, সেটাই স্বাভাবিক"।

সীতানাথ ঘাড় ঝাঁকিয়েছিলেন। তাঁর স্বরে ছিল দৃঢ়তা, "এটা তোর বাবা ঠিকই বলেছে। এটা বাড়তেই থাকবে। ট্রেড ইউনিয়ন থেকে আমরা দলীয় রাজনীতিকে সরিয়ে রাখতে পারি না। আসলে, এখন ইউনিয়ন করাটা দাঁড়িয়েছে, কারখানাগুলোতে নিজেদের দখল কায়েম রাখা। তার জন্যেই মারামারি খুনোখুনিটা অপরিহার্য হয়ে পড়ছে। কিন্তু এর পরিণামটা ভালো নয়। কারখানার মালিক ইউনিয়নগুলোর মধ্যে সংঘর্ষই চায়। তাতে তাদের সুবিধা। অথচ আমাদের কোনো দলের পক্ষেই হাত গুটিয়ে বসে থাকবার উপায় নেই। সেই জন্যই, আজকাল ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের রাজনৈতিক ধারণা খুব ধারালো

হওয়া উচিত। তা নেই বলেই, তোর কাছে নেতাদের কথাবার্তা ভাসা ভাসা লাগে। আর এই একই কারণে, তুই কোনো শ্রমিককে নেতা হয়ে উঠতে দেখিস না। পার্টির পক্ষেও এটা বিপদের কথা।'

"আমি আপনার বা বাবার কথার প্রতিবাদ করতে চাইনে।" সুদীপের ভ্রূকুটি কপালে কয়েকটি রেখা ফুটে উঠেছিল, "আপনারা বলছেন, মালিক ইউনিয়নগুলোর সংঘর্ষ চায়, তাদের স্বার্থের জন্য। কিন্তু আসলে ক্ষতি হচ্ছে শ্রমিকদের। এই ধরনের সংঘর্ষে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। শ্রমিকরা কাজের বদলে দলাদলির দিকেই নজর রাখছে বেশি। তাদের রুজির স্বার্থটাই বড় হয়ে উঠছে। এর ফলে তো কারখানার গেটে তালা পড়বে।"

সীতানাথ সুদীপের গলা জড়িয়ে ধরেছিলেন, "এই হল আসল অভিজ্ঞতার কথা। সেই জন্যই বলছিলাম, এই মারামারি খুনোখুনির পরিণামটা ভালো নয়। অথচ নিজেদের দখল কায়েম রাখার জন্য, আমাদের পেছিয়ে আসাও সম্ভব নয়। এর সংকটের মূলটাও তুই ধরেছিস, শ্রমিকদের ভেতর থেকেই নেতার জন্ম হওয়া উচিত। এক সময়ে এটাই ছিল আমাদের প্রধান লক্ষ্য, আর তার ফলও কিছু পাওয়া গেছলো। এখন অবস্থা পালটে যাচ্ছে। আমরা যতো বেশি সংসদীয় রাজনীতির দিকে ঝুঁকে পড়ছি, অবস্থাটা ততোই বেশি পাল্‌টাচ্ছে। কিন্তু কতোটা পাল্‌টাতে দেওয়া যায়? সেটাও আমাদের ভাবতে হবে। তোর ভাবনা-চিন্তাগুলো নিয়ে আমাদেরও ভাবা উচিত। তবে মার খেয়ে পেছিয়ে আসতে পারবো না।"

"সেজন্যই, আপনাদেরই বেশি করে বোধহয় শ্রমিকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়া দরকার।" সুদীপের চোখে শ্রদ্ধা ও জিজ্ঞাসা ছিল।

সীতানাথ সুদীপের কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে হেসেছিলেন, "ঠিক বলেছিস। এটা তো মূল কথা। সৌরীন তোকে শিক্ষাটা যা দিয়েছে, সেটার বিকাশ ঘটেছে কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে। গোঁড়ামি কাটিয়ে, সেই জন্যই আমি তোর ঘরের চার পাশটা খুলে দিতে বলছি। শুচিবায়ুগ্রস্তের মতো ময়লা আবর্জনাকে ভয় পেলে চলবে কেন? তোর গুরুকে বলিস, বহুর মধ্যে না ছড়ালে আত্মদর্শন ঘটে না।"

সুদীপ সীতানাথ জেঠুর কথা বাবাকে বলেছিল। ফলে তর্ক লেগেছিল দুই কমরেডের মধ্যে। বাবার বক্তব্য ছিল, মার্কসবাদ স্বয়ং এমন একটি সর্বাঙ্গীণ তত্ত্ব, আত্মদর্শন তাতেই ঘটে। সেক্ষেত্রে সীতানাথ জেঠুর বক্তব্য ছিল, স্বয়ং মার্কসকেও তাঁর সময়ের তত্ত্বের নামে যে-সব আবর্জনা ছিল, তাও ঘাঁটতে হয়েছিল, অনেক বিতর্কে নামতে হয়েছিল, আর তার মধ্যে থেকেই তাঁর নিজস্ব

দর্শনই বলো আর আত্মদর্শনই বলো, সবই ঘটেছিল। সুদীপ তখন বুঝতে পারেনি, ওর অবচেতনে এক নতুন গুরুর আবির্ভাব ঘটছিল। সেই কারণেই, জয়তীর সঙ্গে কথা বলার পর, বুবুর চাকরিব বিষয়ে আলোচনাব জন্য, ও গিয়েছিল সীতানাথ জেঠুর কাছে।

সুদীপের মুখ থেকে সব কথা শুনে, সীতানাথ ঠোঁট টিপে হেসেছিলেন, "কথাটা তুই সৌরীনকে বলিসনি কেন ?"

"আমার জীবনে, এমন ঘটনা এই প্রথম।" সুদীপও অস্বস্তিতে হেসেছিল, "বোধহয় বাবারও প্রথম। বুবুর চাকরির কথাটা তিনি জানতেন, অথচ আমাকে একবারও বলেননি। আমিও তাঁকে কিছু জিজ্ঞেস করিনি। ভাবলাম, আপনার মতামতটা শুনি।"

সীতানাথ আগে থেকেই কিছু একটা লিখছিলেন। সুদীপের কথার সময়ে তাঁর দৃষ্টি ছিল কাগজের দিকে। চোখ তুলে তাকিয়ে আগের মতোই হেসেছিলেন, "কথা শুনে মনে হচ্ছে, ব্যাপারটাকে তুই কিছুতেই মেনে নিতে পারছিস না।"

"আপনি কি বলেন, মেনে নেবার মতো কাজটা হয়েছে ?" সুদীপের চোখে ছিল তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসু জিজ্ঞাসা।

সীতানাথ যেন খুব সহজেই সমস্ত ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন, "মেনে না নেবার মতো, এত মূল্য দেবারই বা কী আছে ?"

"মূল্য দেবার মতো ঘটনা এটা নয় ?"

"না-ই বা দিলি। রাজ্য শাসনের মতো বিরাট দায়িত্ব যেখানে রয়েছে, সেখানে এটা তো একটা তুচ্ছ ব্যাপার।"

"আপনি তাই বলছেন ? এটা একটা তুচ্ছ ব্যাপার ?"

"তুচ্ছ ছাড়া কী ? এমন তুচ্ছ ব্যাপার তো ঘটছেই। বুবুর ব্যাপারটা তো একমাত্র ঘটনা নয়।"

"তার মানে—আমি ঠিক বুঝতে পারছিনে সীতানাথ জেঠু। এরকম ঘটনা আরো ঘটেছে ?"

"হ্যাঁ, ঘটেছে। ঘটছে। শুনছি, দেখছি।"

"অথচ আপনার কিছুই মনে হচ্ছে না ?"

"কী মনে হবে ? সুযোগ যখন রয়েছে, তার সদব্যবহার করাই তো উচিত।"

সুদীপ হতবাক্ বিস্ময়ে, সন্দিগ্ধ তীক্ষ্ণ চোখে সীতানাথের বুদ্ধিদীপ্ত চোখের দিকে তাকিয়েছিল। ওর মনে ছিল গভীর সংশয়। ও যেন সীতানাথকে বুঝে উঠতে পারছিল না। কারণ, তাঁর কাছ থেকে ওরকম কথা একেবারেই ছিল অপ্রত্যাশিত। ও ঝেঁজে প্রতিবাদ করেছিল, "সীতানাথ জেঠু, এখানে আপনি

সুযোগটা দেখলেন কোথায় ? সুযোগ ছিল না। করে নেওয়া হয়েছে।"

"তা বেশ তো। সুযোগ করে নেবার মতো উপায় যখন রয়েছে, সেটাকে কাজে লাগিয়েছে।"

সুদীপ অবাক জিজ্ঞাসু চোখে, সীতানাথের চোখের দিকে তাকিয়েছিল। তিনিও ওর চোখের দিকে তাকিয়েছিলেন। কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে কেটেছিল। সীতানাথ সশব্দে হেসেছিলেন, "তুই এত কঠোর হচ্ছিস কেন ? চিরকাল একটা দলই সব চেটেপুটে খেয়ে যাবে, আর বাকিরা তাই দেখে বুড়ো আঙুল চুষে যাবে, সেটাই বা মেনে নেওয়া হবে কেন ?"

"তারই প্রতিবাদে আপনারা নির্বাচনে জিতে, সরকার গঠন করেছেন। ওরা যা করবে, আপনারাও তাই করবেন ? এটা তো অসততা। দুর্নীতি।"

"হ্যাঁ, তা ঠিক। অসততা, দুর্নীতি। তা আমরাই বা কী করি বল ? বেচারি মানুষ আমরা, হাতে ক্ষমতা আছে। সুযোগও পাচ্ছি। ঘরের বেকার ছেলে-মেয়েগুলোর আখের দেখবো না ?"

সুদীপ আবার হতবাক্ বিস্মিত সন্দিগ্ধ চোখে সীতানাথের চোখের দিকে তাকিয়েছিল। তিনি মুখ নিচু করে ঠোঁট টিপে হাসছিলেন। সুদীপ কিছু বলবার আগেই, তিনি মুখ তুলে ওর দিকে তাকিয়েছিলেন, "এই দ্যাখ না, আমরা এখন অনেকগুলো জেলায় বন্যাপীড়িত অঞ্চল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। এ যাবৎ একটি জেলার খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান আর নগদ টাকার একটা খতিয়ান, মহাকরণ থেকে আমিই চেয়ে পাঠিয়েছিলাম। তাও এ হিসাবটা পুরো নয়। গ্রামে গ্রামে, যা কিছু বিলি-ব্যবস্থা, ত্রাণের কাজ, বেশির ভাগ আমাদের লোকেরাই করেছে। দক্ষিণপন্থী বুর্জোয়া সরকার এতকাল গ্রামের নিজেদের লোকদেরও ঠকিয়ে এসেছে। নেহাত ওদের পুরনো দল, আর কিছু পুরনো নেতাদের নাম ভাঙিয়ে গ্রামে জিতে এসেছে। এখন তাও হাতছাড়া হচ্ছে। আমরা আমাদের লোকদের ঠকাইনি। তাদের হাতে প্রচুর খয়রাতির জিনিসপত্র, খাবার, নগদ টাকা তুলে দিয়েছি। বেচারিদের কী দোষ, যদি তারা লোভ সামলাতে না পারে ? এমন সুযোগ তারা কোনো দিন পায়নি। এমন ক্ষমতাও ছিল না। অতীতের দুটো যুক্ত ফ্রন্ট ? ও কিছু নয়, সামান্য হাত পাকাতে না পাকাতেই, সব খতম। তাও সে-যুক্ত ফ্রন্ট ছিল একটা জগাখিচুড়ি। যাই হোক, গ্রামে আমাদের লোকদের আমরা কোনো দিন পার্টির আদর্শ বা শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে পারিনি। পারলেও কী হতো ? আমরা তো ভাবছি—আর জানিও, গ্রামে আমাদের ঘাঁটি শক্ত করছি। কিন্তু আসলে কী করছি ?"

তিনি ঘাড় কাত করে সুদীপের দিকে তাকিয়েছিলেন।

"বুঝতে পারছিনে।" সুদীপ সীতানাথের মুখের দিকে তাকিয়ে ঘাড় নেড়েছিল।

সীতানাথ আস্তে আস্তে মাথা ঝাঁকিয়ে, টেবিলের কাগজে ক্রস চিহ্ন এঁকেছিলেন, "দক্ষিণপন্থী বুর্জোয়ারা গ্রামের প্রাপ্য সব নিজেরা লুটেপুটে খেয়েছে। আমরা দিয়ে, ওদেব কোরাপ্ট করছি। মনে রাখতে হবে, রাজ্যে এটা একটা নতুন ঘটনা, কাবণ ঘটনাটা ঘটছে আমাদের আমলে। আমি ওদের বেচারি বলা ছাড়া আর কী বলতে পাবি ? যেখানে আমাদের নড়বড়ে গোছেরও তেমন সংগঠন নেই, অপারেশন বর্গা যেখানে একমাত্র স্লোগান, অথচ নিজেরাই জানি না, ব্যাপারটা কতোখানি সার্থক হবে, সেখানে হঠাৎ স্রোতের-মতো-নামা মালপত্র খাদ্য জ্বালানি নগদ টাকা গিয়ে পড়লে, খতিয়ানের চেহারা এরকমই হবে। আর ভবিষ্যতে সমালোচনা থেকে আত্মরক্ষার জন্য, বেছে বেছে কিছু লোককে পার্টি থেকে বিতাড়িত করবো। সে তুলনায়, বুবুর চাকরি পাবার মতো ঘটনা নিয়ে, ভেবে কী লাভ ? তাও বুবু বলে কথা, যার বাবা হলেন সৌরীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। আমাদেব দেশে সংসদীয় রাজনীতির পথটা বড় পেছল। একেবারে গড়িয়ে না পড়লেও, টলে যাওয়াটা তেমন আশ্চর্যের কিছু না। তবে আমি আশাবাদী। তোকেও বলি, বুবুর চাকরি পাবার মতো ঘটনাগুলোকে খুব বড় করে দেখতে গেলে, একটু অবিচার হয়ে যাবে। বরং আরোও খারাপ কিছু না ঘটলেই আমি স্বস্তি পাবো।"

সুদীপ লক্ষ করেছিল, সীতানাথ জেঠুর মুখে আদৌ কোনো স্বস্তির আভাস ছিল না। বরং তাঁর মুখে ছিল একটা অন্যমনস্কতা এবং উদ্বেগের ছায়া। আসলে, বুবুর চাকরির বিষয়টি নিয়ে তিনি প্রথমে তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন, বিদ্রূপ করেই। কারণ, ঐ জাতীয় স্বজনপোষণেব থেকেও নীতি-বিগর্হিত কাজ আরও ঘটছিল। অথচ সুদীপ বুবুর চাকরি পাওয়ার পদ্ধতি নিয়ে এত বিচলিত আর উত্তেজিত ? দেখে তিনি কৌতুক না করে পারেননি। কৌতুক দিয়ে তিনি ভিতরের উদ্বেগটাকেই চাপা দিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। এবং সম্ভবত তাঁর ভিতরের প্রতিবাদকেও। অন্যথায় তিনি পরবর্তী কথাগুলো বলতেন না।

সুদীপ ওর বন্ধ ঘরের চারপাশটা খুলে দিয়েছিল। আসলে, ওর চিন্তার আর দেখার জগতটাকে, কেবল মাত্র একটা আদর্শ আর মতবাদ দিয়ে ঘিরে রাখতে চায়নি। কেবল সীতানাথের নির্দেশেই এ কাজটা ও করেনি। ওর গুরু স্বয়ং কী ভাবে তাঁর মতবাদ আর আদর্শের বিরুদ্ধে চলছিলেন, সেটাই ওকে, ওব জন্ম থেকে লালিত ভাবনা, ধ্যান-ধারণাকে প্রচণ্ড আঘাত করেছিল। দক্ষিণপন্থী বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলো বামপন্থী সরকারের নামে মিথ্যা রটনা করবে, এটাকে ও

অনিবার্য আর স্বাভাবিক বলেই ধরে নিয়েছিল। কিন্তু বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলো ওর মোহভঙ্গ করেনি। ওর মোহভঙ্গ ঘটিয়েছিল প্রত্যক্ষ কিছু অভিজ্ঞতা, আর স্বয়ং ওর গুরু।

সুদীপ লক্ষ করেছিল, মন্ত্রীদের প্রতিটি দফতরকে ঘিরে এক শ্রেণীর লোক তাদের মতলব হাসিল করছিল। অবিশ্যি একটা শর্ত সব সময়েই থাকতো, পার্টিকে তারা কোনো না কোনো ভাবে সাহায্য করবেই। সরকারের হয়ে প্রচার করবে, এবং প্রয়োজনে নেতাদের ব্যক্তিগত ভাবমূর্তিকে বজায় রাখার জন্যও তারা কাজ করবে। গান্ধীবাদী বলে পরিচিত থেকে শুরু করে, যাদের কখনও কোনো আদর্শ ছিল না, এমন সমস্ত ব্যক্তি রাতারাতি বামপন্থী হয়ে উঠেছিল, যার পিছনে ছিল শুধুই ব্যক্তিস্বার্থ। আর সে-সবকে প্রশ্রয় দিতে গিয়ে, অনিবার্যভাবেই মিথ্যার আশ্রয় নিতে হচ্ছিল।

দক্ষিণপন্থী বুর্জোয়ারা ক্ষমতায় থাকতে, যেভাবে পুলিশকে কাজে লাগাতো, বিপ্লবীদের দ্বারা গঠিত বামপন্থী সরকার, সেই কাজে লাগানোটাকে করে তুলছিল আরও জোরদার। তার ফলে, পুলিশ নিষ্ক্রিয় আর সরকারের ক্রীড়নক হয়ে উঠছিল। অথচ সরকারের যন্ত্র অনবরত প্রচার চালিয়ে যাচ্ছিল—পুলিসকে হতে হবে জনসাধারণের সেবক। সেবা তারা নিশ্চয় করছিল। জনসাধারণের না, পার্টি আর সরকারের যারা বিরুদ্ধে, তাদের শায়েস্তা করাটা তাদের কাজের অন্তর্গত হয়ে পড়ছিল।

এর অনিবার্য ফল যা হবার, তাও ঘটছিল ঐতিহাসিক বাস্তবতার মধ্য দিয়েই। পুলিশের মধ্যেও দলাদলি সৃষ্টি হয়েছিল, যার পিছনে ছিল সরকারেরই মদত। তেমনি সমাজ-বিরোধীদের দলাদলির মধ্যেও ছিল সরকারের মদত।

সুদীপ সমাজবিরোধীদের বিষয়টিকে বোঝবার চেষ্টা করেছিল। ওর মনে প্রশ্ন জেগেছিল, সমাজবিরোধীরা কী ভাবে পার্টিগুলোর ছত্রছায়ায় আশ্রয় পাচ্ছিল। এ বিষয়ে সীতানাথের সঙ্গেও ওর কথা হয়েছিল। তিনি ছাড়াও, ওদের এলাকার লোকাল কমিটির কয়েকজন সদস্যের সঙ্গেও। অভিজ্ঞতা হয়েছিল, এ দেশে সংসদীয় রাজনীতিতে নির্বাচনের দ্বারা ক্ষমতা লাভ করতে হলে, কেবল জনসাধারণের বিশ্বাস আর শুভার্থীদের সাহায্য নিয়ে তা সম্ভব হয় না। এদেশে, সংসদীয় প্রথায় প্রথম থেকেই দক্ষিণপন্থী বুর্জোয়ারা সাধারণ মানুষের কাছে ত্রাসসঞ্চারকারী সমাজবিরোধীদের রাজনীতিতে টেনে এনেছিল। বুঝেছিল এদের শক্তিকে অবহেলা করা যায় না। পরবর্তীকালে, সীমাহীন হতাশা, অসংখ্য বেকার, সমাজবিরোধীদের জগৎকে আরও অনেক বড় হতে, বেড়ে উঠতে সাহায্য করেছিল। রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনের প্রয়োজনে, এদের সাহায্য

নেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। কারণ এরা প্রায় সর্বত্রই কোনোও না কোনো ভাবে, জনসাধারণের ওপর এক ধরনের কর্তৃত্বকে কায়েম করেছিল। এদের মধ্যে কেউ কেউ একদা রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মীও ছিল। আর বিপ্লবী চিন্তার ধারক, সংসদীয় প্রথায় ক্ষমতা দখলে বিশ্বাসী ব্যক্তিদের কাছে, সমাজবিরোধীদের একটা সংজ্ঞা হল, লুমপেন প্রলেতারিয়েত্।

সুদীপ জানতো, এসব বিষয় কেবল ওকেই বিচলিত করে নি। পার্টিগুলোর মধ্যে, এবং এমন কি সাধারণ শিক্ষিত জিজ্ঞাসু কিছু মানুষের মনকেও বিচলিত করেছিল। পার্টির মধ্যেও ছিল অন্তর্দ্বন্দ্ব। সে সব অন্তর্দ্বন্দ্ব যতোটা আদর্শকেন্দ্রিক, তার থেকে বেশি ছিল নেতা—অর্থাৎ, ব্যক্তিকেন্দ্রিক। অন্তর্দ্বন্দ্বের আরও একটা বড় কারণ ছিল, ক্ষমতা ভোগের ঈর্ষা। আর সে-সব কেবল কলকাতায় না, সমস্ত রাজ্য জুড়েই।

সুদীপ অবাক চোখে বাবাকে দেখছিল। বাবার সঙ্গে ওর দেখাসাক্ষাৎ প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কথাবার্তা বলার সময় ছিল না। খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু বিপ্লবী ভদ্রলোকটি কোন্ পথে ছুটছিলেন? তিনি হয়তো তাঁর ঔরসজাত শিষ্যটিকে ভুলে যেতে পারেন। সুদীপ ভুলবে কেমন করে?

সাতাত্তরে বামমার্গীরা, দিল্লিতে একটা পাঁচমেশালি সরকারকে সমর্থন করেছিলেন। তারপর সেই সরকারের উচ্ছেদও চেয়েছিলেন। যে ইন্দিরা গান্ধীকে সেই পাঁচমেশালি সরকার নানাভাবে হেনস্থা করেছিল, আশি সালে তাদের পায়ে দলে ইন্দিরা আবার ফিরে এসেছিলেন। সেই সময় পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারকে বেশ একটু উৎকণ্ঠিত দেখিয়েছিল। উৎকণ্ঠা কেটে যেতেই, কেন্দ্রের বিরুদ্ধে পর্বতপ্রমাণ বঞ্চনার অভিযোগই হয়ে উঠেছিল রাজ্যের সব থেকে বড় শ্লোগান। সুদীপ তাতে কোনো আপত্তির কারণ দেখে নি। কিন্তু, বাম আর ডান, বিপ্লবী ও বুর্জোয়া, এই সব পরিচয়বহনকারী শব্দগুলো ছাড়া, উভয় শাসকশ্রেণীর ভেদ রেখাটা যে ঘুচে যাচ্ছিল!

সুদীপের মাঝে মাঝে ইচ্ছা হতো, বাবাকে ডেকে জিজ্ঞেস করে, "কোথায় যাচ্ছো কমরেড ফাদার? মানতেই হবে, তোমার পক্ষে এখন গাড়ি ছাড়া চলাফেরা সম্ভব না। (নিজের উপার্জনে যা তোমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তবে একজন পেশাদার রাজনীতিক হিসাবে, এটাকে তোমার অর্জনের অধিকার বলেই ধরে নিতে হবে।) গৃহে চব্বিশ ঘণ্টা পুলিশ প্রহরা বা দেহরক্ষী, এ সবই খুব স্বাভাবিক আর প্রয়োজনীয়। কিন্তু নিজের অগোচরেই, তোমার জীবন যাপনের চেহারা বদলে যাচ্ছে, লক্ষ করছো না? ঘরের আসবাবপত্র থেকে শুরু করে, ঘর ঠাণ্ডা রাখার যন্ত্র পর্যন্ত উপহার অবলীলায় গ্রহণ করছো। একটু বাধছে না?

ওপরতলা থেকে নিচের অন্ধকার গুহা পর্যন্ত, সব শ্রেণীর সঙ্গে আপোষ করে চলছো। এ কি ভয়ংকর আত্মবিস্মৃতি ? তারপরেও, প্রতিটি সভায় ঘোষণা করছো, তোমাদের মূল লক্ষ্য বিপ্লব ! ক্যাডাবদের মাথায় ঢুকিয়ে দিচ্ছো, শ্রেণী বিপ্লবের পথে তোমাদের যাত্রা। সর্বহাবার একনায়কত্ব কায়েম করাই তোমাদের ব্রত।

"আমি রুদ্ধশ্বাস অবাক চোখে তোমার দিকে তাকিয়ে দেখছি। খবরের কাগজে তোমার বিপ্লবী ঘোষণা শুনে ভাবি, তোমার গলা একটুও কাঁপে না। তোমার কাছেই শুনেছি, স্বাধীনতার পর-মুহূর্ত থেকেই দক্ষিণপন্থী বুর্জোয়ারা জনসাধারণকে কেবল মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে আসছে। তুমি আদৌ মিথ্যা কথা বলো নি। কিন্তু তুমি, তোমার পার্টি, তোমরা কী করছো ? ক্যাডারদের পর্যন্ত মিথ্যা কথা বলছো !

"সীতানাথ জেঠুর কাছে, বাহাত্তরে তোমাদের ভূমিকার কথা শুনেছি। কী ভাবে তোমরা নকশালপন্থীদের তুলে দিয়েছো পুলিশের অনিবার্য খুনের হাতে। চিনিয়ে দিয়েছো ওদেব আত্মগোপনকাবীদের। ওবা তোমাদের যতো না মেরেছে, তুলনায় তোমরা মেরেছো অনেক বেশি। সেখানে তোমাদের উভয় পক্ষের একটা রাজনৈতিক হিংস্র প্রতিশোধের ব্যাপার ছিল, বুঝতে পারি ! কিন্তু, শহরে গ্রামে, তোমাদের আব দক্ষিণপন্থী বুর্জোয়াদের গরীব সমর্থকরা পরস্পরে মারামারি খুনোখুনি করে মবছে। বেচারিদের গরীব সংসারগুলো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আর তোমবা উভয় দলের নেতারা, খবরের কাগজে বিবৃতি দিয়ে পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করছো।

"কোথায় যাচ্ছো বাবা ? আমাকে তুমি ত্যাগ করেছো। তাতে তোমার কোনো ক্ষতি নেই। বাহ্যিক কোনো ক্ষতি আমারও নেই। এমন কি, এ কথাও বলতে পারি, তোমাব শিক্ষার দানকে অস্বীকার করি না। কিন্তু আমাকে এক দিকে রওনা করিয়ে দিয়ে, নিজে বিপরীত পথে যাত্রা করলে ?"....

সুদীপের সেই মাঝে মাঝে, বাবাকে ডেকে জিজ্ঞেস করার কথা মনে হলেও, পারেনি। কারণ, ওর নিজেব মনেই ভয় ছিল, জিজ্ঞাসার জবাবে, কী ভয়ংকর কথাই না ওকে শুনতে হবে। সেটা হবে আরও মর্মান্তিক। ও নতুন করে জগৎ আর সংসারের দিকে তাকিয়েছিল। ওব গান্ধীবাদী ঠাকুর্দার কথা মনে পড়েছিল। তাঁর সম্পর্কে যেমন একটা নতুন মূল্যায়নের চিন্তা মনে এসেছিল, তেমনি লেনিনের দিকেও আবার ওকে চোখ মেলে তাকাতে হয়েছিল।

বিরাশির নির্বাচনের প্রাক্কালে, দুটি ঘটনা ঘটেছিল। সুদীপ বুঝতে পারছিল, ওদের ফ্যাক্টরিতে একটা সংকট ঘনিয়ে আসছিল। সেই সংকটের মূলে ছিল

মার্কেটিং কন্ট্রোলার। ও তখন এ্যাসিস্টান্ট ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন অফিসার। এক দিকে কাঁচা মালের অভাব, আর এক দিকে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়ে তোলার বিপজ্জনক ঝোঁক, দুটো বিষয়েই আই.আর.ও-র সঙ্গে ও আলোচনা করেছিল। আই. আর. ও. ওর কথা মতো মার্কেটিং কন্ট্রোলারকে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে বলেছিলেন। কিন্তু এম. সি. সেটা মেনে না নেওয়ায় বিপদ যখন প্রায় দরজার গোড়ায়, তখন কর্তৃপক্ষকে সাবধান করা ছাড়া আর উপায় ছিল না।

কর্তৃপক্ষ যেন হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে, সুদীপ আর আই.আর.ও-কে ডেকে পরামর্শ করেছিলেন। সুদীপের বক্তব্য ছিল, সমস্তরকম ওভারটাইম বন্ধ করে, প্রোডাকশনের কমপিটিটিভ ব্যবস্থাকে রোধ করা। কয়েক মাস সে-ভাবে চালাতে পারলেই, কাঁচা মালের সংকট কেটে যাবে। বাজারের চাহিদাও বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ হঠাৎ বামপন্থী ইউনিয়নের দুই জঙ্গী কর্মীকে বরখাস্ত করে বসেছিল। সুদীপ ব্যাপারটা বুঝে ওঠার আগেই, এই বরখাস্তের বিরুদ্ধে সৌরীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি ছোট প্রতিবাদ কাগজে বেরিয়ে গিয়েছিল। হৃদয় ব্যানার্জির নির্দেশ এসেছিল, বরখাস্তের প্রতিবাদে ধর্মঘট ডাকা হোক।

ধর্মঘট ! সর্বনাশ ! ! সুদীপ কর্তৃপক্ষের কাছে ছুটে গিয়েছিল। ওর বক্তব্য ছিল, বরখাস্ত তুলে নেওয়া হোক। কর্তৃপক্ষ তাঁদের সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন। ধর্মঘট ডাকা হয়েছিল। আর সেই ধর্মঘটের পরিপ্রেক্ষিতে, কর্তৃপক্ষ লক আউট ঘোষণা করেছিলেন। অবিশ্যি সুদীপ লক আউটের আওতায় পড়েনি ! ও সীতানাথের কাছে ছুটে গিয়েছিল। ওর মুখ থেকে কথা খসতেই সীতানাথ হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিয়েছিলেন, "ব্যাপারটা আমি সবই জানি। হৃদয় আর ইউনিয়নের লিডারদের সঙ্গে বসে, প্ল্যান করেই সমস্ত ঘটনাটা ঘটানো হয়েছে। এমন কি দুজন জঙ্গী কর্মীর বরখাস্তও। ওটা দিয়েই প্ল্যানটা শুরু হয়েছিল। আমি এর প্রতিবাদ জানিয়েছি। সৌরীন, হৃদয়, আরও কয়েকজনকে আলোচনায় বসবার জন্যও ডেকেছি। সম্ভবত ওরা আলোচনায় বসবে না।"

"কিন্তু কর্তৃপক্ষকে বাদ দিয়ে তো এ ঘটনা ঘটানো যায় না।" সুদীপের দুচোখে আর গলার স্বরে এক রকমের বিভ্রান্তি বিস্ময় ও অনুসন্ধিৎসা ফুটে উঠেছিল।

সীতানাথ সুদীপের দিকে তাকিয়ে কৃপার হাসি হেসেছিলেন, "তা কী করে ঘটানো যাবে ? কর্তৃপক্ষের সংকটমোচনের জন্যই তো ঘটনাটা ঘটাতে হল। তোদের ফ্যাক্টরির লেবার স্ট্রেংথ্ কতো ?"

"প্রায় আড়াই হাজার !"

"তোর কি মনে হয় ! কোম্পানির ক্রাইসিস কাটতে কতোদিন সময় লাগতে

পারে ?”

“ক্রাইসিস কাটাবাব মতো অবস্থা তো ছিল। এ লকআউটের অর্থ, কোম্পানি কর্তৃপক্ষ কোনো ঝুঁকিই নিল না। যখন দেখবে, তার কোনো রকম বিপদে পড়ার সম্ভাবনাই আর নেই, ততোদিন সময় তারা নেবে।”

“তবে এখন যে লকআউট ঘোষণা করার কোনো কাবণ ছিল না, তাব হিসাব নিকাশ তোর কাছ থেকে আমি নিতে পারতাম। কিন্তু তাতে তুই বিপদে পড়ে যাবি। ওরা বুঝতে পারবে, তোর কাছ থেকেই আমি সব জেনেছি।”

“বিপদ মানে কী ? আমার চাকরি যাবে ? যাক, আমি সে ভয় করিনে।”

“জানি। তবু আপাতত ওটা থাক। আমি অন্যভাবে চেষ্টা করে দেখি।” সীতানাথের গম্ভীর মুখে চিন্তার ছায়া নেমে এসেছিল, “খুব কম করে তিন-চার মাস এখন কারখানা বন্ধ থাকবে। যদি না আরো বেশি সময় নেয়। দেখি, সৌরীন হৃদয়রা যদি আলোচনায় বসে, অন্ততঃ লক আউটের সময়টা যাতে আরো কমানো যায়, আর ওই বন্ধ সময়ের বেতন আদায় করতে কোম্পানিকে বাধ্য করা যায়, সেটাই আমি বলবো।”

সুদীপের মুখে আর বিভ্রান্তি ছিল না। গাম্ভীর্য অথচ একটা উদ্বেগ ওর মুখে নেমে এসেছিল, “সীতানাথ জেঠু, আমার কাছে সমস্ত ব্যাপাবটা অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে। এটা তো একটা ঠাণ্ডা মাথায় খুন করার মতো ঘটনা !”

“কেন ?” সীতানাথ ঠোঁট টিপে হেসেছিলেন।

সুদীপের স্বরে উত্তেজনা ছিল, “এটা তো শ্রমিকদেব সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা।”

“তা-ই বা কেন ? কারখানাকে না বাঁচালে, শ্রমিকবা কাজ করবে কোথায় ? কারখানা বাঁচানোটাও তো একটা দায়িত্ব।”

“এটাও কি ট্রেড ইউনিয়নের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে ?”

“দায়িত্বটা নিলেই বা ক্ষতি কী ?”

“এরকম কথা অবিশ্যি আমি এই প্রথম শুনছি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তো কারখানা মরে যাবাব মতো কোনো ঘটনা ঘটে নি। তা হলে বাঁচাবার প্রশ্ন আসে কী করে ? এটা তো একটা ক্লিন ষড়যন্ত্রের ব্যাপার। কোনো কারণ না দেখিয়েই দুজনকে হঠাৎ বরখাস্ত নোটিশ দেওয়া হল। নোটিশ দেওয়া মাত্রই, ইউনিয়ন কোনো আলোচনা না করেই, স্ট্রাইক কল করে বসলো। তারপরেই লকআউট !”

সীতানাথ হেসে উঠেছিলেন, “ইহাকে কহে, সরিষার মধ্যে ভূত। যাই হোক, আমার মনে হয়, এ ব্যাপারটার মধ্যে তোর জড়িয়ে পড়ার কোনো কারণ নেই। আর আমার সঙ্গে এ বিষয়ে তোর কোনো কথা হয়েছে, সেটা জানাজানি হওয়া উচিত নয়।”

"কিন্তু বাবাকে যে আমার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হচ্ছে ?"

"কী জিজ্ঞেস করবি ?"

"জেনে শুনে তিনি এরকম একটা ঘটনা ঘটালেন কী করে ?"

"জেনে শুনে ? ননসেন্স ! সৌরীন কী ঘটিয়েছে ? সে কিছুই ঘটায় নি। একটি কারখানার দুই জঙ্গী শ্রমিকের বরখাস্তর ব্যাপারে, সে প্রতিবাদ জানিয়েছে। সেটা কাগজে বেরিয়েছে। তার বেশি তো সে কিছু করেনি ?"

সুদীপ সীতানাথের মুখের দিকে যেন আর্ত অসহায় চোখে তাকিয়েছিল। সীতানাথের মুখে ছিল প্রচ্ছন্ন তিক্ত হাসি। সুদীপের স্বরে সেই আর্ত অসহায়তাই ফুটে উঠেছিল, "সীতানাথ জেঠু, আমার কষ্ট হচ্ছে।"

"কার জন্যে ? তোর বাবার জন্যে ? না, তোর নিজের জন্যে ?"

"আমার নিজের জন্যে।"

"স্বাভাবিক। তোর বন্ধ ঘরের চারপাশের জানালাগুলো খোলা থাকলে, প্রাণটা আরো মজবুত থাকতো। এ কষ্টটা তা হলে ভোগ করতে হতো না। নিছক তত্ত্ব জানাটা কোনো কাজের কথা নয়। সমস্ত সাধারণ মানুষের শুভ বোধ আছে, এই বিশ্বাসের সঙ্গে, তোর চারপাশের জগতের অভিজ্ঞতা অনেক বড় ব্যাপার ! সেই অভিজ্ঞতাই তোর ঘটছে। জীবনের সব অভিজ্ঞতা সুখের হয় না। কিন্তু সত্যবোধটা শক্ত হয়।"

সুদীপ সীতানাথের কথা মেনে নিয়েছিল। ও কারখানার লক আউটের ব্যাপারে বাবার সঙ্গে কোনো কথাই বলেনি। ইচ্ছা ছিল, জয়তীকে ঘটনাটা বলবে। সীতানাথ বারণ করেছিলেন, তাঁর সঙ্গে কথাবার্তার বিষয় যেন কেউ না জানতে পারে। তা ছাড়া, ও নিশ্চিত ছিল, জয়তী লক আউটের আভ্যন্তরীণ ঘটনাটা বিশ্বাস করতো না। সুদীপ নিজে যে কারখানার একটি দায়িত্বশীল পদে আছে, সে যে ভুল বা মিথ্যা বলছে না, জয়তীর পক্ষে সেটাও মেনে নেওয়া সম্ভব হতো না ! ও ধরেই নিতো, সুদীপ পার্টির বিরুদ্ধে মিথ্যা কলঙ্ক রটনার কথারই প্রতিধ্বনি করছে।

এ কথা অবিশ্যি সত্যি, কারখানা কর্তৃপক্ষ যে-ভাবে প্ল্যান করে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়েছিল, সুদীপ তার কিছুই জানতো না। কর্তৃপক্ষ ওর সঙ্গে কোনো আলোচনা করেনি। আই আর ও-এর সঙ্গে করেছিল কি না, তাও ও জানতো না। বাইরে থেকে সমস্ত ঘটনাটা আনুপূর্বিক বিবেচনা করলে, কোথাও কোনো পূর্ব পরিকল্পনার ইঙ্গিত চোখে পড়তো না। এবং বলাবাহুল্য, সীতানাথ জেঠুর সঙ্গে বাবা বা হৃদয় ব্যানার্জির এবং কারখানার ইউনিয়নের নেতাদের সঙ্গে মতবিরোধ ঘটেছিল ! আলোচনায় বসলেও, তাঁরা কেউ মেনে নেননি, কারখানার

সংকটের জন্যই সমস্ত ঘটনাটা ঘটানো হয়েছিল। লক আউটের বিরুদ্ধে কারখানা খোলার দাবীতে, এবং বরখাস্ত দুই কর্মীর পুনর্বহাল নিয়ে তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। সীতানাথের সন্দিগ্ধ চিন্তাভাবনাকে সবাই সমালোচনা করেছিলেন। আর তাঁর সেই মনোভাব যে পার্টিবিরোধী, তারও নিন্দা করা হয়েছিল। নিন্দার মধ্য দিয়ে তাঁকে হুঁশিয়ারিও দেওয়া হযেছিল, তাঁর ক্রমাগত পার্টিবিরোধী মন্তব্য মেনে নেওয়া অসম্ভব হচ্ছে। তিনি কাজের বাধার সৃষ্টি করছেন, এবং পার্টির মূলনীতিকেই বিপজ্জনক ভাবে অগ্রাহ্য করে চলেছেন। দিল্লির নেতৃত্বকেও সীতানাথ মজুমদারের কথা জানানো হযেছিল।

কারখানার ঘটনার এক মাসের মধ্যেই, আর একটি ঘটনা ঘটেছিল। ভাঙা-চোরা জীর্ণ শীর্ণ অস্তিত্ব আছে, অথচ একটি ধ্বংসস্তূপ ছাড়া কিছু নয়, এমন একটি কারখানা, বিশাল জমি সমেত পড়েছিল দীর্ঘকাল। একটি দৈনিকে হঠাৎ সংবাদ প্রচাবিত হয়ে গিয়েছিল কারখানাটি পুনরুজ্জীবনেব জন্য ইতিমধ্যেই একটি সংস্থাকে কয়েক খেপে প্রায় দু কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। সংস্থাটি বেশি কালের পুরনো ছিল না। তাদের আসল কাজ ছিল এজেন্সির কারবার করা। কারখানা তৈরি বা চালাবাব কোনো অভিজ্ঞতাই তাদেব ছিল না। এবং প্রায় এক বছর অতিক্রম করতে চলেছিল, অথচ সেই কারখানা যে অবস্থায় ছিল, তার কোনোই পরিবর্তন হয়নি। সেই অনামী সংস্থাটিকে টাকা দেবার অনুমোদন করেছিলেন সৌরীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সংবাদটি প্রচারিত হওয়া মাত্র একটা হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল। সমস্ত দিক থেকেই এ বিষয়ে দায়বদ্ধ মন্ত্রীর বিবৃতি দাবী করা হযেছিল। মন্ত্রী বিবৃতি দিয়েছিলেন। স্বীকার করেছিলেন, টাকাটা দেওয়া হয়েছে, এবং যে সংস্থাকে দেওয়া হয়েছে, তা উচিত বিবেচনা করেই দেওয়া হয়েছে। কয়েকটি বাস্তব অসুবিধার জন্য কাজ শুরু কবা যায়নি। শীঘ্রই শুরু হবে।

সেই বিবৃতির পরেই, আবার সেই একই দৈনিকে আর একটি সংবাদ বেরিয়েছিল, সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত কারখানার মালিককেও তিরিশ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছিল। মন্ত্রী তাঁর বিবৃতিতে তাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সমস্ত বিষয়টি নিয়ে বিরোধী পক্ষই যে কেবল নানা দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছিলেন, তা , সাধারণ মানুষের মধ্যেও বিষয়টি নিয়ে রীতিমতো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। বিরোধীপক্ষ তদন্তের দাবী করেছিল।

সুদীপ দূর থেকে বাবাকে দেখছিল। অবিশ্যি তাঁর দেখা পাওয়া যেতো খুব ম। বিশেষ করে, নতুন ঘটনাটি প্রকাশিত হবার পরে, বাবা যে কখন বেরিয়ে তেন, আর কখন রাত্রে বাড়ি ফিরতেন টের পাওয়া যেতো না। তাঁকে

দেখাতো গম্ভীর আর চিন্তাশীল। তবে উদ্বিগ্ন বা বিষণ্ণ দেখাতো না। ওর কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিল। এবং এমন কি, ও মনে মনে বলেছিল, "ঈশ্বর, ভদ্রলোককে বাঁচাও।"

সুদীপ পরে বুঝেছিল, ওর এই প্রার্থনার কথা যদি বাবা তখন জানতে পারতেন, তিনি অট্টহাসিতে ফেটে পড়তেন। কারণ তিনি গম্ভীর আর চিন্তিত হলেও, ভয় আদৌ পাননি। সীতানাথের কাছে ও শুনেছিল, পার্টিতে বিষয়টি নিয়ে আলোচনায় দুটি দল হয়ে গিয়েছিল। এক দল চেয়েছিল, বিষয়টি নিয়ে তদন্তের কোনো প্রয়োজন নেই। আর এক দলের দাবী ছিল, তদন্ত করাতেই হবে। এই বিতর্কের মধ্যে, প্রায় একটি সিদ্ধান্তে উভয় পক্ষই রাজী হয়ে গিয়েছিল। তদন্ত হবে। তবে প্রকাশ্যে না। পার্টিই বিষয়টি তদন্ত করবে। এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সীতানাথ শুধু প্রতিবাদ করেননি। ঘোষণা করেছিলেন, এই সিদ্ধান্তের দ্বারা পার্টির সুনাম নষ্ট হবে। এবং সেই কারণেই তিনি প্রকাশ্যে জানাবেন, রাজ্য নেতৃত্বের পরিবর্তে, বিষয়টি সর্বভারতীয় নেতৃত্বের হাতে তুলে দিতে তিনি অনুরোধ জানাচ্ছেন। তারপরেই, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, বিষয়টির প্রকাশ্য তদন্ত করানো হবে। এবং সরকারের পক্ষ থেকে প্রেসকে সেই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছিল। কিন্তু সেই দিন থেকেই, সীতানাথ মজুমদার ও আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে পার্টিবিরোধী মন্তব্য ও কার্যকলাপের জন্য একটি প্রস্তাব তৈরি করা শুরু হয়েছিল।

ঘটনাটির এখানেই যদি ইতি হতো, সুদীপের মনোভাবের কোনো পরিবর্তন ঘটতো না। লোকাল কমিটির শিশির কোনারের কাছ থেকে ও প্রথম জানতে পেরেছিল, যে-সংস্থাকে দু কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল, তার একজন অংশীদার ছিল বুবু। সুদীপ কথাটা বিশ্বাস করার আগে, একটা দ্বিধা নিয়ে বুবুকে না জিজ্ঞেস করে পারে নি।

"হ্যাঁ।" বুবু সুদীপের কাছে অনায়াসে স্বীকার করেছিল, "তোমাকে তো আগেই বলেছিলুম, চাকরির চেয়ে ব্যবসাতেই আমার ঝোঁক বেশি। চাকরি করে আর ক'টা টাকা পাওয়া যায়?"

সুদীপ বুবুর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারেনি, ও ছেলেটা সরল না মূর্খ না একটা স্বার্থপর শয়তান।

ও অবাক ভ্রূকুটি চোখে বুবুর দিকে তাকিয়েছিল, "বাবা জানতেন, সংস্থার একজন অংশীদার?"

"সত্যি দাদা, তুমি লেখাপড়ায় এত ভাল! একজন এঞ্জিনিয়ার, আর বুঝতে পারো না, সবকিছুই বাবার নখদর্পণে ছিল।"

"তোর মনে হয়নি, তুই অন্যায় করছিস ?"

"কেন মনে হবে ? ঐ ডাইনি ইন্দিরা গান্ধী সঞ্জয়কে নিয়ে কী শুরু করেছিল ? নেহাত কপাল খারাপ, প্লেন গোঁত্তা খেয়ে ছেলেটা মরে গেল।"

"ডাইনিরা তো অনেক কিছুই করতে পাবে। কিন্তু তোকে আর বাবাকে তো ডাইনিতে পায়নি।"

"আমাদের ডাইনিতে পাবে কেন ? তবে তুমি যে অন্যায়-টন্যায়ের কথা বলছো, ওসব আজকাল মানতে গেলে চলে না। আর তুমি কি ভাবছো, টাকাটা আমরা কয়েকজন নয়-ছয় করেছি ? তা নয়। আরও অনেক ব্যাপার আছে। সেসব তুমি বুঝবে না। খালি একটা কথা মনে রেখো, বাবার কাছে প্রথম হল পার্টির স্বার্থ। তারপরে বাকি সব।"

"তুই কি জানিস, বাবা যতো টাকা নিয়ে যাই করুন. তা জনসাধারণের টাকা ?"

"দেখ দাদা, আমি তোমার মতো ভাবতে পারিনে। বাবা তোমার চেয়ে কিছু কম বোঝেন না। জনসাধারণের টাকা, তো কী হয়েছে ? টাকা তো কেউ চুরি করেনি।"

"তবে কী করেছিস ? দু কোটি টাকার মধ্যে কারখানার জন্য একবছরে কিছুই তো করিসনি।"

"তার মানে. তুমি কী বলতে চাও ? আমরা চুরি করেছি ? আমরা চোর ?" বুবু রীতিমতো উদ্ধতভাবে ঝেঁঝে উঠেছিল, "বাবাও চোর ?"

সুদীপ বুবুর মুখের দিকে হতবাক্ বিস্ময়ে তাকিয়েছিল। বুবুর মুখ শক্ত হয়ে উঠেছিল। আরক্ত হয়ে উঠেছিল ওর দুই চোখ। সুদীপ তবু চুপ করে থাকতে পারেনি, "তদন্তের ব্যাপারে তোর কোনো ভয় নেই ?"

"কেন ভয় পাবো ? যতো খুশি তদন্ত হোক না। ওসবের পরোয়া আমরা করিনে।"

সুদীপ আর কোনো কথা বুবুকে জিজ্ঞেস করেনি। কেবল, একটা আত্মজিজ্ঞাসা ওর মনে জেগেছিল। বুবু ওর থেকে ক' বছরের ছোট ? মাত্র আট বছরের। জেনারেশনের দিক থেকে বিচার করতে গেলে, ওদের দু'জনের মধ্যে কোনো ফারাক থাকার কথা না। জয়তীও বুবুর প্রায় সমবয়সী। ওরা একই সময়ের কাছাকাছি বয়সের যুবক-যুবতী। অথচ ওদের তিনজনের মধ্যেই ভাবনা-চিন্তার কতো তফাত ! কী করে এটা সম্ভব হয় ? বাবার বিষয়েও ভাবতে গেলে, ও আত্মজিজ্ঞাসায় আক্রান্ত না হয়ে পারেনি। যে-কথাটা সাম্প্রতিককালে এক শ্রেণীর সমাজবোদ্ধা ব্যক্তি "জেনারেশন গ্যাপ"-এর কথা বলেন, সেটা ওর

কাছে খুব পরিষ্কার না। জেনারেশন গ্যাপটা কী ? বাবার সঙ্গে ওর সম্পর্কের দূরত্ব বা শূন্যতা, যাই হোক, সেটা কোথায় ? আদৌ আছে বলেই ও বিশ্বাস করতে পারে না।

সুদীপের কাছে কথাটা অর্থহীন মনে হয়। জেনারেশন গ্যাপ বলে যদি কিছু বাস্তবে থাকতো, তাহলে বাবার সঙ্গে বুবুর ঐক্য ঘটছিল কেমন করে ? আর বাবাকেই বা ও বুঝতে পারছিল কেমন করে ? বাবার পরিবর্তন দেখে, ও অবাক হয়েছিল। কিন্তু বাবাকে বুঝতে ওর অসুবিধা হয়নি। যেমন অসুবিধা হয়নি, এমনকি, ওর ঠাকুর্দাকেও বুঝতে। সেখানেও ও দুস্তর ফাঁক বা শূন্যতা বোধ করেনি। যেখানে, মানুষ সময়কে বিচার-বিশ্লেষণ করতে পারে, আর সেই বিশ্লেষণের দ্বারা মানুষের আচার-আচরণ ধ্যান-ধারণার ব্যাখ্যা করতে পারে, এবং পরস্পরের ভূমিকাকে নির্ধারিত করতেও অক্ষম না, সেখানে দূরত্ব, ফাঁক বা শূন্যতার প্রশ্ন আসবে কেন ?

সুদীপ দু'কোটি টাকা ব্যয়ের বিষয়টি নিয়ে জয়তীর সঙ্গে আলোচনা করেছিল। জয়তীর পার্টি-আনুগত্য সম্পর্কে মনোভাবের কথা জানা সত্ত্বেও, কথাটা না তুলে পারেনি। জয়তীর জবাব ছিল খুবই পরিষ্কার। ও বাবার কাজকে কোনো দিক থেকেই অন্যায় মনে করেনি। প্রথমত, একজন কমিউনিস্ট, যিনি মার্কসবাদে দীক্ষিত, জীবনে দীর্ঘকাল জেল খেটেছেন, তিনি কোনো অন্যায় কাজ করতেই পারেন না। দ্বিতীয়ত তিনি যে একটি অনামী সংস্থাকে, একটি মৃত কারখানাকে নতুন করে গড়ে তোলার জন্য দু'কোটি টাকা দিয়েছিলেন, সেটা চুরি করে দেননি। একটি ভালো কাজের জন্যই দিয়েছিলেন। সংস্থাটি যদি কিছু অন্যায় করে থাকে, সে-দোষ সরকার বা পার্টির ওপর বর্তায় না। সব থেকে বড় ব্যাপার হল, সরকার থেকে বিষয়টির তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পার্টিরও তাতে অনুমোদন ছিল।

সুদীপ জানতো, জয়তী কী বলবে। তবু না জিজ্ঞেস করে পারেনি, "কিন্তু ঐ সংস্থার অন্যতম অংশীদার স্বয়ং সেই মন্ত্রী সৌরীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে সুজি বন্দ্যোপাধ্যায়, এটা কেমন করে ঘটে ?"

"অসুবিধে কোথায় ? ও যদি ব্যবসা করতেই চায়, অংশীদার হতে দোষ কী দোষ তো তুমি একটা কারণেই দিতে পারো। ও মন্ত্রীর ছেলে। মন্ত্রীর ছে বলেই কি ও ব্যবসা করতে পারবে না ? সরকারের টাকা নিতে পারবে না ?'

"ব্যাপারটা তোমার কাছে অনৈতিক বলে মনে হচ্ছে না ?"

"না।"

"তুমি কি জানো মুন্না, ঐ সংস্থা সম্পর্কেই মানুষের মনে নানা সন্দে

রয়েছে ?"

"থাকলই বা। তদন্তের নির্দেশ যখন দেওয়া হয়েছে, তখন মানুষের মনে আর সন্দেহ থাকা উচিত নয়। তুমিও কি এর পরে সন্দেহ করো?"

"করি। তুমি কি জানো না, পার্টির একাংশের মধ্যেও এ নিয়ে নানা সন্দেহ দেখা দিয়েছে ?"

"দিয়েছিল। তদন্তের নির্দেশ দেবার পরে তাদের আর কোনো সন্দেহ নেই।"

পার্টির প্রতি আনুগত্য কতোটা মূঢ় আর বিপজ্জনক হতে পারে, জয়তী তার এক জাজ্বল্যমান উদাহবণ। আর জীবন এমনই জটিল,যথেষ্ট অনৈচিত্যের যথেষ্ট যুক্তি থাকা সত্ত্বেও, জয়তীর প্রতি সুদীপের ভালবাসা কী অসহায়। জয়তীর প্রাণের যে-শক্তি ওর হৃদয়কে জয় করেছে, সেই শক্তিই আবার একটা অন্ধ আনুগত্যের সঙ্গে শৃংখলিত হয়ে পড়েছে। আশ্চর্য এই বৈপরীত্য। এবং সুদীপের নিজের বৈপরীত্যও সেই কারণেই বিস্ময়কর।

সুদীপ ওর শৈশব থেকে জীবন ও জগৎ-সংসারকে যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে শিখেছে। একটা মতাদর্শগত তত্ত্বকে গ্রহণ করেছিল সেই যুক্তি বুদ্ধি দিয়েই। অবিশ্যি তার মধ্যে ওর গুরুর দানটাকে ও অস্বীকার করতে পারে না। অথচ সেই গুরু, ওর যুক্তি বুদ্ধি, সবই, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এক বিপরীত মেরুতে এসে দাঁড়িয়েছিল। ওর গুরু তাঁর তত্ত্বের নামে নিজেরই চরিত্রহনন করছিলেন। তত্ত্বের সঙ্গে ক্ষমতার কী অপরিসীম বিরোধ! আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তার প্রমাণ মিলেছে। কিন্তু সে-ক্ষমতা ছিল নেতৃত্বেব অদম্য কারণে। এ রাজ্যে, পার্টি যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে, তারপরেও বিপ্লবের কথা বলছে। এ কি কৌতুক, না পরিহাস ? অথবা, এই সংসদীয় রাজনীতির ছোট পর্যায়ের ভিতর দিয়ে এঁরা জীবন কাটিয়ে যাবেন। তার পরেও, কোনোও এক অনিশ্চিত সময়ের বংশধরেরা বিপ্লব ঘটাবে, এ অর্থটাই তাঁদের কথা থেকে বুঝে নিতে হবে ?

জটিলতা সেখানেই। পার্টি যাত্রা করেছে এক পথে। কথা বলছে, বিপরীত পথের। সুদীপ ওর যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারছে, জয়তীর সঙ্গে একত্র জীবনযাপন অসম্ভব। অথচ সেই জয়তীই ওর সমস্ত যুক্তি বুদ্ধিকে ভাসিয়ে দিয়ে, হৃদয়ে একচ্ছত্র অধিকার কায়েম করে বসে আছে। সুদীপ গভীর সংশয়ে, জিজ্ঞাসু চোখে জয়তীর দিকে তাকিয়েছিল, "মুন্না, তুমি কি আমাকে পার্টির শত্রু মনে করো?"

"এখনো করি না। তুমি পার্টির একজন সমালোচক। কিন্তু কোনো শত্রুতা তো করোনি ?"

"যদি কোনো দিন শত্রুতা করি ?"

জয়তী কথাটা প্রাণপণে বিশ্বাস করতে চাইতো না, "তুমি তা কখনো করবে না।"

"কেন তোমার এ বিশ্বাস ?"

"তুমি আমার থেকে অনেক বেশি বোঝ। তুমি জানো পার্টির ভুল ত্রুটি ঘটতে পারে। তার জন্য পার্টির শত্রুতা করবে কেন ?"

"এইজন্য যে, পার্টির ভুল ত্রুটি এমন পর্যায়ে এসে পড়ছে, তত্ত্বের কোনো বিচার ব্যাখ্যাতেই তারা পার্টি পরিচয়টায় দক্ষিণপন্থী বুর্জোয়াদের সঙ্গে আর কোনো ভেদই রাখছে না। ক্ষমতায় থাকবার জন্য সব রকম আপোস করতে গিয়ে দুর্নীতির আশ্রয়ও নিচ্ছে।"

"ছুবু, তোমার এ কথাটা আমি মানতে পারিনে।"

সুদীপ জানতো, কোনো যুক্তিই জয়তীর কাছে খাটবে না। অথচ সুদীপ দেখছিল, একই সময়ের একটা বৃত্তের মধ্যে ও, জয়তী, বুবুর মতো যুবক-যুবতীরা বিচরণ করছিল। যাদের পরস্পরের মধ্যে প্রচুর বৈপরীত্য অবস্থান করছিল। শুধু ওদের মধ্যেই না। পার্টির বয়স্ক নেতা ব্যক্তিদের মধ্যেও একই বৈপরীত্য বর্তমান ছিল। এখানে কেবল সীতানাথের মতো ব্যক্তির কথাই যথেষ্ট না। পি সুন্দরাইয়া একই ভাবে, নিঃশব্দে সেই বৈপরীত্যের পথে চলেছিলেন।

সুদীপের পক্ষে শেষ পর্যন্ত সৌরীন্দ্রকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। ও ওর গুরুর মুখোমুখি না দাঁড়িয়ে পারেনি। কিন্তু সৌরীন্দ্র সুদীপের কাছে আদৌ পরাজয় স্বীকার করেননি। তিনি তাঁর ও পার্টির কাজের সমর্থনে, কোনো যুক্তি দেখাতেই ছাড়েননি। এবং বিরাশিতে আবার তাঁরা নির্বাচনে জিতে ক্ষমতায় এসেছিলেন। সেই আসাটা যেন প্রমাণ করে দিয়েছিল, তাঁদের সমালোচকেরাই ভুল করেছিল। তাঁদের শত্রুদের মুখে পড়েছিল ছাই। পার্টি দ্বিতীয়বার প্রচুর ক্ষমতা নিয়ে জিতেছিল। মন্ত্রীসভা গঠনের পর, সীতানাথ পার্টির খুবই সুসময়ে বিদায় নিয়েছিলেন। তবে বিদায় নেওয়াটাকে বহিষ্কারই বোঝায়। কিন্তু পার্টির একটা সন্দেহ ছিল, সীতানাথ দল পাকাবেন। তা তিনি পাকাননি। তাঁর একটা ভবিষ্যদ্বাণী মিলে গিয়েছিল। সুদীপের কারখানা চার মাসের মুখে খুলেছিল। দুই জঙ্গী বরখাস্ত কর্মীকে কাজে নেওয়া হয়েছিল। আর কর্তৃপক্ষ অগ্রিম হিসাবে, এক মাসের মাইনে দিয়েছিল।

সুদীপ ছোট রাস্তার এক পাশ ঘেঁষে এমনভাবে গাড়িটা পার্ক করলো, যাতে অন্তত আর একটি গাড়ির যাতায়াতের পথ থাকে। ওর গাড়িটা ভারতীয়, কিন্তু

ছোট। ওর নিজস্ব গাড়ি না। কোম্পানির গাড়ি। লাইসেন্সটা ওর নিজস্ব। ড্রাইভার ওর পাবার কথা। কিন্তু ও ড্রাইভার রাখেনি। মাসে একটা সীমাবদ্ধ পরিমাণ তেল কোম্পানির কাছ থেকে পায়। এখন ও আই· আর· ও·। ওকে সকাল ন'টার মধ্যে বেরিয়ে, আগে উপকণ্ঠের কারখানায় যেতে হয়। লাঞ্চের আগে ফিরে আসে কলকাতার অফিসে। খুব জরুরি প্রয়োজন না থাকলে আর কারখানায় যায় না। তবে, মাঝে মাঝেই বিকেলের দিকে যেতেও হয়।

সুদীপ যেখানে গাড়িটা রাখলো, তার বিপরীত দিকেই একটি তিনতলা পুরনো বাড়ি। মধ্য কলকাতার এ বাড়িটার সীমানা ঘেরা পাঁচিলের ইঁটে নোনা ধরেছে। বাড়িটা বেশ বড়ই। সামনে রয়েছে বড় গেট। গেটটা আগে হয়তো কাঠের ছিল। এখন টিনের। বাড়ির সামনের চত্বরের এক পাশে ছোটখাটো একটি মোটর মেরামতির কারখানা। আসলে কারখানা দুটো পুরনো গ্যারেজের মধ্যে। বাইরেও কাজ হয়। বাড়ির এখন যারা বাসিন্দা, তাদের কারোর গাড়ি নেই। কারখানাটা না থাকলে, সুদীপ অনায়াসে ওর গাড়িটা ভিতরে রাখতে পারতো। কিন্তু বাড়ির মালিক মেরামতি কারখানার কাছ থেকে, গ্যারেজ ভাড়ার থেকে, বেশি টাকা পান।

সুদীপ বাড়ির মধ্যে ঢুকল। কারখানার মালিক মুসলমান মধ্যবয়স্ক শাহেদ বসেছিলেন একটা খাটিয়ায়! সুদীপের সঙ্গে তার সেলাম ও হাসি বিনিময় হল। গ্যারেজের সামনে দিয়ে চত্বর বাঁ দিকে সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছে। সেদিকে এগিয়ে যাবাব পর বাড়ির মাঝামাঝি জায়গায় ওপরে ওঠার সিঁড়ি। সিঁড়িটা দিনের বেলাও অন্ধকাব থাকে। সেজন্য আলো জ্বালিয়ে রাখা হয়। কিন্তু এখন আলো জ্বলছিল না। লোডশেডিং?

মনে প্রশ্নটা জাগার মুহূর্তেই, ওর ধাক্কা লাগলো কোনো মানুষের সঙ্গে। ও তখন দোতলার মাঝামাঝি। একজন কেউ নিচের ধাপে ছিটকে নেমে গেল। আর একজন দ্রুত ওপরে উঠে গেল। সেই সঙ্গে ছড়িয়ে দিয়ে গেল কিঞ্চিৎ ফুলেল গন্ধ। বেচারি! নিশ্চয়ই দোতলার যোগেশবাবুর মেজ মেয়ে শর্মিলা। বাড়িটার অন্য পাশের একতলার বাসিন্দা সুখময় ওর প্রেমিক। বোধহয় দু-এক মিনিটের সুযোগ পেয়েছিল। সুদীপ এ বাড়ির সবাইকেই মোটামুটি চেনে।

সুদীপ দোতলায় পৌঁছুবার আগেই সিঁড়িতে আলো জ্বলে উঠলো। কিন্তু শর্মিলার দেখা পাওয়া গেল না। সামনের বারান্দা ফাঁকা। ঘরের দরজার ওপরে সস্তা পাতলা কাপড়ের পর্দা ঝুলছে। ও তিনতলায় উঠে গেল।

একটাই বাড়ি, কিন্তু পুব পশ্চিমে বিভক্ত। দু দিকেই, দোতলা পর্যন্ত চারটি করে ঘর আর বারান্দা। বাথরুম একটি। তিনতলায় দুটি ঘর, বারান্দা,

বাথরুম। পুব দিকের তিনতলার একটি ঘরে সীতানাথ থাকেন। আর এক ঘরে থাকে একটি মধ্যবয়স্ক নিঃসন্তান দম্পতী। ছোট রান্নাঘরটা তাদেরই দখলে। সীতানাথ বারান্দার এক পাশে স্টোভ জ্বালিয়ে রান্না করেন।

ঘরের দরজায় পা দিতেই, সীতানাথ চোখ তুলে তাকালেন। ঘরে একটি মাত্র চেয়ার। তিনি সেই চেয়ারে বসেছিলেন। তাঁর তক্তপোষের ওপর বসেছিলেন লম্বা চওড়া কালো রঙ এক ভদ্রলোক। সুদীপের পরিচিত। ভদ্রলোক একজন পাবলিশার। সীতানাথ জেঠু আজকাল প্রধানত অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর উপরে কিছু সমাজ মূল্যায়নের বই লিখেছেন, এবং বইগুলোর বিক্রি খারাপ না। তাঁর খেয়ে-পরে,বাড়িভাড়া দিয়ে মোটামুটি চলে যায়। সুদীপকে দেখে হাসলেন, "আয়।"

সুদীপের জিন্‌স্-এর ওপরে হাফ হাতা পাতলা একটা খাটো পাঞ্জাবী ছিল। পায়ের স্যাণ্ডেল বাইরে রেখে ভিতরে ঢুকলো। নমস্কার বিনিময় হল প্রকাশক ভদ্রলোকের সঙ্গে। ভদ্রলোক ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন। দু'হাত তখনও নমস্কারের ভঙ্গিতে বুকের ওপর রাখা। মুখে অমায়িক হাসি, "আমি তা হলে চলি? আপনারা কথা বলুন।"

"হ্যাঁ, আপনি এখন আসুন।" সীতানাথ ঘাড় ঝাঁকিয়ে হাসলেন।

প্রকাশক ভদ্রলোক অমায়িক হেসে বিনীত নমস্কারের ভঙ্গিতে বুকের কাছে দু'হাত রেখে বেরিয়ে গেলেন। সুদীপ তক্তপোষের ওপর বসলো। ঘরটি খুব ছোট না। একটি তক্তপোষ, সামান্য বিছানা, একটি চেয়ার, দক্ষিণের জানালা ঘেঁষে একটা পুরনো টেবিল, এই হল মোট আসবাব। আর বই ঠাসা সস্তা কাঠের বইয়ের র‍্যাক, একদিকের দেওয়াল জুড়ে। টেবিলের ওপর কিছু বই, লেখার কাগজ, কলম, চশমার খাপ ইত্যাদি ছড়ানো। আর এক কোণে কাচের গেলাসে মুখ ঢাকা একটি জলের কুজো। ছোট কেতলি, চায়ের কাপডিস, স্টিলের থালাবাসন, আর রান্নার ডেয়ো ঢাকনা। সবই যে সীতানাথ জেঠুর হাতে ধোয়া-মোছা সাজানো-গোছানো, তা না। ঘরের হালকা হলুদ রঙের দেওয়াল বিবর্ণ। কোনো মার্চেন্ট অফিসের একটি বড় ক্যালেণ্ডার ছাড়া দেওয়ালে আর কিছুই নেই। মাথার ওপরে লোহার কড়ি বরগায় জং ধরেছে। দু-তিন জায়গায় শ্যাওলার দাগ দেখলে বোঝা যায়, বৃষ্টির সময় ছাদ চুঁইয়ে জল গড়ায়। একটি পঁয়তাল্লিশ ইঞ্চির পুরনো পাখা, ডি সি কারেণ্টে ঘুরছে। ষাট পাওয়ারের একটি নগ্ন বাল্‌ব ঝুলছে টেবিলের সামনে।

"ঐ ইংরেজি সাপ্তাহিকে তোর লেখাটা পড়লাম।" সীতানাথ টেবিলের দিকে একবার দেখে নিলেন, " 'দ্য পিসফুল রেভ্যুলিউশান অ্যাণ্ড ক্লাস স্ট্রাগল'। তোর

সঙ্গে অবিশ্যি আমি সব জায়গায় একমত নই। আঠারো শো অষ্টআশিতে, ফয়েরবাখের সমালোচনায় এঙ্গেলস-এর একটা ব্যাখ্যাকে ধরে তুই নিরস্ত্র শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের কথাটা এমন ভাবে লিখেছিস, যেন তা গান্ধীবাদের সঙ্গে মিশে যায়। অ্যাবসার্ড। আসলে এঙ্গেলস্ কী বলেছেন ? একটা পুরনো ভেঙে পড়া অবস্থার মুখোমুখি একটা নতুন শক্তিশালী বাস্তব, শান্তিপূর্ণভাবে তখনই আসতে পারে, ঐ মুমূর্ষু পুরনো যদি বাধা না দেয়। দিলে, নতুন শক্তিকে বলপ্রয়োগ করতেই হবে। কিন্তু নতুনকে শান্তিপূর্ণভাবে আসতে দিচ্ছে কে ?”

সুদীপ হেসে মাথা নাড়লো, “কেউ না। একমাত্র এ রাজ্যের শাসকরাই ভাবতে পারেন, দিল্লি কিছু প্রতিবন্ধকতাব সৃষ্টি করলেও, সংসদীয় পথে, নির্বাচনের মারফত শান্তিপূর্ণ উপায়ে ওঁদেব দিল্লির তখ্ত ছেড়ে দেবে। তবে পাশাপাশি বিপ্লবের কথাটাও বলে যেতে হবে। সে যাক্ গে, আমি কিন্তু বলিনি, পুরনো পচা গলা শক্তি নতুনকে শান্তিপূর্ণভাবে আসতে দেবেই। তবে যদি দিতো, বা দেয়, পুরনো তার নিজেকে বিলীন হতে দেবার মতো সুবুদ্ধিটুকু যদি বজায় রাখতে পারতো, বা পারে, তাহলে পৃথিবীর ইতিহাস অন্যরকম হতো। কিন্তু পুরনোর বলপ্রয়োগে বাধা দেবার সামনে, সম্পূর্ণই অহিংস আর অসহযোগিতা, একটা অবিশ্বাস্য বিপরীত পন্থাও যে কী পরিমাণ শক্তি নিয়ে দাঁড়াতে পারে, তার প্রমাণও আমরা পেয়েছি। আর সেই জন্যই আমি ঐ মন্তব্যটা করেছি, 'যে মানুষ ইতিহাসের স্রষ্টা, ভবিষ্যতে সেই মানুষ পৃথিবী থেকে হয়তো বলপ্রয়োগকে সম্পূর্ণ লুপ্ত করে দিতে পাবে। অথবা ইতিহাসের স্বাভাবিক গতিতেই বলপ্রয়োগ লুপ্ত হয়ে যাবে।' তবে সেটা কখনো শেষ কথা হবে না। কিন্তু 'গ্রেট সোওল'-কে আমি কোনো রকম বৈজ্ঞানিক বিচারে সমর্থন করিনি। তবে তাঁর অহিংসার অপরিমেয় শক্তিকে আমি শ্রদ্ধা না করে পারিনে।”

“কিন্তু সে-শ্রদ্ধাটার মধ্যে কোনো ভাববাদী বিশ্বাসকে আরোপ করা, একজন বস্তুবাদীর পক্ষে ভণ্ডামি বলেই মনে হবে।”

“শ্রদ্ধার মধ্যে ভাববাদী বিশ্বাসটা আবার কী ? কোনো ব্যক্তির ঈশ্বরের উপলব্ধি যদি তাঁকে শক্তি দেয়, সেটাকে সমালোচনা করবো কেন ? বিশেষ করে, সেই শক্তি যদি মানবকল্যাণের কাজে লাগে তা হলে তাঁর ঈশ্বরকে নিয়ে আমার মাথাব্যথার কোনো কারণ থাকতে পারে না।”

“এখানেই তোর সঙ্গে আমার বিরোধ।”

“কেন ? আপনার তো বিরোধ থাকবার কথা নয়। মহাত্মার দেওয়া দুধের পাত্র থেকে হাঁসের মতো আমি দুধটুকু খাবো, জল পড়ে থাকবে।”

“এতোই সহজ ?” সীতানাথ হেসে উঠলেন, “জনসাধারণের ক্ষেত্রে কথাটা

খাটে না। গান্ধীজীর শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের মহৎ ডাকে সাড়া দিয়ে যে কোটি কোটি ভারতবাসী প্রাণ দিতে এগিয়ে এসেছিল, মনে রাখতে হবে, তাদের মধ্যে একটা ধর্মের প্রেরণাও ছিল।"

"কিন্তু ধর্মান্ধতা ছিল না। তাদের দেশপ্রেম সম্পর্কে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। খুব সচেতনভাবেই তারা দেশোদ্ধারের ডাকে বেরিয়ে এসেছিল। কিন্তু আমাদের দেশের শ্রেণী বিপ্লবের প্রবক্তারা কাদের কোথায় ডেকে নিয়ে চলেছেন ?"

"ঐ জিজ্ঞাসায় এসে তুই থেমেছিস, আর সেটা খুবই বিনীতভাবে। এটা আমার ভালো লেগেছে। কিন্তু তোকে নিয়ে আমার একটু গোলমাল লাগছে। লেনিন সম্পর্কে তোর বক্তব্যে কোনো গোলমাল নেই। কিন্তু গান্ধীকে মহৎ করতে গিয়ে, তুই নিজে ফেঁসে যাচ্ছিস মনে হচ্ছে। কোথায় যেন একটু ভক্তিভাব প্রকাশ পাচ্ছে। ওটা কিন্তু খুবই বিপজ্জনক।" সীতানাথ হেসে, তর্জনী তুলে সাবধান করলেন। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, "তোকে একটু চা খাওয়াই।"

সুদীপ লাফ দিয়ে তক্তপোষ থেকে নামলো। বাঁ হাতের কবজি তুলে ঘড়ি দেখালো, "সীতানাথজেঠু, আজ আর সময় নেই। আমি একদল নতুন শিল্পীকে কথা দিয়েছি, এ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এ ওদের ছবি দেখতে যাবো। আর চা খাবার ইচ্ছে থাকলে, এতক্ষণে আমি নিজেই স্টোভ ধরিয়ে ফেলতাম।"

"কিন্তু তোর সঙ্গে অনেক কথাই যে হল না।"

"অনেক কথার মধ্যে, আজ ওবেলা বাবা এসেছিলেন আমার ঘরে। কিন্তু দুজনেই এমন তর্কে মেতে গেলাম, বাবা তাঁর আসল কথাটাই বলবার সময় পাননি।"

"আসল কথাটা কী ?"

"তা জানিনে। বলেছিলেন, আমাকে কিছু বলার আছে।"

"সে কী! সৌরীন তো তোর সঙ্গে কথা বলে না ?"

"আমিও একটু অবাক হয়েছি।"

"কিন্তু তর্কাতর্কিটা কী নিয়ে হল ?"

"নতুন কিছু নিয়ে নয়, সবই পুরনো। তবে বাবা আজ একটি কথা শোনালেন। বললেন, পরিবর্তিত পরিস্থিতি আমি বুঝতে পারিনে বলেই, ওঁদের বুঝতে ভুল করছি।" সুদীপ সীতানাথের চোখের দিকে তাকিয়ে হাসলো।

সীতানাথও ঘাড় ঝাঁকিয়ে হাসলেন, "পরিবর্তিত পরিস্থিতি! হুঁ! খুবই জরুরি আর দরকারি কথা। সৌরীনদের যে-পরিবর্তিত পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে চলতে হচ্ছে, তাতে বর্তমানে ওদের কর্ম-কৌশল আর ভূমিকার মধ্যে কোনো ত্রুটি নেই।

সেটাই বলতে চাইছে বোধ হয়?"

"হতে পারে।" সুদীপ হেসে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

সীতানাথও সেদিকে এগোলেন, "মুন্নার খবর কী?"

"আজ সকালে এসেছিল।" সুদীপ দরজার সামনে দাঁড়ালো, "এ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস্ থেকে ওদের বাড়ি যাবো। ওবেলা বাবা আসায়, ও চলে গেছলো।"

সুদীপ চৌকাঠের বাইরে গিয়ে, স্যাণ্ডেল পায়ে গলিয়ে নিল, "যাচ্ছি।"

"আবার কবে আসবি?" সীতানাথও দরজার বাইরে এলেন।

"যে-কোনো দিন, সন্ধের পর!" সুদীপ সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

সীতানাথও এগোলেন, "কিন্তু মনে রাখিস, ভক্তিভাবের সেই বিপজ্জনক দিকটা মোটেই ভালো নয়।"

"মনে রাখবো।" সুদীপ মুখ ফিরিয়ে হাসলো। সিঁড়িতে পা বাড়ালো।

সীতানাথ এগিয়ে এলেন, "মুন্নাকে অনেকদিন দেখিনি। একটু দেখতে ইচ্ছে করে।"

"কিন্তু ওর সে-ইচ্ছে নেই।" সুদীপ সিঁড়ির কয়েক ধাপ নেমে মুখ ফিরিয়ে তাকালো। এখন ওর মুখের হাসিতে বিষণ্ণতা নেমে এসেছে, "আপনি তো শত্রু।"

সীতানাথ ঘাড় ঝাঁকিয়ে হাসলেন, "হুঁ।"

সুদীপ নেমে গেল।

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা। সুদীপ একটা ঘিঞ্জি পাড়ার মধ্যে ঢুকলো। রাস্তার বাতিগুলো তেমন জোরালো না। রাস্তাটা মাঝারি চওড়া। কিন্তু সরু চওড়া, একতলা থেকে চারতলা, বাড়িগুলোর নিচের তলায় নানা রকমের দোকানগুলোর আলো বেশ চড়া। কিন্তু পাকা বাড়িগুলোর মাঝে মাঝেই, বেশ কিছু মাটির বা টিনের বাড়ি, ও বস্তি। রাস্তার ওপরে বাচ্চারা খেলা করছে। মেয়েরা বসে গল্প করছে। এ রাস্তায় গাড়ি চালাতে ভয় লাগে। রাস্তাটা যেন রাস্তা না। খেলা আর আড্ডা মারার জায়গা।

সুদীপ খুব সাবধানে, জোরে হর্ন বাজাতে বাজাতে এগিয়ে গেল। বেশ কিছুটা যাবার পরে, বাঁয়ে বাঁক নিল, আরও কম চওড়া একটা রাস্তা। এ রাস্তাটাও সেইরকমই। বাড়িগুলো গায়ে গায়ে ঠাসাঠাসি করে দাঁড়িয়ে আছে। আর বাতিগুলো সেইরকম টিমটিমে। কিন্তু দোকানপাট নেই বললেই চলে।

সুদীপ আরও খানিকটা এগোবার পর, বাঁ দিকে একটা খোলা জায়গা পেলো।

এইটাই আসলে ওর গন্তব্য স্থল, এবারে ও গাড়িটাকে সোজা খালি পোড়ো জায়গায় ঢুকিয়ে দিল। খালি পোড়ো জমিটা জনশূন্য ছিল না। বিশেষ করে মেয়েরাই কোথাও কোথাও বসে গল্প করছে। পাড়ার পাকা বাড়িগুলোর পিছনের বস্তির বাসিন্দা ওরা। বেলা পড়ে গেলেই, ওরা এই পোড়ো জায়গায় এসে হাত পা ছাড়িয়ে বসে।

সুদীপ গাড়ির এঞ্জিন বন্ধ করে, চাবি হাতে নিয়ে, নেমে এলো। জানালার কাচ তুলে, দরজা বন্ধ করে, বাইরে থেকে চাবি দিয়ে লক করলো। খোলা জায়গাটার চার পাশে একবার তাকালো। কলকাতার এ অঞ্চলে এরকম একটা জায়গা খালি পড়ে থাকার কথা না। সুদীপ শুনেছে, জমিটার মালিকানা স্বত্ব নিয়ে নানারকম জটিলতা আছে। খোলা জমিটার তিন দিকে বাড়ি। এক দিকে রাস্তা। ভিতরের ধারে ধারে গজিয়েছে কিছু জংলি গাছ। দিনের বেলা পাড়ার ছেলেরা খেলা করে। বছরের একটা সময় কয়েকদিনের জন্য উৎসবে মেতে ওঠে। পাড়ার একটা ক্লাব কোর্ট থেকে লিখিত অনুমতি নিয়ে প্রত্যেক বছর দুর্গা পুজো করে।

সুদীপ রাস্তায় ফিরে এলো। অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস্ থেকে ও সোজা এখানে এসেছে। সামনের দুটো বাড়ি পেরিয়ে, বাঁ দিকে জয়তীদের বাড়ি। আসলে সুদীপের পাড়াটা এ পাড়ার দক্ষিণে, বেশ কাছে। বলা যায়, একই লোকালিটির মধ্যে। তফাতের মধ্যে, এ পাড়াটা সুদীপদের পাড়ার তুলনায় অনভিজাত। কিন্তু অনেক পুরনো পাড়া হওয়া সত্ত্বেও, এখনও এখানে বস্তি রয়ে গিয়েছে। পাড়ার অধিবাসীরা অধিকাংশই মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত। জয়তীদের বাড়ির তিন তলার ছাদে উঠলে, সুদীপদের বাড়ি বাগান দেখা যায়। জোরে ঢিল ছুঁড়লে বাড়িতে গিয়ে পড়তে পারে। কিন্তু আসতে হলে একটু ঘুরে আসতে হয়। সোজাসুজি আসার রাস্তা নেই।

সুদীপ জয়তীদের বাড়ির সামনে এসে, উঁচু রকের ওপর উঠলো। ভিতরে ঢোকার দরজাটা খোলাই ছিল। একতলাটা ভাড়া দেওয়া আছে। দোতলায় সপরিবারে থাকেন জয়তীর বৈমাত্রেয় দাদা। তিন তলায় জয়তীরা। বিধবা মা, জয়তী, ওর ছোট ভাই সুশীল। সুশীল কলেজে পড়ে। জয়তীর ওপরে এক দিদি। বিবাহিতা। শ্বশুরবাড়ি দিল্লিতে। জয়তীর বৈমাত্রেয় দাদা আলাদা থাকলেও, বিমাতা আর ভাই-বোনদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক বজায় রেখেছেন।

জয়তীর বাবার ছিল ওষুধের দোকান। ছিল মানে, এখনও আছে। দোকান বেশ বড়, ব্যবসাও খুব ভালো। প্রধানতঃ বৈমাত্রেয় দাদা শিবনাথই সব দেখাশোনা করেন। জয়তীর মাও প্রায়ই গিয়ে বসেন। দোকানের আয় কিছু কম

না। সমান ভাগাভাগি করে, দুটি পরিবার বেশ সচ্ছল ভাবেই চলে। শুধু চলে না। উভয় পরিবারের জমার অংক কিছু কম না। তবে, বাবার আমলের দোকানকে শিবনাথ অনেক আধুনিক করেছেন। মেডিসিন আর ড্রাগ ছাড়াও, আজকাল নানারকম মেডিকেটেড তেল ক্রিম প্রভৃতি রেখেছেন। ওষুধ কিনতে এসে হাত বাড়ালেই টফি চকোলেট মেলে। রবিবার ব্যতিরেকে, রোজই বিকেলে, ছোট চেম্বারে ডাক্তার বসেন। রুগী দেখেন।

সাবেকি ধরনের বাড়ি। সিঁড়িগুলো উঁচু। সিঁড়িতে আলো ছিল। সুদীপ তিনতলায় উঠে, বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়ালো। দরজার ফ্রেমে কলিং বেলের বোতাম টিপলো। কয়েক সেকেণ্ড পরে দরজা খুলে দিল সুশীল। ডাকনাম সকলেরই উদ্ভট আর অদ্ভুত হয়। সুশীলের ডাকনাম ভুচে। অনেকটা জয়তীর মতোই দেখতে। গড়ন সেই রকমই দীর্ঘ। কিন্তু সুশীল এখন জয়তীর মাথাও ছাড়িয়ে গিয়েছে। পাজামা আর হাওয়াই শার্ট ওর গায়ে। সুদীপকে দেখে হাসলো, "আসুন ছুবুদা।"

সুদীপ হাসলো। ভিতরে ঢুকলো। সুশীল দরজা বন্ধ করে ফিরে দাঁড়ালো, "ছোড়দি একটু বেরিয়েছে। আটটার মধ্যে এসে পড়বে।"

"কাকীমা কোথায়?" সুদীপ বাইরের ঘর থেকে ভিতরের আর এক ঘরে পা দিল। সুশীল পিছনে পিছনে এলো, "মা বোধহয় রান্না ঘরে।"

সুদীপ যে-ঘরে দাঁড়িয়েছিল, সে-ঘরেই খাবার টেবিল। পাশেই রান্না ঘর। ঘরে আলো জ্বলছিল। রান্নাও যে হচ্ছিল, টের পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু সুধা অন্য দরজা দিয়ে খাবার ঘরে ঢুকলেন। চওড়া কালো আর শাদা শাড়ি আর শাদা জামা তাঁর বসন। ফরসা, দোহারা চেহারা। বয়স প্রায় সুদীপের মায়ের মতোই। মাথায় ঘোমটা নেই। চুল এখনও আশ্চর্য রকম কালো এবং ঘাড় থেকে তুলে, খোঁপা জড়ানো। সুদীপকে দেখে ওঁর চোখে মুখে উজ্জ্বল হাসি ছড়িয়ে পড়লো, "এসো ছুবু। মুন্না যেন কোথায় বেরুলো। ফিরবে এখনই। তুমি দক্ষিণের বারান্দায় বসবে? না, মুন্নার ঘরে?"

"এখন তো শুক্লপক্ষ চলছে।" সুদীপ অন্য ঘরের দিকে পা বাড়ালো, "আজ বোধহয় একাদশী বা দ্বাদশী—"

সুধা মাথা নাড়লেন, "দ্বাদশী। কাল একাদশী গেছে।"

"আমি বরং একটু ছাদে গিয়ে বসি।" সুদীপ পাশের ঘরে না দাঁড়িয়ে, দক্ষিণের বারান্দার দিকে পা বাড়ালো।

সুশীল অন্য ঘরে চলে গেল। সুদীপ দক্ষিণের বারান্দায় গেল। ডান দিকে ঘর। বাঁ দিকে বারান্দা, বেশ খানিকটা চওড়া। অনেকটা খোলা, ছোটখাটো

ছাদের মতো। নিচেই একটা ঘর আছে। বাড়িটা এক এক সময়, একটু একটু করে তৈরি হয়েছিল। কোনো নকশা মেনে তৈরি হয় নি। করপোরেশনের অনুমোদনও ছিল না। পরে সে-সব মেটাতে হয়েছে। বারান্দার বাঁ দিকে চওড়া কাঠের সিঁড়ি ছাদের ওপর উঠে গিয়েছে। সিঁড়ির এক পাশে রেলিং। সুদীপ বারান্দায় দাঁড়িয়ে সুধার দিকে তাকালো। সুধা হেসে ঘাড় ঝাঁকালেন, "যাও, তুমি ছাদে গিয়ে বস। চা বা কফি, কী খাবে?"

"চা। পাত্‌লা লিকার—"

সুধা সশব্দে হেসে উঠলেন, "ওটাও তোমাকে বলতে হবে নাকি? সাবধানে উঠো।"

সুদীপ কাঠের সিঁড়ি দিয়ে ছাদে উঠলো। সিঁড়ির ডান দিকে রেলিং না থাকলে, ছাদে ওঠা বিপজ্জনকই বটে। সুধার গলা আবার শোনা গেল, "মেনকাকে দিয়ে একটা শতরঞ্চি বা মাদুর পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

"দিন।" সুদীপ তখন প্রায় ছাদে পা দিয়েছে।

ছাদের এদিকটায় আলসে নেই। বাকি তিন দিকেই আছে। গায়ে গায়ে বাড়ি। এ বাড়ির দু'পাশে দোতলা বাড়ি। সেখানে ছাদে কেউ থাকলে, সুদীপকে দেখতে পাবে না। দক্ষিণ দিকে একটা ছোট ডোবা, গোটা কয়েক গাছ। কিছু টালির ঘর। সেগুলোকে ঘিরে আছে একতলা দোতলা কিছু পাকা বাড়ি। সেই সব বাড়ির জানালা দরজার আলোতেই চোখে পড়ে, জলের ডোবা, গাছপালা, টালির ঘর। এখনও কলকাতার বুকে ঐ রকম ডোবা গাছপালা ইত্যাদি থাকতে পারে, বাইরে থেকে বোঝা যায় না। মাঝখানের ঐ এলাকাটায় গরীব মানুষদের বাস। অথচ ঐ এলাকাতেই নানা ধরনের অপরাধের ঘটনা ঘটে। দুর্গত দরিদ্র মানুষদের অসহায়তার সুযোগ নেয় অপরাধীরা।

মেনকা কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে এলো। বিশ-বাইশ বছরের মেয়ে। দ্বাদশীর চাঁদের আলোয় সবই দেখা যাচ্ছে। বাতাস নেই। গরমও লাগছে না। মেনকা সুদীপের দিকে তাকালো, "শতরঞ্চিটা কোন্‌খানে পাতব?"

"উত্তর দিক ঘেঁষে পাতো।" সুদীপ পশ্চিম দিকের আলসেয় হেলান দিয়ে, পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই বের করলো। প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরালো।

মেনকা নেমে গেল। সুদীপ ওদের বাড়িব চিলেকোঠাটা চিনতে পারছে না। ছাদের ওপর থেকে গোটা তিনেক মাল্‌টি স্টোরিড বিল্ডিং দেখে মনে হয়, ওগুলো খুব কাছেই, আসলে তেমন একটা কাছে না। সুদীপ সাধারণত ছুটির দিনেই জয়তীদের বাড়িতে আসে। প্রায় নিয়মিত। অনিয়মিত অন্যান্য দিনও

আসে। তবে ওর আসাটা সন্ধের পরেই বেশি ঘটে। জয়তীও যায় ওদের বাড়িতে। দিনের বেলায় বেশি। কেবল সুদীপের কাছে যায় না। বুবুর কাছেও যায়। বুবুর সঙ্গে ওর বন্ধুত্বের সম্পর্ক। সুদীপ বাড়ি না থাকলেও, জয়তী বুবুর কাছে যায়। যেমন বুবু না থাকলে, ও সুদীপের কাছেও যায়। বুবুর সঙ্গে ও হেসে চেঁচিয়ে কথা বলে। সুদীপের সামনে ও যেন কেমন শান্ত হয়ে যায়। তেমন প্রগল্‌ভ হতে পারে না। অথচ ওর আবেগটা টের পাওয়া যায়। আসলে সুদীপকে ও প্রথম থেকেই একটা শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছে। এবং সুদীপ যে ওকে ভালবাসে, সেটা ওর কাছে যেন অনেকটা অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যের মতো। যেন একটা কৃতজ্ঞতাবোধ রয়েছে সেই ভালবাসায়। সেই কারণেই, মনে হয়, সুদীপের প্রতি ভালবাসায় ওর কোথাও যেন একটা আড়ষ্টতা আছে। কখনও কখনও সেই আড়ষ্টতা টের পাওয়া যায়। আবার কোনো কোনো সময় মনে হয়, আদৌ কোনো আড়ষ্টতাই নেই। ঘন নিবিড় সান্নিধ্যের আবেগময় মুহূর্তগুলো যেন চিরকালের মতো ধবে রাখতে চায়।

জয়তীর জগৎটা দুভাগে বিভক্ত। একটা ওর পার্টি। আর একটা সুদীপ। কিন্তু ওকে যদি কোনো কারণে দুটোর কোনো একটা ত্যাগ করতে হয়, তা হলে ও সুদীপকেই ত্যাগ করবে। এবং তার একমাত্র কারণ হবে, সুদীপ যদি প্রকাশ্যে পার্টির বিরোধিতা করে। সুদীপের তত্ত্বজ্ঞান বা শিক্ষার প্রতি ওর শ্রদ্ধা গভীর। পুরুষ হিসাবে, সুদীপ ওর কাছে আদর্শ। কিন্তু পার্টি যা-ই করুক, ভুল বা অন্যায়, সেটাকে তুমি নিজের পরিবারের বিষয় বলে গণ্য করো। যে-পরিবারকে তুমি কখনও ত্যাগ করবে না। তোমার যুক্তি বুদ্ধি জ্ঞান, সব পার্টিকে উৎসর্গ করো। জয়তীর মনোভাব অনেকটা এইরকম।

মেনকা আবার এলো। ওর হাতে চায়ের কাপ। চাঁদের আলোয় ওর মুখ প্রায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ও সুদীপের কাছ থেকে কয়েক হাত দূরে দাঁড়ালো, "চা কোথায় দেব?"

"এখানেই দাও।" সুদীপ চওড়া আলসের ওপর হাত রাখলো।

মেনকা আলসের ওপর চায়ের কাপ রেখে সিঁড়ি ভেঙে নেমে গেল। সুদীপ সেদিকে তাকিয়ে দেখলো। ওর দৃষ্টি আরও দক্ষিণে সম্প্রসারিত হল। সেই গাছপালা, টালির এক গুচ্ছ ঘর। ডোবার জল দেখা যায় না। চারপাশের আলোর মধ্যে ওখানটা অন্ধকার। গাছের ঝুপসি ঝাড়ে কয়েকটা জোনাকি টিপ টিপ জ্বলছে। ঐখানেই সেই নারকীয় ঘটনা ঘটেছিল। একটা না। দুটো ঘটনা। একটা ঘটনা ঘটেছিল উনিশশো ছিয়াত্তরের গোড়ায়। আর একটা সাতাত্তরের শেষে।

এই সেন পরিবারে, অতীতে কোনো কালে, রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটেনি। জয়ন্তীরা কায়স্থ সেন। কলকাতায় ওদের চার পুরুষের বাস। প্রথম পুরুষ এসেছিলেন যশোহর থেকে। জয়ন্তীর বাবা নিজের ব্যবসায় উন্নতি করে এ বাড়ি তৈরি করেছিলেন। বংশেব অন্যান্যরা কলকাতার নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে।

উনিশশো ছিয়াত্তরে জয়ন্তী কলেজে পডতো। তার দু'বছর আগে ওর বাবা মারা গিয়েছিলেন। জয়ন্তী তখন রাজনীতির ধারেকাছে ছিল না। কলেজেও রাজনীতি করতো না। ও ছিল খুবই হাসিখুশি দীপ্তিমতী মেয়ে। ওর স্বাস্থ্যে ছিল একটা ঔদ্ধত্য। অনেক মেয়ের মধ্যে ওকে চোখে না পড়ে উপায় ছিল না। ওর কথাবার্তা ছিল এমন স্পষ্ট, আর এত সহজ স্বাভাবিক ছিল ওর আচরণ, অনেক সময স্বাস্থ্যের ঔদ্ধত্যেব মতোই, ওকে উদ্ধত মনে হতো। ওর ভিতরে বাইরে কোনো মালিন্য ছিল না। এবং কোথাও মালিন্যের ছায়া দেখলে, ও সেখান থেকে সরে থাকতো।

উনিশশো ছিয়াত্তবে ওর বয়স প্রায় উনিশ-কুড়ি। কোনো ছেলের সঙ্গে ওর কখনও সেই ঘনিষ্ঠতা ঘটে নি, যাকে বলা যেতে পাবতো, প্রেম। তবে কলেজে ছেলেদের মধ্যে কেউ কেউ ওব বন্ধু ছিল। খুব সাধাবণ বন্ধুত্ব। পাড়াব অনেক ছেলের সঙ্গেই ওর পরিচয় ছিল। বিশেষ যারা ওব সমবয়সী। মেয়েদের সঙ্গে তো মেলামেশা ছিলই। সব পাডাতেই কিছু ছেলে থাকে, যারা সমাজের নানা অন্ধকাবের শিকার। তাদের মধ্যে কেউ কেউ রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গেও যোগাযোগ রাখতো। তাবা ছিল উদ্ধত প্রকৃতির। প্রতিবেশীদের প্রতি তাদের কোনো সম্মান বা সম্ভ্রম বোধ ছিল না। তারা নিজেদের মধ্যে মারামারি করতো। খুনোখুনিব ঘটনাও দু-একটা ঘটে গিয়েছিল। পাড়ার সব ভদ্র পরিবারই এদের এড়িয়ে চলতো। চিরকালই চলে। এবং মনে মনে একটা ভয়ও থাকতো। সমাজবিরোধী মস্তান বলতে যা বোঝায়, এরা তাই। দিনেব বেলাও এদের প্রকাশ্যে মাতলামি করতে দেখা যেতো। অবিশ্যি এখনও দেখা যায়। রাস্তায় যে কোনো মেয়ে বা মহিলাকেই এরা শুনিয়ে শুনিয়ে খারাপ মন্তব্য বরাবর করে আসছে। জয়ন্তীকেও ওরা অনেক নোংবা প্রস্তাব জানিয়ে খারাপ কথা বলতো। জয়ন্তী বরাবরই রুখে দাঁড়িয়েছে, এবং 'প্রত্যেকটি শুয়োরের বাচ্চার মুখ জুতো দিয়ে ভেঙে দেব' অথবা, 'সাহস থাকলে এগিয়ে আয় কোনো কুত্তার বাচ্চা' অনায়াসেই রেগে গিয়ে বলেছে।

জয়ন্তীর মেয়ে বন্ধুরা ভয় পেতো। ওকেই বলতো, "মুন্না তুই কেন মুখ খুলতে যাস্! ওরা যা খুশি বলুক না, তাতে কী আসে যায়?"

জয়ন্তী মেনে নিতে পারতো না। ওদের এত সাহস কেন হবে? ও বাড়িতে

দাদাকে অনেক বার বলেছে, পুলিশকে জানাতে। শিবনাথ নিজেকে শান্তিপ্রিয় মানুষ ভাবতেন। পাড়ার সব ভদ্রলোকেরাই নিজেদের শান্তিপ্রিয় মানুষ ভেবে থাকেন। সেই ছিয়াত্তরেই হোক, আর এই তিরাশিতেই হোক, ভদ্রলোকেরা মস্তান ছোটলোকদের যেন মন থেকে ত্যাগ করেই রাখেন। কারণ তাঁরা শান্তিপ্রিয়। মাঝে মাঝেই, কোনো অঞ্চলে যখন খুব বাড়াবাড়ি হয়, সারাদিন বোমাবাজী, গুলি ছোঁড়াছুঁড়ি, দু-একটা খুন ঘটে যায়, তখন খবরের কাগজে সংবাদ বেরোয়। অবিশ্যি এরকম সংবাদ রোজই বেরোয়। আর পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে সমালোচনা করা হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারাও প্রতিবাদ করেন। ভদ্রলোকেরা হঠাৎ দুঃসাহস দেখিয়ে, থানায় অভিযোগ করতে ছোটেন। আজকাল অবিশ্যি চেহারা বদলাচ্ছে। বিভিন্ন দলের যুবকেরা থানা ঘেরাও করে। পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানায়। পুলিশ ঠিক কী বলে, বোঝা যায় না। বেচারিদের কী করবার আছে? তবে কর্তব্যের খাতিরে কিছু তো করতেই হয়। সেই কিছু করার মধ্যে, তাদের প্রথমেই বিবেচনা করতে হয়, কী করলে, তাদের এই বর্তমান সময়ের অসাধারণ ভাবমূর্তি বজায় থাকবে। আর এই ভাবমূর্তি বজায় রাখতে গেলে, তাদের ভাবতেই হয়, কখন কার হয়ে কী কাজ করতে হবে। তবে, তাদের সব থেকে বড় ভূমিকা, রাজনৈতিক কর্তা-ব্যক্তিদের উপদেশ নীরবে শোনা, এবং যথাসময়ে তাঁদের নির্দেশ পালন করা। সমাজবিরোধীদের সঙ্গে তাদের সব সময় সম্পর্ক রেখে চলতেই হয়। কারণ, প্রত্যেক চিন্তাশীল ভদ্র নাগরিকের বোঝা উচিত, সম্পর্ক না রাখলে ওদের শাসন করা যায় না।

জয়তীর দাদা শিবনাথ কোনো দিনই থানায় অভিযোগ জানাতে যাননি। অন্য কোনো ভদ্রলোকও যান নি। শেষ পর্যন্ত জয়তী অতিষ্ঠ হয়ে, নিজেই একদিন থানায় গিয়েছিল। রীতিমতো ডায়রি করেছিল। ডায়রিতে দুজনের নামও লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। পরের দিন, পুলিশ পাড়ায় একবার টহল দিয়ে গিয়েছিল।

জয়তী যে ঐরকম একটা কাণ্ড করেছিল তার কারণ এই না, ও সমাজের কোনো উপকার করবার মন নিয়ে গিয়েছিল। ও আর নিজের অপমান সহ্য করতে পারছিল না। ও জানতো, বড় জোর আর একটা বছর। তারপরে দিদির মতোই ওর বিয়ে হয়ে যাবে। এ বিশ্বাস মনের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও, ও থানায় না গিয়ে পারেনি। ও চেয়েছিল, নোংরা জানোয়ারগুলো যেন অন্ততঃ ওর পিছনে আর না লাগে।

জয়তীর থানায় যাবার সাত দিন পর, শীতের ছোট বেলায় দ্রুত অন্ধকার নেমে

এসেছিল। তখন লোডশেডিং-এর বিপর্যয় ছিল না। অথচ ওদের পাড়ার রাস্তার একটা আলোও জ্বলেনি। সময় তখন সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে ছ'টা। জয়তী কলেজ থেকে বেরিয়ে ওর এক বান্ধবীর বাড়ি গিয়েছিল। বান্ধবীর বাড়ি থেকে ফেরবার সময় পাড়ার বাতিহীন অন্ধকার রাস্তায়, সন্ধ্যা সাড়ে ছটায়, কয়েকটি শক্ত হাত ওকে শূন্যে তুলে নিয়েছিল। মুখে চাপা পড়েছিল শক্ত হাত। মুখ ছিল নিচু করা। ওকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, টের পায় নি। হাত পা ছুঁড়েছিল। গোঁ গোঁ শব্দ করেছিল গলা থেকে।

জয়তীর গলায় একটা সোনার সরু চেন ছিল। হাতে ছিল ঘড়ি। কানে দুটো সোনা বাঁধানো পাথরেব ফুল। ও ভেবেছিল, সেগুলো নেবার জন্যই ওকে তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। কিন্তু কয়েক মিনিট পরেই ওকে শুইয়ে দেওয়া হয়েছিল ভেজা ঘাস ও কাদামাটির ওপরে। মুখে শক্ত করে বাঁধা হয়েছিল মোটা কাপড়। শাড়ি আব জামা আসুরিক শক্তিতে ছিঁড়ে ফালা ফালা করা হয়েছিল। পা থেকে মুখ পর্যন্ত কামড়ে চেটে চটকে, এবং একই সঙ্গে দুই জংঘার মাঝখানে দুঃসহ আঘাতে আঘাতে, ও জর্জরিত হয়েছিল। যন্ত্রণায় গোঙালেও, কথা বলতে পারেনি। অজ্ঞান হবার আগে পর্যন্ত যে-কটি কথা কানে এসেছিল, তা হল, 'হারামজাদী, এব পরে তোকে থানায় বড়বাবুর কাছে দিয়ে আসব।"...."জলে বাস করে শালী তুই কুমিরের সঙ্গে....।"

জয়তী জ্ঞান হারাবার আগে, স্পষ্ট অনুভব করেছিল, ওকে তিন জন ছিঁড়ে খুঁড়ে শেষ করছিল। এবং সেই অন্ধকারে ও দুজনকে চিনতেও পেরেছিল। পরে ওর যখন জ্ঞান ফিরে এসেছিল তখন নিজেকে আবিষ্কার করেছিল একটি নার্সিং হোমের বিছানায়। ও একটা চিৎকার করেছিল, "না...." তারপরে আবার অজ্ঞান। পরে যখন ঠিক মতো জ্ঞান ফিরেছিল, ও আর চিৎকার করেনি। কাঁদেনি। মায়ের কাছ থেকে সব ঘটনা শুনেছিল।

জয়তীকে ওরা রেখে গিয়েছিল ওদের বাড়ির দরজার ভিতরে। নিচের ভাড়াটেরা প্রথম ওকে দেখতে পায়। শিবনাথ, সুধা নেমে আসেন। তৎক্ষণাৎ তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়, পুলিশকে কোনো খবর নয়। ট্যাক্সি ডেকে ওকে নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। নিচের তলার ভাড়াটেরা পাড়ায় কারোকে কিছু বলেনি। তিন মাস পরে জয়তী বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। ওদের বাড়িতে একটা সাংঘাতিক আতঙ্ক সব সময়েই যেন সবাইকে তটস্থ করে রাখতো।

জয়তী ঠিক করেছিল, ও আর রাত্রে কোনো দিন বেরোবে না। পুলিশকে না জানানোর ব্যাপারটা ওর কাছে উপযুক্ত বলে মনে হয়েছিল। ও অনেক শান্ত হয়ে গিয়েছিল, এবং সেই সব ধর্ষণকারীদের সামনে দিয়েই ও আবার কলেজে যেতে

আরম্ভ করেছিল। যাবার সময় এমন একটা ভাব করতো, যেন সেই রাত্রের ব্যাপার ওর কিছু মনে নেই। ওদের যে জয়তী মোটেই সন্দেহ করে না, সেটা শান্ত গম্ভীর আচরণে বুঝিয়ে দিতো। কেবল, ওর পরিবর্তন ঘটেছিল কলেজে। ও কলেজে বামপন্থী ইউনিয়নে যোগ দিয়েছিল। সেই সূত্র থেকে, স্থানীয় পার্টির সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই ওর একটা বিশেষ যোগাযোগ ঘটে। ও নিয়মিত পার্টির কর্মীদের সঙ্গে মিশতে আরম্ভ করেছিল। শুধু পার্টি কর্মীদের সঙ্গে না, পার্টিকে ঘিরে যেসব দুঃসাহসী সমাজবিরোধী ছিল, ও তাদের সঙ্গেও হেসে কথা বলতো। এক বছরের মধ্যে, ও মহিলা সেলে ঢুকেছিল। পার্টি তখন ক্ষমতায় এসেছে।

জয়তী সকলের চোখের সামনে হয়ে উঠেছিল একজন জঙ্গী মহিলা কর্মী। পার্টির তরুণরা ওকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতো: এখনও তাই দেখে। ও ওর সিদ্ধান্তে যেমন অটল ছিল, তেমনি অস্থির হয়নি একটুও। খুব ধীরে ও ওর পথে এগিয়ে ছিল। প্রথম ও একজন তরুণ পার্টি কর্মীকে ওর দুর্ভাগ্যের কথা জানিয়েছিল। অবিশ্যি, তার কাছ থেকে কথা আদায় করে নিয়েছিল, সে কারোকে এ ঘটনার কথা বলবে না। তরুণ পার্টি কর্মীটি জানতে চেয়েছিল, কারা সেই লোক। জয়তী জানিয়েছিল। তরুণ পার্টি কর্মীটি স্বাভাবিকভাবেই জিজ্ঞেস করেছিল, জয়তী এর কোনো বিহিত চায় না?

চায়। জয়তী জানিয়েছিল। তরুণ সেই পার্টি কর্মীটিকে একদিন বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে, ও ওর সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছিল। সিদ্ধান্তটিকে কী পদ্ধতিতে কার্যকরী করতে হবে, তাও বলেছিল। তরুণ কর্মীটি একটি বিষয়ে আপত্তি করেছিল, "তুমি নিজের হাতে ওদের খতম করার দায়িত্ব নিও না।"

"কেন?"

"ওটা ছেলেদের কাজ।"

"আমি তা মানি নে।" জয়তী সজোরে মাথা নেড়েছিল, "কোনো কাজই ছেলে আর মেয়ে দিয়ে আলাদা করা যায় না। কিন্তু আমি তো একলা করতে চাইনে। একলা আমি পারবো না। তোমাদের সাহায্য চাই; আমাকে সাহায্য করো।"

তরুণ পার্টি কর্মীটি সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। জয়তী সেই সময়ে একটা ব্যাপার লক্ষ করেছিল। ওকে রাজনৈতিক দলের মধ্যে দেখার পর, সেই জানোয়ারদের দলটা যেন কেমন থমকে গিয়েছিল। তারা জানতো জয়তীর বাড়ি থেকে পুলিশকে ঘটনাটা জানানো হয়নি। ইজ্জতের ভয়েই জানানো হয়নি। এই দুর্বলতাটা তারা বুঝেছিল; তারই সুযোগ নিয়ে, জয়তীকে শুনিয়ে নানারকম

মন্তব্য করতে ছাড়তো না। তারা আগের মতোই বুক ফুলিয়ে চলতো। ধরেই নিয়েছিল, একটা মেয়ে তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস করবে না। কিন্তু জয়ন্তীকে রাজনীতি করতে দেখে, তাদের চোখে মুখে একটা জিজ্ঞাসু বিস্ময় ফুটে উঠেছিল। জয়ন্তী তা লক্ষ করেছিল। জয়ন্তীকে একলা দেখলেও, ওরা মন্তব্য করা বন্ধ করেছিল।

অন্যদিকে কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল। সময়টা সাতাত্তরের ডিসেম্বর। দলটা সন্ধ্যার পরে কোথায় যায়, বসে, সব খবরই নেওয়া হয়েছিল। জয়ন্তীদের বাড়ির উত্তর দিকের বাড়িগুলোর পিছনে, একটা সরু গলি আছে। সেই গলির একটা বাড়ির এক তলায়, দলটা রোজই সন্ধ্যা ছ'টা থেকে আটটা পর্যন্ত মদের বোতল নিয়ে বসতো। তারপরে বেরিয়ে যেতো। সেই বেরিয়ে যাওয়াটা ছিল ওদের শিকার ধরার কাজ। রাত্রি বারোটা-একটা নাগাদ আবার ওরা সেখানেই ফিরতো। একজন সেই ঘরে থাকতো। বাকি তিন জন চলে যেতো তাদের আস্তানায়। অথবা চারজনেই সেই ঘরে থেকে যেতো।

খবর নিয়ে দেখা গিয়েছিল, ছোট দোতলা বাড়িটার অন্যান্য বাসিন্দারা ভয়ে কিছু বলতে পারতো না। বাড়ির মালিক একটা ঘর ওদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল। ওদের একজনকে ভাড়াটে হিসাবে দেখাতে হতো।

আক্রমণের অসুবিধা ছিল একটাই। ওরা দরজা বন্ধ করে বসতো। ঐ অবস্থায় দরজায় ধাক্কা দিলেই, ওদের সজাগ হয়ে ওঠবার সম্ভাবনা। নিশ্চয় জানতে চাইবে, কে? একমাত্র পুলিশকেই ওরা প্রাণ ধরে বিশ্বাস করতো। দরজা আর জানালায় দু-একটা ছিদ্র ছিল। ঘরে দরজা বন্ধ করে মদ খাওয়া কোনো অপরাধের কাজ না। সুতরাং পুলিশকে ভয় পাবার কোনো কারণ ছিল না। দরজা জানালার ছিদ্র দিয়ে দেখে নেবার সুবিধা ছিল। তা ছাড়া, থানার সঙ্গে ওরা নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলতো। ওদের একমাত্র ভয়, ওদের শত্রু গ্রুপকে যারা ওদের ঐ পাড়া থেকে সরিয়ে দখল নিতে চাইতো। অথবা খুনের বদলা নিতে, শত্রুরা আচমকা এসে পড়তে পারতো।

জয়ন্তী সহ পাঁচজনকে নিয়ে ওদের টিম তৈরি হয়েছিল। স্থির হয়েছিল, রাত্রি আটটা নাগাদ যখন ওরা বেরোবার জন্য দরজা খুলবে, তখনই ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। রাত্রি আটটায়, শীতের দিনে এমনিতেই রাস্তাঘাট ফাঁকা হয়ে আসে। অনেকটা এলাকা জুড়ে অন্ধকার করে দেবার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। পালাবার বা বেঁচে থাকবার কোনো অবকাশই যাতে না পায়, আর সমস্ত কাজটা যাতে কয়েক মিনিটের মধ্যে শেষ করে দেওয়া যায়, তার জন্য একটি স্টেনগান, একটি অটো রাইফেল সংগ্রহ করা হয়েছিল। তা ছাড়া কিছু বোমা। বাইরের লোককে

ভয় দেখাবার জন্য ছোঁড়ার দরকার ছিল। যাতে কেউ কাছে না আসে। ভয়ে দরজা জানালা বন্ধ করে দেয়।

টিম মেনে নিয়েছিল, স্টেনগান জয়তীর হাতে থাকবে। ও প্রথম গুলি চালাবে। কোনো কারণে, ব্যর্থ হলে, অটো রাইফেল থেকে ফায়ার করা হবে। জয়তী স্টেনগান তুলে দেবে ওর পাশের লোকের হাতে। অবিশ্যি, জয়তীকে আগেই স্টেনগান চালাবার পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। টিমের একটা প্রস্তাব ছিল। জয়তী সাতাত্তরের উনত্রিশে ডিসেম্বর জিনস্ পরবে। জয়তী সেটা নাকচ করেছিল। শাড়ি পরেই ও কাজটা করতে পারবে, এ ভরসা ওর ছিল।

জয়তীদেব বাড়ির উত্তরে সেই সরু গলিতে যাবার একটি অধিকতর সরু গলি ছিল, ওদের পাড়ার ভিতর দিয়েই। সেই গলি দিয়ে ঢোকাই স্থিব হয়েছিল। এবং ফেরাও। গাড়ি একটা ছিল। সেটা রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল, জয়তীদের পাড়াতেই সেই ফাঁকা পোড়ো জায়গায়। আজ সুদীপ যেখানে গাড়ি পার্ক করেছে। জয়তী বাড়ি ঢুকে যাবে। বাকিরা গাড়ি নিয়ে যথাস্থানে চলে যাবে।

উনিশশো সাতাত্তরের ডিসেম্বর। জয়তী সকাল থেকে কিছু খায়নি। শরীর খারাপের অছিলা করেছিল। আসলে, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল। কাজ সফল না হওয়া পর্যন্ত মুখে কিছু দেবে না। শাবীরিক কোনো দুর্বলতাই ওকে গ্রাস করেনি। সারাদিনের মধ্যে, কয়েক বার বাবার ফটোর দিকে দেখেছিল। দূর থেকে মাকে লুকিয়ে দেখেছিল। আব ছোট ভাইকে। আসলে একটা চিন্তা ছাড়া ওর মাথায় আর কিছুই ছিল না। একটা উগ্র ঘৃণা আর ক্রোধে, ওর দাঁতে দাঁত যতো চেপে বসছিল, নিজেকে ও ততোই শান্ত রাখতে চেষ্টা করেছিল। ঠিক পৌনে আটটায় ও নিচে নেমে এসেছিল। গাড়িটা তখনই সেই ফাঁকা পোড়োয় ঢুকেছিল। আটটা বাজতে পাঁচ মিনিট আগে, একটা গোটা এলাকার শুধু রাস্তার আলোগুলো নিভে গিয়েছিল। তারপর···

সুদীপের চায়ের কাপ নিঃশেষ। ও আবার একটা সিগারেট ধরালো। আর তৎক্ষণাৎ চার পাশের আলো নিভে গেল। সমস্ত এলাকা অন্ধকারে ডুবে গেল লোডশেডিং। দ্বাদশীর জ্যোৎস্না যেন আরও উজ্জ্বল হবার অবকাশ পেলো চারদিকের চেহারা আমূল বদলে গেল। পলকেই জেগে উঠলো এক নতুন ছবি প্রথম প্রথম লোডশেডিং হলে, চারপাশ থেকে মানুষের হল্লা শোনা যেতো আবার আলো ফিরে এলেও হল্লা শোনা যেতো। আজকাল আর শোনা যায় না কলকাতার লোকদের সেই আচমকা হতাশা আর খুশি হবার দিন চলে গিয়েছে মনে নিয়েছে। অভ্যাস হয়ে গিয়েছে।

সুদীপ এরকম চাঁদের আলোয় কলকাতাকে আরও কয়েকবার দেখেছে। চাঁদের আলোয় বহু বিচিত্র ইমারতের শহরটাকে কেমন অবাস্তব আর রহস্যময় দেখায়। জ্যোৎস্না আর ছায়ার অন্ধকারে ঋজু, কৌণিক, সরল রেখা, কতগুলো কাটা কাটা ছিন্ন চিত্র। যে দু-চারটে গাছপালা দেখা যায়, সেগুলোকে গাছ বলে বিশ্বাস হয় না।

জয়তী কাঠের সিঁড়ির ওপর এসে দাঁড়ালো। জ্যোৎস্না ওর মুখ আর শরীরের নানা জায়গায় যেন টুকরো টুকরো লেগে আছে। ও সুদীপের দিকে এগিয়ে এলো, "দাঁড়িয়ে কেন? বসবে না?"

"বসবো।" সুদীপ জয়তীর মুখের দিকে তাকালো, "সাতাত্তর সালের উনত্রিশে ডিসেম্বর, এ পাড়ার রাত্রি আটটার ঘটনার কথা মনে পড়ছিল।"

জয়তী আলসের ওপর থেকে চায়ের কাপ ডিস নিচে নামিয়ে রাখলো, "পাঁচ বছরের পুরনো ঘটনা। চলো, শতরঞ্চিতে বসবে।"

"চোখে না দেখা, শুধু কানে শোনা সেই ঘটনা আমার কাছে কোনো দিন পুরনো হবে না।" সুদীপ ছাদের উত্তর দিকে গিয়ে শতরঞ্চির ওপর বসলো। "এমন কি চোখে না দেখেও, সেই লোকটাকে যেন আমি দেখতে পাচ্ছি, যে শেষ মুহূর্তে হাত জোড় করে তোমাকে বলেছিল, 'মুন্না, দোহাই মা কালীর, আমাকে মেরো না। সেই রাত্তিরে আমি ওদের সঙ্গে ছিলাম না।' কিন্তু তোমার হাতের স্টেনগান ওকে ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল। চারটে লোককে তুমি একলাই মেরেছিলে। অটো রাইফেল থেকে একটা গুলিও ছুঁড়তে হয়নি। সমস্ত ঘটনাটাই ঘটেছিল তোমাদের প্ল্যান মাফিক। কোথাও একটু এদিক-ওদিক হয়নি

জয়তী সুদীপের কাছ ঘেঁষে বসলো, "একেবারে হয়নি, তা নয়। পুলিশ কোথাও কোনো ক্লু খুঁজে না পেয়ে, শেষ পর্যন্ত আমার কাছে এসেছিল। জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল, আমি কিছু জানি কি না।"

"হ্যাঁ, তাতেই প্রথম বোঝা গেছিলো তোমার চরম লাঞ্ছনার ঘটনার কথা পুলিশ জানতো।" সুদীপ জ্যোৎস্নার আলোয় জয়তীর মুখের দিকে তাকিয়ে ওর একটা হাত নিজের মুঠোর চেপে ধরলো, "ওরা সন্দেহ করেছিল, ঐ চারজনের খতমের পেছনে তোমার হাত থাকতে পারে। তা নইলে পুলিশ শুধু শুধু তোমার কাছে আসতো না। কিন্তু ওরা তোমার কাছ থেকে একটি কথাও আদায় করতে পারেনি। ওদের সন্দেহ, সন্দেহই থেকে গেছলো। তবে, ওরকম একটা ঘটনা ঘটতে পারে, এ সম্ভাবনার কথাটা পুলিশ পাড়ায় রটিয়ে দিয়েছিল। কথাটা উঠেছিল পার্টির কানে। পার্টি তোমাকে গোপনে তলব করেছিল, যাচাই করেছিল সত্যি-মিথ্যে। পার্টিকে তুমি সব কথা খুলে বলেছিলে।"

জয়তী সুদীপের হাতটা টেনে নিল নিজের কোলে। ওর দৃষ্টি ছিল দূরের দক্ষিণে। জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত ওর অন্যমনস্ক মুখ, "হ্যাঁ। পার্টির কেউ কেউ আমার বিরুদ্ধে চার্জ এনেছিলেন, আমি প্রতিশোধ নেবার জন্য পার্টিকে ব্যবহার করেছি।"

"সৌরীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের মধ্যে একজন।" সুদীপ হেসে উঠলো।

জয়তী মুখ ফিরিয়ে সুদীপের দিকে তাকিয়ে হাসলো, "ওটা তুমি ভুলতে পারো না, না?"

"ভুলে যেতাম মুন্না।" সুদীপের মুখে এখন হাসি নেই। ওর চোখে মুখে আবেগ ফুটে উঠেছে, যা ওর গলার স্বরেও ধ্বনিত হল,"কিন্তু আমি জানি আমার সেই অতীতের গুরুকে, তিনি আজও তোমাকে তোমার প্রাপ্য সম্মান দিতে পারেন না। কারণ, তাঁর ভেতরে সেই রক্ষণশীল কুয়োর ব্যাঙটা রয়ে গেছে। তিনি ভুলতে পারেন না, তুমি একটা ধর্ষিতা মেয়ে। আমার মাও তাঁর থেকে অনেক উদার। মা তোমাকে প্রাণ থেকেই ভালবাসেন। তোমার সঙ্গে ডেকে কথা বলেন, কাছে বসিয়ে খাওয়ান। অথচ আমার বাবা, এখনো তোমার নামটাও উচ্চারণ করতে চান না। তোমার কথা বলতে গেলেই, 'ঐ সেই মেয়েটা' বলতে হয়। এই একটা ব্যাপারে, বুবুকেও বাবা হাত করতে পারেননি। বাবা কী করে ভুলে যান, তুমি যদি প্রতিশোধ তোলবার জন্য, পার্টিকে নিজের কাজে লাগাতে, তা হলে এই ছ' বছর তুমি পার্টিতে থাকতে না। বাবা কী করে ভুলে যান, তুমি পার্টির একজন অক্লান্ত কর্মী! আমি বিশ্বাস করি, তোমার চরম লাঞ্ছনা আর অপমানের জন্য, তুমি পার্টিতে এসেছিলে। আমাকে তুমি যে-কথাগুলো বলেছিলে, সে-সব কথা আমি ভুলিনি। মুন্না, তোমার মনে আছে সে-সব কথা?"

জয়তী অন্যদিকে তাকিয়ে ঘাড় ঝাঁকিয়েছিল, "হ্যাঁ, মনে আছে। আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, প্রতিশোধ নেবোই। পাড়ার আশেপাশে আরো মস্তান দল ছিল। প্রতিশোধ নেবার জন্য আমি তাদের কাছে যেতে পারতাম। কিন্তু তার ফল হতো আরো মারাত্মক। আমার সর্বস্ব জলাঞ্জলি দিতে হতো। তখনই ঠিক করেছিলাম, আমি রাজনীতি করবো। আর কোন্ রাজনীতি করবো, আমার টান কোন্ দিকে, তাও বুঝেছিলাম। এ সব নিয়ে আমি কারোর সঙ্গে একটা কথাও আগে আলোচনা করিনি। এসব চিন্তা আমার মনে আপনা থেকেই এসেছিল। সময়টাকে বুঝতে চেয়েছিলাম। তার আগে, উনসত্তর সাল থেকেই তো রাজনীতিতে রক্তের ঢেল্ খেল্ শুরু হয়ে গেছলো। এটাও সত্যি, রাজনীতি করা মানে, আমার প্রতিশোধেরও উপায় ছিল সেখানেই। প্রতিশোধ আমি নিয়েছি।

কিন্তু আজ পার্টির থেকে বড় আমার কাছে আর কিছু নেই।"

সুদীপ কথা বললো না। তাকিয়ে রইলো জয়তীর মুখের দিকে। জয়তী তাকালো সুদীপের দিকে। সুদীপের ধরা হাতটা ও বুকের কাছে চেপে ধরলো, "এক দিকে পার্টি, আর এক দিকে তুমি।"

"হ্যাঁ, আমরা দুজন দাঁড়িয়ে আছি, এপারে আর ওপারে।" সুদীপ তাকালো জয়তীর বুকের কাছে ধরা হাতের দিকে। ওর স্বরের গাম্ভীর্যে গভীরতা। "যে-পার্টির এপারে ওপারে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, আমাকে হয়তো আমার ব্যর্থ প্রত্যাশা নিয়ে মরতে হবে। কিন্তু এ পার্টির সঙ্গে আমি হাত মেলাতে পারবো না। মুন্না, আমার আরো কী মনে হয় জানো?"

জয়তী সুদীপের মুখের দিকে ওর জিজ্ঞাসু দু চোখ মেলে ধরলো। সুদীপের স্বরে হতাশার সুর, "মনে হয়, এ পার্টির আর কী-ই বা করার আছে? যে সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে, সংসদীয় নির্বাচনের রাস্তায় এ পার্টি তাব গন্তব্য পৌঁছুতে চাইছে, সেই গন্তব্যে তারা পৌঁছেই গেছে! এ ব্যবস্থায়, নির্বাচনে জয়ের জন্য যতো রকম বুর্জোয়া ছলচাতুরি, শ্রেণীশত্রুর সঙ্গে আপোস—সবই করতে হচ্ছে, এবং হবে বলে, যে-কোনো পথেই নিজেদের ভোটার সংখ্যা বাড়াবার চেষ্টাও চালিয়ে যেতে হবে। দক্ষিণপন্থী বুর্জোয়া রাজনীতির অনিবার্য রাস্তায় এ পার্টিকে চলতে হচ্ছে, আর এখানেই ওরা ঐতিহাসিক দিক থেকে অসহায়। তবু বিপ্লবের কথাও এদের বলে যেতে হবে, ঠিক একটা ফাটা রেকর্ডের মতো। বিপ্লব বিপ্লব বিপ্লব, আবার রেকর্ডের পিনটা তুলে, একটু সরিয়ে প্রচলিত গানটা গেয়ে চলবে।"

"তোমার কি নতুন কথা কিছু বলার আছে?" জয়তী সুদীপের মুখের দিকে তাকিয়ে ঘাড় কাত করলো, "কেবল সমালোচনা ছাড়া, তুমি কি কোনো পথের কথা বলতে পারো?"

সুদীপ মাথা নাড়লো, "না, কোনো সঠিক পথের কথা আমি বলতে পারিনে। তবে, আমার মনে হয়, সংসদীয় নীতিতে পার্টির উচিত, কোনো রাজ্যেই সরকার বা বিরোধী দল হিসাবে না থাকা। কিন্তু পার্টিকে আমি এখনই বিপ্লবের ডাকও দিতে বলছিনে। সমস্ত দেশব্যাপী পার্টি জনসাধারণকে সংগঠিত করে, তাদেব দাবীগুলোর ভিত্তিতে আন্দোলন শুরু করুক। সমস্ত রকমের সুবিধাবাদী নীতিগুলোকে জোরের সঙ্গে বিসর্জন দিক। ভারতের মানুষ ত্যাগ স্বীকারকে খুব বড় করে ভাবে। পার্টিকে ত্যাগের পথে আসতে হবে। এমন কি, আমি মনে করি, হিংসার নীতিও ছাড়া উচিত। মানুষের মনে বিশ্বাস ফিরিয়ে আনা দরকার।"

"আমাদের ওপর কি মানুষের বিশ্বাস নেই? বিশ্বাস না থাকলে আমরা

নির্বাচনে জিতছি কী করে ?"

"মুন্না, এটা পার্টির প্রকৃত জয় নয়। এ জয়টা পার্টির আসল শক্তিও নয়। আজ যেটাকে জয় ভাবা হচ্ছে, মানুষের অবিশ্বাস সেখানেই দানা বাঁধছে। পার্টি দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদের রাস্তার শেষ ধাপে এসেছে। দক্ষিণপন্থী বুর্জোয়াদের সঙ্গে পার্টির কোনো ফারাক নেই। সামনে সেই দিন খুব বেশি দূরে নয়, যেদিন নামে বাম-দক্ষিণ থেকেও এরা পরস্পরের সঙ্গে হাত মেলাবে।"

"তোমার সঙ্গে আমি কিছুতেই একমত হতে পারছিনে।" জয়তীর স্বরে দৃঢ়তা, "আমি বিশ্বাস করিনে, ওদের সঙ্গে আমাদের হাত মেলাতে হবে। তুমি পার্টিবিরোধী কথা বলছো।"

"কোন্ কথাটা পার্টিবিরোধী ?"

"সবটাই। আমি বিশ্বাস করিনে, পার্টি দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদের শেষ ধাপে এসেছে।"

"তুমি বিশ্বাস করো, এ পার্টি বিপ্লব করবে ?"

"হ্যাঁ, বিশ্বাস করি।"

সুদীপ কোনো কথা না বলে, সিগারেট ধরালো। জয়তী সুদীপের মুখের দিকে তাকালো, "তুমি আজ যে-সব কথা বললে, সীতানাথ মজুমদারও নিশ্চয় তা সমর্থন করে ?"

"না, ওঁর সঙ্গে আমার এ নিয়ে কোনো কথা হয়নি।" সুদীপ জ্যোৎস্নার বুকে এক মুখ ধোঁয়া ছড়িয়ে দিল, "এমনিতেও উনি সব বিষয়ে আমার সঙ্গে একমত নন। তবে, যেমন ধরো, তিনি বলেন, বুবুদের সেই সংস্থাকে যে দু কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল, তার তদন্তের ফলাফল ভবিষ্যতে কোনো দিনই আর জানা যাবে না। জানা গেলেও, তা মন্ত্রীর বিরুদ্ধে যাবে না। গত তিন বছরের মধ্যে, বুবুরা সেই কারখানারই বা কী করলো ? কারখানাটার যেটুকু দাঁড়িয়েছিল, নতুন কারখানা হবে বলে, সেটা ভেঙে ফেলা হয়েছে। আর কিছুই হয়নি।"

"হবে। বুবু আমাকে বলেছে।"

"তা হলে হয়তো হবে।" সুদীপের স্বর নির্বিকার, "তবে ইদানীং ওর উন্নতি দেখে বেশ লাগে।"

জয়তী ঘাড় কাত করে তাকালো, "কী উন্নতি ? নতুন গাড়ি চাপছে ? ওটা তো ও হায়ার পারচেজে কিনেছে। ব্যাংকের মাইনে থেকে নিয়মিত শোধ করে।"

সুদীপ নির্বাক। সিগারেটে টান দিল। ধোঁয়া ছাড়লো। জয়তীকে ওর বলতে ইচ্ছা হলো না, বুবু সম্প্রতি কী জীবন কাটাচ্ছে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত, বুবু আজ

একটি পরিবর্তিত ছেলে। ওর পোশাক-আশাক, আচার-আচরণ, কোথাও আগের বুবুকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

জয়তীর ভুরু কুঁচকে উঠলো, "কী হল ? চুপ করে রইলে যে ?"

"কী বলবো ?" সুদীপ হাসলো।

ওদের দুজনের হাত অনেকক্ষণ আগেই ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছে। জয়তীর ভুরু তেমনি কুঁচকেই আছে, "তোমার কথা থেকে মনে হলো, বুবুর সম্পর্কে তোমার ধারণা মোটেই ভালো নয়।"

"তোমার কী ধারণা ? বুবু ঠিক আছে ?"

"বেঠিক তো কিছু দেখিনে ?"

"তাহলে আমার কিছু বলবার নেই।"

"বুবুকে কি তুমি হিংসে করো নাকি ?"

সুদীপ জয়তীর মুখের দিকে তাকালো। জয়তী হেসে উঠলো, "সীরিয়াসলি কিন্তু বলিনি।"

"খুব আচমকাই কথাটা তোমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে।" সুদীপ হাসলেও, বুকের কাছে একটা তীক্ষ্ণ খোঁচা ওকে কেমন আড়ষ্ট করে রাখলো। "তবে সীরিয়াসলি বললেও আমি কিছু মনে করতাম না। কারণ বুবুকে আমি সত্যি হিংসে করিনে। শুধু ইচ্ছে করে, ওকে একটু শাসন করি। অপমানের ভয়ে সেটা করতে পারি নে।" ও শতরঞ্চি থেকে উঠে দাঁড়ালো।

জয়তীও উঠে দাঁড়ালো, "তুমি কি চললে নাকি ?"

"হ্যাঁ যাই।" সুদীপ বাঁ হাত চোখের সামনে তুলে ঘড়ি দেখলো, "রাত তো হল।"

"একটা কথা জানবার জন্য মনটা খুব ছটফট করছে।"

"কী কথা বলো তো ?" সুদীপ অবাক জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো।

জয়তীর চোখে কৌতূহল, "তোমার বাবা ও-বেলা কী বললেন ?"

"কিছুই না।" সুদীপ হাসলো, "কিছু একটা বলতে এসেছিলেন। কিন্তু দুজনের মধ্যে এমন তর্ক লেগে গেল, আসল কথাটাই বাবার বলার সময় হয়নি। মা এসে বাবাকে নিয়ে গেছলেন। পরে বলবেন বলেছেন। হয়তো আজ রাত্রেও বলতে পারেন।" ও শতরঞ্চির বাইরে পা দিয়ে স্যান্ডেল পরে নিল।

জয়তী শতরঞ্চির বাইরে এসে দাঁড়ালো। সুদীপ ওর দিকে ফিরে তাকালো। জয়তীও তাকিয়েছিল। সুদীপ হাত বাড়িয়ে, জয়তীর একটা হাত ধরে কাছে টানলো, "মুন্না, এবার আমাদের একটা খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে কথা বলবার সময় এসেছে।"

"আমরা কি বদ্ধ জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি নাকি ?"

"বদ্ধ না, একটা বাধার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছি। অথচ আমাদের পরিচিত সকলের ধারণা, আমরা পরস্পরের হাত ধরে এগিয়ে চলেছি।"

"আমরা কি তা চলছি না ?"

সুদীপ হেসে ঘাড় নাড়লো, "তুমি নিজেও ভালো জানো, আমরা তা চলতে পারছিনে। এক সময়ে আমরা জোর কদমেই চলেছিলাম। কিন্তু পরে একটা সময়ে এসে নিজেরাই দাঁড়িয়ে পড়েছি। দেখছি, আমাদের সামনে একটা বড় বাধা এসে দাঁড়িয়েছে।"

"ছুবু, সে বাধাটা কি সবানো যায় না ?" জয়তী সুদীপের কাছে এসে দাঁড়ালো, "আমি একটু আগেই বলেছি, তুমি পার্টিবিরোধী কথা বলছো। তাই তুমি বলেছো। কিন্তু তুমি কি আমাদেরই নও ?"

সুদীপ করুণ হেসে মাথা নাড়লো। "আমি যদি আজকেব কোনো দলেরই কেউ হতে পারতাম, তাহলে আমার থেকে সুখী আর কেউ হতো না। মুন্না, আমার ঠাকুর্দার ঘরে যে-গান্ধীর ছবি ছিল, সেটা আমি সরিয়ে দিয়েছি। নিজে এঁকেছি ঠাকুর্দার সেই গান্ধীকে, যেখানে তিনি দু'হাত কপালে তুলে নমস্কার করছেন, 'দরিদ্র নারায়ণোকি শ্রীচরণোমেঁ'। ঠাকুর্দার ভাষায় দরিদ্রনারায়ণই হচ্ছে আমাদের সেই প্রলেতারিয়েত। এ ছবি আঁকাটা যেমন বাবার ভালো লাগেনি, তেমনি সীতানাথ জেঠুরও লাগেনি। তুমি কি ইংরেজি সাপ্তাহিকে আমার লেখাটা পড়েছো ?'

"না। আজ রাত্রে পড়বো।"

"ঐ লেখাটা পড়ে সীতানাথ জেঠু আমাকে কোনোভাবে গান্ধীর উপাসক ধরে নিয়েছেন। বলেছেন, ঐ ভক্তিটক্তিগুলো বড় বিপজ্জনক ব্যাপার।" সুদীপ মাথা নেড়ে হাসলো, "অবিশ্যি একথা ঠিক, গান্ধী সম্পর্কে আমার আগের মনোভাব বদলেছে। আধুনিক রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি এক নতুন পথের সন্ধান দিয়েছেন। সে-পথ মানা না মানা, অন্য কথা। তবে আমার মনে হয় না, গান্ধীবাদের সঙ্গে মার্ক্সবাদের কোনো কোনো মূল বিষয়ের তফাৎ নেই। যেমন 'শ্রমই সমস্ত সম্পদের উৎস।' এটা সাধারণভাবেও সবাই মেনে নেয়, প্রশ্নটা আসে, সেই সম্পদের ভাগকে কীভাবে শ্রমিকের অনুকূলে তুলে দেওয়া যায়। এখানেই যাদের নিয়ে আমাদের সংশয় আর ভয়, যাঁরা আবার নিজেদের সমাজতন্ত্রীও ভাবেন, তাঁদের সম্পর্কেই আমি এঙ্গেলস্-এর সেই কথাগুলোই তুলে ধরতে চাই, 'মহান কল্পলোকচারীদের রাজনীতিক সংগ্রাম প্রত্যাখ্যান করাটা হল একই সঙ্গে শ্রেণীসংগ্রাম প্রত্যাখ্যান। অর্থাৎ যে-শ্রেণীর স্বার্থের তাঁরা প্রতিনিধি ছিলেন,

তাদের ক্রিয়াকলাপের একমাত্র রূপটাকে প্রত্যাখ্যান।' আমি জানি, এ কথাটাও তোমার পার্টিবিরোধীই মনে হবে। কিন্তু আমি হেলপলেস্।"

জয়তী সুদীপের আরও ঘন সান্নিধ্যে এলো। ওর শরীব এখন সুদীপের ছায়ায় ঢাকা, "কিন্তু ছুবু তুমি পার্টিকে যে-পথের কথা বলছো, তা-ই বা কী করে সম্ভব ? তুমি কি পার্টিকে নকশাল লাইন নিতে বলছো ?"

"আদৌ না।" সুদীপ ঘাড় নাড়লো। "এখন তো নকশালদেব কোনো কোনো গ্রুপও সংসদীয় রাজনীতির পথ বেছে নিচ্ছে। তোমাদের পার্টি হল অনেক বড় পার্টি। আমার সমালোচনা যে একশো ভাগ ঠিক, তাও দাবী করিনে। বিপ্লবীরাই বিশ্বাস কবে, সব পর্যায়েরই পরিবর্তন ঘটতে থাকবেই। ইতিমধ্যেই যে-দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ পার্টিতে দেখা দিয়েছে, এখনই এ পর্যায়ের শেষ করার কথা ভাবা দরকাব। শ্রেণীস্বার্থের সংগ্রামের বদলে কী ন্যক্কারজনক ভোটের হিসেব নিয়ে নেতারা খবরের কাগজ মারফৎ ঝগড়া করছেন।" ও হঠাৎ থেমে, জয়তীকে হাত ধরে টেনে নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসলো। ওব গলার স্বরে ঝরে পড়লো আবেগ, আর একটা ঐকান্তিক আর্তি, "মুন্না, আমাব আর এসব কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। বাবাকে আমি বলেছি, তাঁদেব কাছে আমি একজন অবাক বিপন্ন জিজ্ঞাসু মানুষ। তার বেশি কিছু নয়। সারা দেশের কথা বিবেচনা করলে, বিপন্ন জিজ্ঞাসু মানুষটাকে, মানুষের বদলে একজন ভাবতীয় আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। সেই আমার জীবনে, তোমাকে না পাওয়ার শূন্যতা কতোটা, শুধু কথা বলে বোঝাতে পারবো না। তোমার আমার সম্পর্কটাকে অমর প্রেম বা শুদ্ধপ্রণয় ইত্যাদি কোনো কথা দিয়েই সাজাতে চাইনে। এমন কি, সম্পর্কটার রক্ষাকবচ হিসেবে কোনো শ্রেণীর বিয়েতেও আমার বিশ্বাস নেই। আমার কামনার ক্ষেত্রে যেমন তুমি একান্তভাবেই একটি মেয়ে, তেমনি তোমার শুদ্ধি, বুদ্ধি, বিশ্বাস, কাজের শক্তিকে আমি শ্রদ্ধা করি। কিন্তু আমাকে দূরে সরিয়ে রেখেছো তুমি একটা জায়গায়—"

জয়তী আগেই সুদীপের মুখোমুখি জানু পেতে বসে পড়েছিল। ওর হাত উঠে এলো সুদীপের বুকে, "ছুবু, আমি তোমাকে সরিয়ে রাখিনি। তুমি যেমন একটা জায়গার কথা বলছো, সেই রকমই আর একটা জায়গায় তুমি আমাকে সরিয়ে রেখেছো।"

"সরিয়ে রাখিনি।" সুদীপ ওর বুকে রাখা জয়তীর হাতের ওপর নিজের হাত চেপে ধরলো। "আমি তোমাকে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছি। তোমার আনুগত্যকে আমি নমস্কার করি। কিন্তু তোমার আনুগত্যে কেন কোনো জিজ্ঞাসাই নেই ? যদি জানতাম, পার্টি তার কাজে জিজ্ঞাসার কোনো অবকাশই রাখেনি, তাহলে

তোমার থেকে আমার আনুগত্যও কম থাকতো না। তোমার মধ্যে কেন এই অন্ধত্ব ?"

জয়ন্তী মাথা নাড়লো, "মানিনে ছুবু, মানিনে তোমার কথা। পার্টির বেশির ভাগই তাহলে অন্ধ ? আর তোমরা কিছু সমালোচক কেবল চক্ষুষ্মান ?"

"জানি এই সংখ্যাগরিষ্ঠের উদ্দেশেই আজ সব দলের চাল-কলার নৈবেদ্য।" সুদীপের স্বরে হতাশা নেমে এলো। জয়ন্তীর হাতটা আরও শক্ত করে চেপে ধরলো বুকের মধ্যে, "এ তো এখন আর শুধু দলগুলোর আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেই না, এই সংখ্যাগরিষ্ঠের দেবতাকে ভোটের বাকসো থেকে পাবাব জন্য, ন্যায়-অন্যায় সব জলাঞ্জলি দিতেও কোনো দ্বিধা নেই।" ও দু'হাত বাড়িয়ে জয়ন্তীর দুই গালে রাখলো। ওর গম্ভীর স্বর এলো রুদ্ধ হয়ে, "মুন্না, পাবলাম না। তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারলাম না। সম্ভব হলে, আমার একটা কথা শুধু মনে রেখো। প্রেম, উৎসর্গ, এসব কোনো কিছুই মিথ্যে নয়। কিন্তু জ্ঞানের যোগেই যেন তার বিকাশ হয়।"

সুদীপ উঠে দাঁড়াতে চাইলো। জয়ন্তী ওর বুকের জামা টেনে ধরে রাখলো, "উঠো না ছুবু। তোমার শেষ কথা আমি মনে রাখবো। কিন্তু তুমি সংখ্যাগরিষ্ঠকেও মানতে চাও না ? এ তো অসম্ভব কথা!"

"হয়তো।" সুদীপেব স্বর যেন ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে, "কিন্তু আজকের এই সংখ্যাগরিষ্ঠের চুলচেরা হিসাবের মধ্যে আমি কোনো আদর্শ আর সত্যকেই খুঁজে পাচ্ছিনে।"

জয়ন্তীর স্বরেও নেমে এলো হতাশা আর আবেগ, "আমাদের সবাইকে ছেড়ে তুমি কোথায় চলেছো, জানিনে। সবাইকে ছেড়ে আমারও কোনোদিন তোমার কাছে যাওয়া হবে না। আমি থাকলাম এই সংখ্যাগরিষ্ঠের সঙ্গে।"

"থাকো মুন্না।" সুদীপ ঝুঁকে পড়লো জয়ন্তীর দিকে। জয়ন্তীর দুই গালে রাখা দু'হাত দিয়ে মুখ টেনে আনলো আরও কাছে। নিবিড় আবেগে তাকালো ওর অতি পরিচিত দুটি আয়ত কালো চোখের দিকে। জ্যোৎস্না সেই মুখে যেন এক দূর কালের মায়া ছড়িয়ে দিয়েছে। ওর স্বরে নেমে এলো আবার সেই রুদ্ধতা, "শুধু ঐ কথাটা মনে রেখো, জ্ঞানের যোগেই যেন সব কিছুর বিকাশ ঘটে।"

জয়ন্তী ঝুঁকে মুখ বাখলো সুদীপের গালে, "রাখবো। আর তোমার ফিরে আসার পথ চেয়ে থাকবো।"

সুদীপ গাড়ি নিয়ে, বাইরের বাড়ির পাশে, গেটের সামনে দাঁড়ালো। বাইরের বাড়ির বারান্দায় দু'জন সাদা পোশাকের লোক বসেছিল। রাস্তার আলো খাকা

সত্ত্বেও বারান্দার ওপর আর একটা চড়া আলো জ্বলে উঠলো। ততোক্ষণে সুদীপ গাড়ি থেকে নেমে এসেছে গেট খোলবার জন্য। সাদা পোশাকের একজন দ্রুত গেটের কাছে নেমে এলো, "আপনি গাড়িতে গিয়ে বসুন, আমি গেট খুলে দিচ্ছি।"

বাড়ির সামনে আজকাল ইউনিফর্ম পরা পুলিশ থেকে শুরু করে, নানা পোশাকের নানা মানুষ থাকে। সুদীপ কারোকেই প্রায় চেনে না। সৌরীন্দ্র তাঁর পিতার বাইরের ঘরগুলোকেই নিজের কাজের জন্য ব্যবহার করেন। ও গাড়ির দিকে ফিরে যেতে যেতে ঘাড় ঝাঁকালো, "ধন্যবাদ।"

সুদীপ গাড়ি নিয়ে গেটের ভিতরে ঢুকলো। ঠাকুর্দা বেঁচে থাকতেই, তাঁর পুরনো মডেলের গাড়ি বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল। তাঁর গ্যারেজে এখন বাবার গাড়ি থাকে। আরও দুটো অস্থায়ী গ্যারেজ করে নিতে হয়েছে, সুদীপের আর বুবুর গাড়ি থাকে সেই দুটো গ্যারেজে। গ্যারেজের পিছন দিকেই বাগান পশ্চিম ঘুরে, দক্ষিণে প্রশস্ত। মূল বাড়ির ঘেরা পাঁচিলের গায়ে একটি ছোট দরজা খোলাই ছিল। সুদীপ সেই দরজা দিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকেই শুনতে পেলো, দোতলায় বুবুর দরজা-বন্ধ ঘরে রেকর্ডে পপ মিউজিক বাজছে। ওর বন্ধুদের হাসি, কথাও ভেসে আসছে।

সুদীপ উঠোন পেরিয়ে মায়ের ঘরে গেল। মা সোফায় বসে রঙীন টি· ভি· দেখছিলেন। সুদীপকে দেখেই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, "ছুবু ফিরেছিস? তোর জন্যে বিজন লাহিড়ী নামে এক ভদ্রলোক অনেকক্ষণ ধরে বাইরের ঘরে বসে আছেন। কী নাকি জরুরি কাজ আছে। তোর বাবাও পার্টি অফিস থেকে দু'বার টেলিফোন করে খোঁজ নিয়েছেন, তুই ফিরেছিস কিনা।"

"বাবা কেন খোঁজ করছেন, কিছু বলেছেন?" সুদীপের চোখে ভ্রূকুটি জিজ্ঞাসা।

মা টি· ভি·-র দিক থেকে মুখ ফেরালেন, "ঐ বিজন লাহিড়ীর সঙ্গে তোর দেখা হয়েছে কি-না, বাবা সে কথাই জানতে চাইছিলেন।"

সুদীপ বাঁ হাত তুলে ঘড়ি দেখলো। রাত্রি দশটা। ও চিন্তিত মুখে বাইরের ঘরের এলাকায় গেল। একাধিক ঘর। সব ঘরেই আলো জ্বলছে। একটি ঘরে এক ভদ্রলোক একাই বসেছিলেন। ময়লা রঙ, দীর্ঘ দোহারা চেহারা। ধুতির ওপর সাদা হাফশার্ট পরেছেন। বয়স অনধিক ষাট। মাথায় চুল ধূসর। চোখ-মুখ দেখে খুবই নিরীহ মনে হয়। সুদীপকে দেখা মাত্র চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে বিনীত হাসলেন, "আমার নাম বিজন লাহিড়ী।"

"বসুন।" সুদীপ নমস্কার জানিয়ে, মুখোমুখি চেয়ারে বসলো, "আমি..."

বিজন লাহিড়ী সশব্দে, কিন্তু বিনীতভাবে হেসে উঠলেন, "আপনাব পরিচয় আমি জানি। আমাব আসার খবর আপনি পান নি। রাত্রিও হয়ে গেছে, কিন্তু..."

"ঠিক আছে, ঠিক আছে।" সুদীপ হেসে বিজন লাহিড়ীকে আশ্বস্ত করলো, "শুনলাম, আপনার কী জরুরি কাজ আছে। বাবা টেলিফোন করে খোঁজ নিয়েছেন।"

বিজন লাহিড়ী দু'হাত কপালে ঠেকালেন, "স্যারের মতো লোক হয় না। বলেছিলেন, আমার হয়ে তিনিই আপনার সঙ্গে কথা বলবেন। হয়তো সময় হয়নি।

"তাই।" সুদীপ ঘাড় ঝাঁকালো, "কী ব্যাপাব বলুন তো?"

বিজন লাহিড়ী তাঁব বুক পকেট থেকে একটি মুখ-বন্ধ খাম এগিয়ে দিলেন। মুখে বিনীত নিরীহ হাসি। সুদীপ দেখলো, খামের ওপর ওর নাম টাইপ করা। খামেব মুখ ছিঁড়ে, একটা টাইপ করা কাগজ বের করলো। প্রথমেই দেখলো, কাগজটি ওর কোম্পানির ছাপ মারা। নিচে যার সই, তিনি কোম্পানির ডিরেক্টর-কাম-জেনারেল ম্যানেজার, এস. আব. কে. দযাল। সুদীপের ভুরু কুঁচকে উঠলো। দয়াল ওকে নাম ধরে ডাকেন। চিঠিতেও 'মাই ডিয়ার সুদীপ' সম্বোধন করেছেন। ইংরেজি চিঠিটির মূল উপপাদ্য বিষয় হল : কোম্পানির পক্ষ থেকে যে-পনেরো হাজার হাই ফ্রিকোয়েন্সি প্লাস্টিক ওয়েল্ডিং মেসিন কেনা স্থির হয়েছে, যার সব দায়িত্বই আই. আর. ও -এ. ডা. সেন 'অপরাজিতা এ্যান্ড সনস'-এর কাছ থেকে কেনা হয। একটি অনিবার্য কারণেই তিনি এ প্রস্তাবটি রাখছেন।

সুদীপের মুখ গম্ভীর। চিঠি থেকে চোখ তুলে বিজন লাহিড়ীর দিকে তাকালো, 'এই অপরাজিতা এ্যান্ড সনস এব মালিক কে? আপনি?'

"আজ্ঞে।" বিজন লাহিড়ী বিচলিত হয়ে হাসলেন।

সুদীপের গম্ভীর মুখ অনেকটা নির্বিকার, "আপনারা মাস ছয়েক আগে, একবাব সরকারি কোটার কাঁচামাল ব্ল্যাক করতে গিয়ে ধরা পড়েছিলেন না?"

"সে কথা আর বলবেন না স্যাব। আমাব ছেলে এমন এক দুষ্টচক্রেব হাতে পড়েছিল—"

"আপনি আমাকে স্যার বলবেন না।" সুদীপের স্বরে কোনো পরিবর্তন নেই, 'আপনাদের ম্যানুফ্যাকচারিং লাইসেন্সও তো বাতিল হয়ে গেছলো।"

"সে-সব ঝঞ্ঝাট দু'মাস আগেই মিটে গেছে। কারখানাও চালু হয়ে গেছে।" বিজন লাহিড়ী ঘেমে উঠেছেন।

সুদীপের গোঁফ-দাড়ি ভরা মুখ পাথরের মতো শক্ত। "আমার বাবার সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে ?"

"আজ্ঞে তাঁর দয়াতেই তো দয়াল সাহেব—"

সুদীপ চিঠির দিকে তাকালো, এবং কথা উচ্চারণ করলো অনেকটা স্বগতোক্তির মতো, "কিন্তু মিঃ দয়ালের তো না জানার কথা নয় যে, আমাদের পুরনো পার্টিকেই অলরেডি অর্ডার প্লেস করা হয়ে গেছে।"

"তাও জানি। মাত্র গতকালই আপনি অর্ডার দিয়েছেন।" বিজন লাহিড়ীর মুখের হাসিতে অস্বস্তির ছায়া।

সুদীপ হাসলো, "তাও জানেন ? জেনেও গতকালের মধ্যে আমার বাবাকে দিয়ে মিঃ দয়ালকে বলিয়েছেন, আর গতকালই মিঃ দয়ালের কাছ থেকে এ চিঠি আদায় করেছেন !"

"ঠিক বলেছেন। স্যারের দয়া, দয়াল সাহেবের দয়া, এখন আপনার..."

সুদীপ উঠে দাঁড়ালো। "আচ্ছা, আজ আপনি আসুন। দু-তিন দিন পরে, আপনি দয়াল সাহেবের কাছেই সব জেনে যাবেন।"

"দয়াল সাহেবের কাছে ?" বিজন লাহিড়ী অবাক চোখে তাকিয়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন।

"শুনেছি আপনিই অর্ডারটা দেবার মালিক।"

সুদীপ হাসবার চেষ্টা করে ঘাড় ঝাঁকালো। "সেটা ঠিকই শুনেছেন। কিন্তু আপনি যাঁর চিঠি এনেছেন, তিনি কোম্পানির একজন খোদ মালিক ! তার ওপরে মিনিস্টারের আশীর্বাদও আপনার ভাগ্যে জুটেছে।"

"ভগবানের দয়া না হলে, এমনটা হয় না।" বিজন লাহিড়ী দু'হাত কপালে ছোঁয়ালেন, "এখন আপনি..."

সুদীপ দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করলো, "আচ্ছা আসুন।"

"আজ্ঞে।" বিজন লাহিড়ী আবার দু'হাত কপালে তুললেন।

সুদীপ ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। এ কথাটা বলবার জন্যই বাবা ও-বেলা ওর ঘরে গিয়েছিলেন ? এসব যোগাযোগের কারণ আর শর্ত যে কী, সুদীপ বুঝে উঠতে পারে না।

জয়তীর সঙ্গে কথা বলার পর, ওর মনে একটা ব্যথাভরা বৈরাগ্যের সুর বাজছিল। মনে হচ্ছিল, ওর জীবনের সব থেকে বড় যে প্রত্যাশাটা কখনও একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে যায়নি, আজ সেটা চিরকালের জন্য নামঞ্জুর হয়ে গেল। আর সেই সঙ্গেই এ জগৎ-সংসারের সমস্ত আকর্ষণও শেষ হয়ে গেল। বৈরাগ্যের সুরটা বেজে উঠেছে সেই কারণেই। কিন্তু আঘাতটা কোনো আকস্মিকভাবে

আসেনি। কোথাও একটা প্রস্তুতি ওর মনে ছিল। সে জন্যেই অস্থিরতা বা যন্ত্রণায় ও কাতর হয়ে পড়েনি। জয়তীব সঙ্গে চিববিচ্ছেদের কষ্টের এটা শুরু মাত্র। কতোখানি গভীরে এর মূল প্রোথিত ভবিষ্যতে জানা যাবে। তবে, ওদের পরস্পরেব সম্পর্কের মধ্যে কোথাও কোনো মালিন্য ছিল না, এইটা একটা বড় সান্ত্বনা।

জযতীর কাছ থেকে বাড়ি এসে, মায়েব কাছেই ওব আগে যেতে ইচ্ছে হয়েছিল। মনে হয়েছিল, অনেক দিন মায়েব কাছে সময় নিয়ে বসা হয়নি। কথা হয়নি। কিন্তু তাব আগেই এই বিজন লাহিড়ীর আবির্ভাব সংবাদ। সমস্ত ব্যাপারটা মনকে তিক্ততায ভরে দিয়ে গেল। এখন আব মায়েব কাছেও যেতে ইচ্ছা করলো না। খিদের অনুভূতিও ছিল না। দোতলার ওর পাশের ঘরেই বুবুদের বাজনা বাজছে। আড্ডা চলছে। ও বাগানে যাবার জন্য পাঁচিলের গায়ে ছোট দবজার দিকে পা বাড়ালো।

"ছুবু নাকি ?" বাইরের ঘবেব বাবান্দায় সৌরীন্দ্র এসে দাঁড়ালেন।

সুদীপ দাঁড়ালো। বাড়ির উঠোনেব কিছু অংশে এখনও চাঁদেব আলো। কিন্তু আশেপাশে দু তিনটে আলোর ঝলকে, জ্যোৎস্না হাবিযে গিয়েছে। ও দাঁড়ালো, "হ্যাঁ।"

"আহ্, বুবুটা যে কী হল্লা শুরু করেছে।" সৌরীন্দ্রর স্বরে বিরক্তি। তিনি বারান্দা থেকে নেমে, সুদীপেব কাছে এগিয়ে এলেন, "ওদিকে কোথায় যাচ্ছিলি ?"

সুদীপের স্বর যেন সুবহীন, "একটু বাগানেব দিকে যাচ্ছিলাম। কিছু বলবে ?"

"বিজন লাহিড়ীর সঙ্গে তো তোর কথা হয়েছে ?" সৌরীন্দ্রব স্বরে সাগ্রহ জিজ্ঞাসা, "ভদ্রলোক বেবিয়ে যাবার মুখেই আমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। শুনলাম, তুই ওকে দু-তিন দিন বাদে মিঃ দয়ালের সঙ্গে দেখা করতে বলেছিস ?"

সুদীপ দেখলো, বাইরের ঘরের বারান্দায় একটি লোক দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটি মন্ত্রীর রক্ষী। সুদীপের স্বরে নির্বিকার জবাব, "হ্যাঁ।"

"কিন্তু মিঃ দয়ালের সঙ্গে দেখা করার আর দরকার কী ?" সৌরীন্দ্রর স্বরের জিজ্ঞাসায় ঈষৎ বিরক্তির সুর। "আমি তো যদ্দূর জানি, ঐ অর্ডার দেবার এক্তিয়ার তোরই হাতে। মিঃ দয়াল বোধহয় তোকে একটা চিঠিও দিয়েছেন।"

সুদীপ নিচের দালানের দিকে পা বাড়ালো, "চলো ঘরে গিয়ে কথা বলি।"

"হ্যাঁ, তাই চল্।" সৌবীন্দ্র সুদীপকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেলেন। তাঁর স্বরে বিরক্তির ঝাঁঝ, "আমি বুবুকে বাজনা থামাতে বলি।"

সুদীপ দালানে পৌঁছুবার আগেই, সৌরীন্দ্র সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে গেলেন। বাড়ির কাজের লোকেরা সৌরীন্দ্রকে দেখামাত্রই মাকে খবর দিতে ছুটলো। সুদীপ সিঁড়ির মাঝামাঝি উঠতে না উঠতেই বুবুর ঘরের বাজনা থেমে গেল। ও নিজের ঘরের খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে, বাঁ দিকের দেওয়ালে সুইচ্ টিপে আলো জ্বালালো, পাখা চালালো। সৌরীন্দ্র ঘরে ঢুকলেন। ঢুকে বাঁ পাশে যে চেয়ারটি পেলেন, তাতেই বসলেন। ও-বেলার সেই বেতের চেয়ার। যার পাশেই কাঠের গোল টেবিল। জয়ন্তীর মুখের অবয়ব-রেখা টানা কাগজের বোর্ড এখনও সেই টেবিলে উলটে রাখা। সৌরীন্দ্র পাঞ্জাবীর পকেট থেকে সিগারেট আর লাইটার বের করলেন। সুদীপের দিকে তাকালেন জিজ্ঞাসু চোখে। "হ্যাঁ, কী বলছিলি, এবার বল্।"

"তুমিই বোধহয় কিছু বলছিলে।" সুদীপ টেবিলের অন্য পাশের চেয়ারের দিকে এগিয়ে গেল।

সৌরীন্দ্র মাথা ঝাঁকিয়ে ভ্রূকুটি চোখে তাকালেন, "হ্যাঁ, আমি বলছিলাম, বিজনবাবুকে তুই আবার মিঃ দয়ালের কাছে যেতে বললি কেন?"

"কারণ, ঐ ধরনের কোনো মেসিনারিজের অর্ডার আমরা যাদের দিয়ে থাকি, অলরেডি তাদের তা দেওয়া হয়ে গেছে।" সুদীপের স্বরে কোনো বিকার বা উত্তেজনা নেই, "মিঃ দয়ালও সেটা জানেন। তাছাড়া, এদের কাজ ভালো, সময় আর কথা ঠিক রাখে। এতদিনের বিশ্বস্ত পুরনো পার্টিকে কেন অর্ডার দিয়েও ফিরিয়ে নিতে হবে, আমি বুঝতে পারছিনে।"

সৌরীন্দ্রর স্বরে কর্তৃত্ব ও বিরক্তির সুর, "আঃ চিরকাল কি এক রকম চলে নাকি? অন্যদেরও একটু-আধটু সুযোগ দেওয়া উচিত।"

"তুমি কি বিজন লাহিড়ীর অপরাজিতা এ্যান্ড সনস্-এর সব খবর রাখো?" সুদীপ জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো।

"রাখি বই কি!" সৌরীন্দ্র হাসলেন। প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করলেন, "ওর ছেলেটা বোকা। একটা বাজে দলের ফেরে পড়ে গেছলো। কিন্তু লোকটা সত্যি ভালো। উপকারে আসার মতো। আমি মিঃ দয়ালকে টেলিফোনে বলেছিলাম। উনিই আমাকে বললেন, ওটা তোরই এক্তিয়ারে। তবু আমি ওঁকে অনুরোধ করেছিলাম, তিনি যেন তোকে বলেন।"

উপকারে আসার মতো! বিজন লাহিড়ী কীরকম উপকারে আসার মতো? সুদীপের তা জিজ্ঞেস করার প্রবৃত্তি হল না। ও হাসলো, "আমি তো ঐ বিজনবাবুনা কে, তাঁকে বলেই দিলাম, খোদ মালিকের চিঠি পেয়েছেন, মিনিস্টারের আশীর্বাদও আপনার ভাগ্যে জুটেছে। আপনাকে ঠেকাবে কে?"

"তার মানে, তুই অর্ডারটা অপরাজিতা এ্যণ্ড সনস্কে দিতে চাইছিস্ না ?" সৌরীন্দ্রর আঙুলের চাপে তাঁর কিং সাইজ সিগারেট দুমড়ে গেল। মুখ শক্ত, চোখের দৃষ্টি কঠিন।

সুদীপ হেসে ঘাড় ঝাঁকালো, "ঠিক তাই। পুরনো সাপ্লায়ার কোম্পানিকে ছাড়বার কোনো কারণ আমি দেখছিনে। অর্ডার প্লেস করাও হয়ে গেছে।"

"তার মানে, তুই কোম্পানির ডিরেক্টর মিঃ দয়ালের হুকুমও মানবি নে ?" সৌরীন্দ্র ঘাড় বাঁকিয়ে তাকালেন।

সুদীপ হাসলেও ওর স্বর নির্বিকার, "না, মানবো না। মিঃ দয়াল মালিক হতে পারেন। তিনি আমাকে চিঠিতে লিখেছেন, একটি অনিবার্য কারণেই তাঁকে এ প্রস্তাবটি দিতে হচ্ছে। সেই অনিবার্য কারণ হল, বিজন লাহিড়ীকে তোমার রেকমেণ্ডেশন। কিন্তু ব্যাপারটা এখন প্রেস্টিজ ইস্যু হয়ে দাঁড়াচ্ছে।"

"কিসের প্রেস্টিজ ? কার প্রেস্টিজ ?"

"আমার। কারণ, আমিই আগের পার্টিকে অর্ডারটা প্লেস করেছি।"

"তোর প্রেস্টিজ রাখার জন্য কি মিঃ দয়াল নিজের প্রেস্টিজ হারাবেন ?"

"তা কেন হারাবেন ?"

"তা হলে, ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে ? তোর চাকরি..."

"ওটা না ভেবে আমি কিছু বলছি নে।"

সৌরীন্দ্র কয়েক মুহূর্ত হতবাক্ ভ্রূকুটি চোখে তাকিয়ে রইলেন। তারপরে হঠাৎ হেসে উঠলেন, "এটা কি তোর আমার ওপর কোনো প্রতিশোধ নেওয়া ?"

সুদীপ হেসে ঘাড় নাড়লো, "প্রতিশোধের কোনো প্রশ্নই নেই। এটা নীতির প্রশ্ন। আর তুমি ভালোই জানো, আমি কোনো প্রতিশোধই নিতে পারি নে।"

"ছুবু, বিশেষ কারণ না থাকলে, আমি তোকে এ কাজটা করতে বলতাম না।" সৌরীন্দ্র দোমড়ানো সিগারেটটা ছাইদানিতে গুঁজে দিলেন। তাঁর মুখে ঈষৎ হাসি ফুটলো। গলার স্বর শান্ত, "আর তুই এটাও জানিস, পার্টি স্বার্থের উর্ধ্বে আমার কাছে কিছুই নেই। ব্যাপারটা নিয়ে এতোটা বাড়াবাড়ি করিসনে। পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে না চলতে পারলে—"

সুদীপ হেসে উঠলো, "শুধু পরিস্থিতি নয়। পরিবর্তিত পরিস্থিতি।"

"হ্যাঁ, পরিবর্তিত পরিস্থিতির বাস্তবতার সঙ্গে, আপাতত আমাদের হাত মিলিয়ে চলতে হচ্ছে।"

"হাত মিলিয়ে ? ও হাতগুলো কাদের ?"

"তার জবাব আমি তোকে দিতে চাইনে।" সৌরীন্দ্র আচমকা গর্জন করে উঠলেন, "নিজেকে তুই খুব বেশি চালাক ভাবিস্। এ বাড়িতে বসে আমাকে তুই

অপমান করছিস ?"

সুদীপ সৌরীন্দ্রর ক্রুদ্ধ উত্তেজিত মুখের দিকে তাকিয়ে ঈষৎ গম্ভীর হল। হেসে কোনো প্ররোচনার সৃষ্টি করতে চাইলো না, "তোমাকে আমি অপমান করতে চাইনি। কিন্তু এ বাড়িতে বসে মানে কী ? আমি আমার নিজের ঘরে বসে কথা বলছি। এ আমার ঠাকুর্দার দান।"

"হ্যাঁ, আর সেই কারণেই এখন ঠাকুর্দার ঋণ শোধ করার জন্য ঐ ছবিটা ঘরে টাঙিয়েছিস্।" সৌরীন্দ্র দেওয়ালের দিকে হাত দিয়ে গান্ধীর ছবিটা দেখালেন, "কিন্তু এত বেশি আমার আমার করিসনে। ওসবের জবাবও আমি দিতে পারি।"

"তা পারো। এখানে আমার জীবনটাকে অতিষ্ঠ করে তুলতে পারো। সে-সুযোগও আমি তোমাকে দিতে চাইনে। তোমার সান্নিধ্য ত্যাগ করে আমি অন্য কোথাও চলে যাবো।"

"তা হলে তুই যুদ্ধ ঘোষণাই করছিস ?" সৌরীন্দ্র উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর ক্রুদ্ধ দৃষ্টি ঝলকাচ্ছে।

সুদীপও উঠে দাঁড়ালো, "আমি কোনো যুদ্ধই ঘোষণা করিনি। তুমি খুব রেগে আছো। তবু একটা কথা না বলে পারছিনে। তুমি তো নাস্তিক, ঈশ্বরে বিশ্বাস করো না!"

"নিশ্চয়ই করিনে।" সৌরীন্দ্র ঘাড় বাঁকিয়ে, ভ্রূকুটি সন্দিগ্ধ চোখে তাকালেন।

সুদীপ এবার না হেসে পারলো না। ওর চোখের সামনে ভাসছে, এবারের নির্বাচনে জেতার পর, মায়ের কাছ থেকে বাবার কালীর প্রসাদ পাবার ছবি, পকেটে প্রসাদী ফুল। বোধহয় এখন সে-ফুল পার্সের মধ্যে আছে। ও মাথা ঝাঁকালো, "করো কি না জানিনে। তবে তাও করতে, যদি জানতে, তাতেও কিছু স্বার্থসিদ্ধি হবে।"

"এই সব কথার মুখ কী করে বন্ধ করা যায়, তা আমি জানি।" সৌরীন্দ্রর স্বর বাঘের চাপা গর্জনের মতো শোনালো। তিনি মুখ ফিরিয়ে সোজা বেরিয়ে গেলেন।

সুদীপ দেখলো, ঘরের বাইরে, দালানে বুবু, আর ওর দু-তিনজন বন্ধু দাঁড়িয়ে আছে। সবাই ওর দিকে রুষ্ট চোখে তাকিয়ে দেখছে।

সুদীপ সীতানাথের মুখোমুখি বসেছিল। কলকাতার উত্তর উপকণ্ঠে, গঙ্গার ধারের কাছাকাছি, একটা পুরনো একতলা বাড়ি। সেই বাড়িরই একটি ঘরে সুদীপের বাস। একদা পাড়াটায় সম্পন্ন ব্যক্তিদের বাস ছিল। তার চিহ্ন হিসাবে

রয়ে গিয়েছে বেশ কিছু পুরনো অট্টালিকা। এখন সে-সব অট্টালিকা, বাস করার পক্ষে কিছুটা বিপজ্জনক হয়ে উঠলেও, অনেক লোকের বাস। বোঝা যায়, আশেপাশের কারখানাগুলোই সম্পন্ন ব্যক্তিদের এসব স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল। তবে এক সময়ে যতোটা গরীব পাড়া হয়ে উঠেছিল, তুলনায় এখন আবার, কারখানা ঘিরেই, ফাঁকা জমিতে অনেক নতুন বাড়িও উঠেছে।

সুদীপের ঘরটা বড়। পশ্চিমদিকে বড বড় দুটো জানালা দিয়ে গঙ্গা দেখা যায়। দক্ষিণে একটা চওড়া বারান্দাও আছে। বাড়িটার সীমানার পাঁচিল ভেঙে পড়েছে অনেক জায়গায়। দক্ষিণে বেশ কয়েকটি আম জাম নারকেল গাছ রয়েছে। ঘরের পুরনো দেওয়ালে ছবিগুলো সবই আছে। বইও অনেক আনা হয়েছে, র‍্যাক সুদ্ধু। তবে আসবাবপত্র আনা সম্ভব হয়নি। সুদীপও চায়নি। একটা খাটিয়াই যথেষ্ট। অবিশ্যি খাটিয়া বিছানাহীন নয়। এখানে ও তিন মাস বাস করছে। চাকরি থেকে ওকে অনিবার্যভাবেই বিদায় নিতে হয়েছে। অতএব, গাড়ি নেই। তবে, এখনও কোনো চাকরি না জুটলেও, ওর অর্থের সংকট আপাতত নেই। আর, যেহেতু সীতানাথের মতো, ওর পক্ষে রান্না করে খাওয়া সম্ভব না, ওকে নির্ভর করতে হয় একজন বিধবা মহিলার ওপর। অবিশ্যি মহিলাটিকে পাওয়াও সৌভাগ্যের কথা। প্রৌঢ়ার কাজকর্ম পরিচ্ছন্ন, নিজেও পরিচ্ছন্ন। তাঁর ওপরেই সুদীপের সকল দায়-দায়িত্ব ন্যস্ত।

হেমন্তকাল। দক্ষিণের বাগানে পাতা ঝরা শুরু হয়েছে। সুদীপের গায়ে হাপ-হাতা ছোটপাঞ্জাবী, আর পাজামা। সীতানাথ তাঁর নিয়মিত পোশাক ধুতি-পাঞ্জাবী পরে আছেন। দুজনের সামনে চায়ের গেলাস শূন্য।

"তোর ত্যাগটাকে আমি ছোট করে দেখছিনে।" সীতানাথ হাসলেন, "কিন্তু তোর মতামতগুলো মেনে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

সুদীপের ধূমপানে সীতানাথের অনুমতি ছিল। ও একটা সিগারেট ধরালো; "সীতানাথজেঠু, আপনার পক্ষে যা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়, আমি তাকে মানিয়ে নেবার জন্য জোর করতেও পারিনে। এখন আমি একটা বিশ্বাসে পৌঁছেছি—যেটা বোধহয় আমার স্ববিরোধিতার মধ্যেই পড়ে। বলপ্রয়োগে আমি বিশ্বাস হারিয়েছি।"

"অথচ তা হবার কথা ছিল না।" সীতানাথ ঘাড় নাড়লেন, "নতুন সজীব শক্তিকে পুরাতন যদি তার পথ না ছেড়ে দেয়, তখন বলপ্রয়োগ করা ছাড়া উপায় নেই, এ কথা তুই বিশ্বাস করতিস।"

সুদীপ ঘাড় ঝাঁকালো, "হ্যাঁ, করতাম। কিন্তু বলপ্রয়োগের যে রূপ দেখছি, তা আর যাই হোক, শ্রেণী বিপ্লবের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। এ দেশে

গৃহযুদ্ধের কোনো সম্ভাবনা আর আমি দেখতে পাইনে।"

"না ছুবু, তোর এসব মতের সঙ্গে আমার মিলবে না।" সীতানাথের মুখ গম্ভীর হল, "অন্যায় অসাধুতার সঙ্গে তুই আপোস করবিনে, তার জন্যে যে-কোনো ত্যাগেই আমার শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু এ দেশে বিপ্লব হবে না, এ ভবিষ্যৎ-বাণী আমি মানিনে। তুই কি এর পরে অহিংসার কথা বলবি নাকি ?"

সুদীপ মুখ ফিরিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়লো, "ওটা এতই বড় ব্যাপার, আজকের যুগে তার চেয়ে বন্দুক নিয়ে লড়ালড়ি করা অনেক সহজ রাস্তা।"

"এতই বড় ব্যাপার মানে ?"

"নিরস্ত্র অহিংস আন্দোলনের থেকে বড় সংগ্রামের কথা আর কী চিন্তা করা যেতে পারে ?"

সীতানাথের মুখ আরও গম্ভীর হল, "ছুবু, এসব হল সবই হতাশার কথা। আর আমার মনে হয়, বুবুর সঙ্গে জয়তীর বিয়েটাই তোকে আরও দুর্বল করে দিয়েছে।"

সীতানাথ আঘাতটা কোথায় করলেন, সে-অনুভূতি তাঁর নেই। সুদীপ নিজেকে মহামানব ভাবে না। এ বিয়ের সংবাদটা ভয়ংকর ঘাতকের মতোই ওর অস্তিত্বকে বিনাশ করে দিতে উদ্যত হয়েছিল।

সংবাদটা এসেছিল স্বয়ং জয়তীর কাছ থেকেই। জয়তী ওকে একটা চিঠি দিয়েছিল। চিঠিটা ওর কাছে পরে অনিবার্য মনে হয়েছিল। জয়তী লিখেছিল, "ছুবু, তুমি চাকরি, বাড়ি, এ দুটোই ছেড়ে চলে যাবার আগে বা পরে আমাকে কোনো সংবাদ দাওনি। ইতিমধ্যে কয়েক মাস কেটে গেছে। এই সময়ের মধ্যে তোমার সঙ্গে তোমাব মায়ের বার দুয়েক পত্রালাপ হয়েছে। তোমার মায়ের মুখেই সে-খবর শুনেছি। তিনি আমাকে তোমার দুটো চিঠিও দেখিয়েছেন। তিনি কী ভেবে আমাকে তোমার চিঠি দেখাতে পারেন, তা তোমাকে বুঝিয়ে বলার দরকার হয় না। তাঁর কোনো দোষ নেই। তিনি এখনও বিশ্বাস করেন, তোমার আমাব সেই পুরনো সম্পর্কই আছে। যে-কারণে, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তোমার সঙ্গে আমার নিশ্চয় পত্রালাপ হয়। আমি তাঁর সে-বিশ্বাস ভেঙে দিয়েছি। অবশ্য সহজে তা পারিনি। তিনি আমার কথা প্রথমে বিশ্বাস করতে পারেননি। তারপরে যখন শুনলেন, তুমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার কথা পর্যন্ত আমাকে কিছুই জানাওনি, তখন তাঁর অবাক চোখ দুটো ভিজে উঠেছিল। বলেছিলেন, 'তোমাকেও জানিয়ে যায়নি ? তা হলে কি সত্যি ওব আপন বলতে আর কেউ নেই ? আমি নেহাতই ওর মা, তাই আমাকেই একমাত্র বলে গেছে।'...

"তোমার মা কী করেই বা বুঝবেন, তোমার চাকরিতে পদত্যাগ, বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার সঙ্গে নিঃশব্দে আরও অনেক কিছুই ছেড়ে যাওয়া। মা'কে একথাও বোঝানো যাবে না, তোমাকে কেউ ত্যাগ করেনি। তুমিই সবাইকে ত্যাগ করে গেছ। মিথ্যে বলবো না, খবরটা শোনার পরে, আমার বুকের মধ্যে একটু মোচড় দিয়ে উঠেছিল। স্পষ্টতঃই, যাকে বলে, আঘাত, তাই আমি পেয়েছিলুম. এমন কি, তারপরেও প্রত্যাশা করেছিলুম, তুমি আমাদের বাড়িতে এসে আমাকে সব বলে যাবে, অথবা চিঠি লিখে জানাবে। তোমাকে যে পুরোপুরি চিনে উঠতে পারিনি, সেটা নতুন করে প্রমাণিত হয়েছিল। যখন একেবারেই হতাশ হয়েছিলুম, তখন কেমন একটা অপমানের জ্বালাও অনুভব করেছিলুম। অবশ্য এখন আর সেইসব অনুভূতি কিছুই নেই। কারণ, তোমার নীরবতার মধ্যেই তোমার পরিচয় আমার কাছে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তুমি তোমার উপযুক্ত কাজই করেছো। আর আমার প্রত্যাশা যদি পূর্ণ হতো, তা হলেও তোমার প্রতি আমার কোনো সমবেদনা বা সমর্থন থাকতো না। অথচ একটা বিষয়ে তোমাকে শ্রদ্ধা না জানিয়েও পারছিনে। নিজে গৃহের অধিকার ও স্বাচ্ছন্দ্য ছেড়ে গিয়ে, তুমি ঔদার্যের পরিচয় দিয়েছো। অবশ্য, মা তাতে খুবই কষ্ট পাচ্ছেন। দোতলায় তোমার সীমানা বন্ধ আছে। কেউ তা ব্যবহার করে না। কেবল তোমার ঘরের দেওয়াল থেকে লেনিনের ছবিটি সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

"যে-কারণে তোমাকে এই চিঠি লিখছি, তার আসল কথাটাই উহ্য থেকে যাচ্ছে। তোমার সঙ্গে আমার শেষ দেখার রাত্রে, আমাদের বাড়ির ছাদে, যে-সব কথা হয়েছিল, তার মধ্যে তোমার একটি বিশেষ কথা ছিল। 'শুধু ঐ কথাটা মনে রেখো, যেন জ্ঞানের যোগেই সব কিছুর বিকাশ ঘটে।' বলেছিলুম, 'রাখবো। আর তোমার ফিরে আসার পথ চেয়ে থাকবো।' আজ বলবার সময় এসেছে, তোমাকে আমি ঠিক কথা বলিনি। তোমার 'জ্ঞানের যোগে বিকাশ' কথাটির মধ্যে যে-উদ্দেশ্য নিহিত ছিল, আমি কোনো কালেই তা মেনে নিতে পারবো না। কারণ তোমার 'জ্ঞানের যোগে বিশ্বাস'-এর মূলে রয়েছে, আমার প্রতি পার্টি ত্যাগের প্রেরণা। তোমার 'জ্ঞানের যোগে বিকাশ'-এর থেকে, পার্টির প্রতি আমার আনুগত্য অনেক বড়।

"এই ক' মাসের মধ্যে আর একটা বাস্তববোধ আমাকে নতুন সত্যের সন্ধানও দিয়েছে। সেই রাত্রে তোমাকে বলেছিলুম, 'আর তোমার ফিরে আসার পথ চেয়ে থাকবো।' এ ক'মাসের মধ্যে আমি নিশ্চিত বুঝেছি, তুমি আর কোনো কালেই আমার কাছে ফিরে আসবে না। কেন না, আমরা দুজনে কেউ কারোর শর্ত মেনে নিতে পারিনি। অতএব, আমার দিকে থেকেও, তোমার ফিরে আসার পথ চেয়ে

থাকার ইতি হয়ে গেছে। কোনো মিথ্যেকেই বেশি দিন সত্যি বলে মনে মনে লালন করা যায় না। এ কথাটা তোমার কাছে স্বীকার করতে পেরে কেবল যে স্বস্তি বোধ করছি তা নয়। একটা জগদ্দল পাথর যেন আমার বুক থেকে নেমে গেছে।

"এর পরের কথাটা হল, তোমাকে সেই রাত্রেই বলেছিলুম, 'সবাইকে ছেড়ে তুমি কোথায় চলেছো জানিনে। কিন্তু সবাইকে ছেড়ে তোমার কাছে আমার কোনোদিন যাওয়া হবে না। আমি থাকলুম সংখ্যাগরিষ্ঠের সঙ্গেই।' কথাটা নিশ্চয়ই তোমার মনে আছে। আমার সেই কথার মধ্যেই, আর একটি নতুন সত্য ধরা দিয়েছে। দেখলুম, সেই সংখ্যাগরিষ্ঠের মধ্যে, বুবু যে কেবল আছে, তা নয়। ও এমন ভাবে আছে যে, ওকে আমি আর দূরে সরিয়ে রাখতে পারছিনে। এখন আমার মনে হয়, যে-দূরত্ব ও অমিলের মধ্যে থেকেও, মনে করতুম, তোমাকে আমি ভালবাসি, সে-ভুলটা আমার ভেঙেছে। বরং বুবুর সঙ্গেই আমার মনের মিল অনেক বেশি। ও আমার খুবই কাছের মানুষ। বিবাহ বিষয়টি কোনো স্বর্গীয় কাল্পনিক মাধুর্য দিয়ে ভরা, এ-কথাটা তুমিও বিশ্বাস কর না। 'অমর প্রেম বা শুদ্ধ প্রণয' দিয়ে তুমিও, তোমার আর আমার সম্পর্ককে সাজাতে চাওনি, বরং শুদ্ধি-বুদ্ধি-বিশ্বাস-কাজকেই তুমি শ্রদ্ধা কর। সেই বাস্তব বোধেব পরিচয় দিতে গিয়ে, জীবনেব প্রয়োজনেই, আমি আর বুবু পরস্পরকে বিয়ে করছি। সম্ভবত এ বিয়ের মধ্যে তুমি কোনো অশুভ ছায়া দেখতে পাবে। যদি দেখ, তা হলে সেটা তোমারই বৈশিষ্ট্য, আমার কিছু বলার নেই।

"তোমার বাবা এ বিয়ের প্রস্তাবকে সানন্দে গ্রহণ করেছেন। তোমার মা প্রথমে খবরটা বিশ্বাস কবতে পারেননি। পরে খুবই অবাক হয়েছিলেন। কিন্তু ভালোমন্দ কোনো মন্তব্যই করেননি। কোনো ইচ্ছে অনিচ্ছাও প্রকাশ করেননি।

"তোমার কাছে এ আমাব কোনো প্রত্যাখ্যান পত্র নয়। তবু কেন এত কথা লিখলুম? না লিখলেই বা কী ক্ষতি ছিল? তোমার কোনো ক্ষতি হয়তো হতো না, কিন্তু আমার মনে হয়েছে, তোমাকে এসব কথা জানানোর মধ্যে আমার কোথাও একটা দায়বদ্ধতা থেকে যাচ্ছে। তাই না লিখে পারলুম না। এ চিঠি যদি তোমার বিরক্তির কারণ হয়, আমি নিরুপায়। আমি জানি, কোনো কামনা প্রার্থনাই এক্ষেত্রে হয়তো হাস্যকর মনে হবে। অতএব, —ইতি, মুন্না।"

চিঠিটা পাবার পর, সুদীপের মনে পড়েছিল, জয়তীদের বাড়িতে ছাদের সেই কথা, 'বুবুকে কি তুমি হিংসে করো নাকি?' অবিশ্যি পর মুহূর্তেই হেসে উঠে বলেছিল, 'সিরিয়াসলি কিন্তু বলিনি।' সুদীপ জানতো, কথাটা জয়তীর ভিতর থেকেই বোধহয় এসেছিল। 'সিরিয়াসলি' বলতে বোধহয় ও বোঝাতে চেয়েছিল,

হিংসে কথাটাকে ও সত্যি বলতে চায়নি। কিন্তু আসলে জয়তী সত্যি কথাই বলেছিল। সুদীপের প্রাণে আঘাতটা আচমকা বেজেছিল। তারপরেও ও হেসে অন্য কথা বলেছিল। কারণ, জানতো, বুবুকে ও সত্যি হিংসে করে না। নিজের কনিষ্ঠ ভাইয়ের পতন দেখে ও দুঃখিত ক্ষুব্ধ, এমনকি ক্রুদ্ধও হয়েছিল।

সুদীপ যথার্থ মেপে উঠতে পারেনি, জয়তী কতোটা আঘাত করার জন্য চিঠিটা লিখেছিল। তবে, মনে হয়েছিল, চিঠিটা ভয়ংকর ঘাতকের মতোই ওর অস্তিত্বকে যেন বিনাশ করে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু জয়তীর চিঠির প্রথম দিকের কথাগুলোর মধ্যে, সুদীপ নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করেছিল। সেই আবিষ্কারের মধ্য দিয়েই ও নিজেই অনুভব করেছিল, জয়তী ওকে যতোটা কঠিন আঘাত করেছিল, ও তার থেকেও কঠিনতর আঘাত করেছিল জয়তীকে। জয়তীকে কোনো কিছু না জানিয়ে, নিঃশব্দে সরে আসাটাই প্রমাণ করেছিল, সেখানে ওর অন্তরে কোনো তাগিদ বোধ করেনি। ওর মনে যদি অভিমানেরও লেশ থাকতো, তা হলেও অন্তত জয়তীকে এক ছত্র লিখে ওর চাকরি থেকে পদত্যাগ ও গৃহত্যাগের কথা জানাতো। কিন্তু তার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন ও বোধ করেনি। এ নীরবতাকে যদি জয়তী সর্বাংশে অবজ্ঞা বলে মনে করে থাকে, তবে দোষ দেওয়া যায় না।

সুদীপের কি একবারও মনে হয়নি, ওর জীবনের এত বড় একটা পরিবর্তনের ঘটনা জয়তীকে জানানো উচিত? মনে হয়েছিল। এবং এটাও মনে হয়েছিল, সেই জানানোটা হতো নিতান্তই বৃথা। তার অর্থ এই না, জয়তীর প্রতি ওর ভালবাসার মধ্যে কোনো খাদ ছিল। কিন্তু জয়তীর প্রতি দেহসর্বস্ব ভালবাসায় ও আকৃষ্ট হয়নি। আর যে 'শুদ্ধি বুদ্ধি বিশ্বাস ও কাজের শক্তি'কে ও প্রেমের মধ্যে মিশিয়ে নিতে চেয়েছিল, তার সঙ্গে 'জ্ঞানের যোগ'টা কতো গভীর, জয়তী তা কোনো দিন মেনে নিতে চায়নি। অথবা বুঝতে পারেনি। জ্ঞান আর যুক্তি, এই দুটি বিষয়, জয়তীর পার্টির প্রতি আনুগত্যের পরম শত্রু। কিন্তু সুদীপ কোনোদিনই অস্বীকার করতে পারবে না, রমণীর প্রতি ওর বাসনার মূর্ত প্রতীক একমাত্র জয়তী। সেই বাসনার মধ্যে ছিল এবং আছে—পরম স্নেহ দিয়ে জয়তীকে ওর পক্ষচ্ছায়ায় ঢেকে রাখার আকুলতা। ও জানে না, ভবিষ্যতে আর কোনো মেয়ে ওর জীবনে আসবে কি না। অদ্যাবধি, জয়তী ব্যতিরেকে কোনো মেয়েই ওর প্রাণের সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম অনুভবের স্থানটিকে অধিকার করতে পারেনি।

সুদীপ সব কিছু ছেড়ে চলে আসার পর, জয়তীর মতোই কি প্রত্যাশা করেনি, জয়তী হয়তো ওর কাছে একবার আসবে। নিদেন একছত্র পত্র লিখে কিছু জানতে

চাইবে ? নিজের কাছে অস্বীকার করার উপায় নেই, গত কয়েক মাসে সুদীপের মন প্রতিদিন সেই প্রত্যাশা করেছে। সেই কারণেই, জয়তীর চিঠি 'ভয়ংকর ঘাতকের মতোই ওর অস্তিত্বকে বিনাশ করে দিতে উদ্যত হয়েছিল।'

সুদীপের প্রাণের শক্তিই ওকে বিনাশ-বিভ্রম থেকে বাঁচিয়েছে। তা ছাড়া, জয়তীর আসা বা পত্রের যতো গোপন প্রত্যাশাই ওর মনে থাকুক, আদর্শগত ভাবনার মধ্যে, শক্তিস্বরূপিণী জয়তীকে দেখেছিল নতুন আর এক রূপে। জয়তীর চিঠি পাবার কয়েকদিন পরে, ও চিঠির জবাব দিয়েছিল, "মুন্না, তোমার খড়্গাঘাত থেকে এ যাত্রায় জীবনটা কোনো ক্রমে রক্ষা পেয়ে গেল। জানিনে, একটা কথা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করো কিনা। সেই কথাটা হলো, আমি মানুষটা খুবই সাধারণ। এই সাধারণত্বই একটা মরণ-আঘাত থেকে আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। আমি যদি তোমার মতো অসাধারণ হতুম, তা হলে, কোনো সন্দেহ নেই, একটা বিচ্ছিরি অঘটন ঘটিয়ে ছাড়তুম। কয়েকটা দিন আমার সেই লড়াইয়ের মধ্যেই কেটেছে। মনে হয়েছিল, চোখের সামনে আমার সমস্ত জীবনটা ঝড়ে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। এমন কি, অস্বীকার করবো না, তোমার চিঠিটা পড়ে, সেটাই মুখে চেপে, আমার সহসা অন্তর্ভেদী রোরুদ্যমান কান্নাটাকে চাপতে চেষ্টা করেছি। ব্যর্থ হয়ে, ভিজিয়েছি তোমার চিঠি। তারপরে আস্তে আস্তে আমার মধ্যে সেই সাধারণ বোধটা জেগে উঠেছে। যে-সাধারণ বোধ দিয়েছে আমাকে সমাজ সংসার পরিবার, আর মানুষ। এবং অবশ্যই আমার প্রিয় গুরুগণ।

"প্রথম আঘাতের অন্ধকারে যা স্পষ্ট দেখতে পাইনি, বুঝতে বা মেনে নিতেও হৃৎপিণ্ড ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছিল, পরে দেখলুম, বুঝলুম, মেনে নিলুম, তোমার সিদ্ধান্তটা কতো স্বাভাবিক। তুমি যে কোনোক্রমেই তোমার নিজের জায়গা থেকে ঠাঁইনাড়া হওনি, তার ফলে তুমি নিজেকে ছোট করোনি। আমাকেও ছোট করোনি। তোমার জীবনের সমস্ত সত্যের মধ্যেই, বুবুকে বিয়ে করার সিদ্ধান্তে, সততা প্রকাশিত হয়েছে। পৃথিবীতে এমন ঘটনা নতুন ঘটলো না। তবে তোমাদের দুজনের মিলনের পরিণতি, এ দেশ ও কালের কোনো কল্যাণ করবে না, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

"তোমাকে হারানোর জন্য আমি চোখে অন্ধকার দেখেছি। আমার সাধারণত্ব ওতেই প্রমাণিত। কিন্তু অধঃপতিত বুবুকে আমি হিংসে করিনে। এটা বিশ্বাস করা না করা তোমার অভিপ্রায়। তোমার চিঠিতে আমার প্রতি যে-অভিযোগ আছে, তা মিথ্যে নয়। তবে তোমাকে কিছুই না জানিয়ে চলে আসার মধ্যে আমার কোনো ক্ষোভ বা নীচতা ছিল না। আমি বিশ্বাস করি, তোমাকে জানিয়ে

আসাটা হতো বাহুল্য ও বৃথা। তবু কেন, তোমার চিঠি পেয়ে মরণ-আঘাতের যন্ত্রণা পেয়েছিলুম ? মুন্না, জীবনে সব কিছুরই ব্যাখ্যা থাকা উচিত। কেবল আমার এই একটি কথা তোমার কাছে চিরকাল অব্যাখ্যাত হয়ে থাকুক।

"তোমাকে আমার মানসিক পরিবর্তনের দু-একটা কথা বলা হয়তো খুবই আবশ্যিক নয়। কিন্তু না-বলাটা আমার মধ্যে কেমন একটা অস্বস্তির সৃষ্টি করছে। কারণ, সেটা সত্য গোপনের মতো একটা অন্যায় বোধও আমাকে বিঁধছে।

উনিশশো ছিয়াত্তর সালের এক অন্ধকার রাত্রে কয়েকটি পশু তোমার নারীত্বকে ছিন্নভিন্ন করেছিল। জীবন সংশয় করে তুলেছিল। সাতাত্তরে তুমি নিজের হাতে তাদের হত্যা করে, তোমার লাঞ্ছিত নারীত্বের প্রতিশোধ নিয়েছিলে। তোমার সেই শক্তিকে আমি অন্ধের মতো পূজা করেছিলুম। মনে করেছিলুম, তুমিই আমাদের সেই পূজ্যা শক্তিস্বরূপিণী। আমার ভুল, তোমার সেই শক্তিস্বরূপিণী রূপের মধ্যে আমি ঐশী শক্তিটাকেই খুব বড় করে দেখেছিলুম। কিন্তু একবারও ভেবে দেখিনি, বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে সেই শক্তিস্বরূপিণীর মিলটা কোথায় ? আজ বুঝতে পারি, ঘৃণা দিয়ে ঘৃণার উৎসকে বন্ধ করা যায় না। হিংসা দিয়ে হিংসা রোধ করা যায় না। হত্যা কোনো শক্তিরই পরিচায়ক নয়।

"এখন যা তোমার আদর্শের পথ, আমি বুঝতে পারি, তার মধ্যেও রয়েছে তোমার রক্তেরই পিপাসা। কেন না, তুমি জানো, সেখানেই তোমার উৎসেরও ইতি। কিন্তু পশু হত্যার মধ্যে তোমার প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষা মিটেছে সত্যি— তোমার লাঞ্ছিত নারীত্বের সকল যন্ত্রণার অবসান হয়েছে ?

"আমি আজ সেই শক্তিরই স্বপ্ন দেখি, যে-শক্তি রুধিরোল্লাসের থেকেও বড়। পশুরূপী মানুষকে যে-শক্তি তার পাপবোধের যন্ত্রণা থেকে মুক্তির উত্তরণে, চোখের জলে জীবনের কাছে আত্মসমর্পণে মাথা নত করায়, আমি সেই শক্তিরই পূজারী। কিন্তু আজ তোমাকে এ কথা বলা, শুধু বাহুল্য আর বৃথাই মনে হচ্ছে। অতএব, আমারও এখানেই ইতি। —ছুবু।"

সুদীপ জানে, সীতানাথকে এ চিঠির কথা বলার কোনো প্রয়োজন নেই। মাত্র এই সেদিন, অগ্রহায়ণের প্রথমে, বিয়ের ঘটনা ঘটেছে। উৎসব আয়োজনের সব কথাই ও শুনেছে। কিন্তু ওকে বাঁচিয়েছে ওর যুক্তি আর বুদ্ধি, ওর জ্ঞান, যে-জ্ঞানের প্রতিই ওর শেষ নির্ভর। ওর অস্তিত্ব মৃত্যুরূপী ঘাতকের আঘাতের পরেও সজীব আছে। ও হাসলো, "সীতানাথজেঠু, আপনি যা খুশি বলুন, সেটা আপনার বিশ্বাস। আমি চলি আমার বিশ্বাস নিয়ে। আপনারা, গান্ধীর অনশন

মানতেন না। কিন্তু সেই অনশনই আপনারা জেলের মধ্যে করেছেন। আপনারা যদি সত্যি বিশ্বাস করেন, এ দেশে বিপ্লব হবে, তা হলে, ওদের মুখের বুলিটাকে নিজেদেব কাজে লাগান না! আমার দৃঢ় বিশ্বাস, অহিংসাকে সব থেকে ভয় পায় তারা, যারা হিংসায় বিশ্বাসী। মার দেবার কথা না ভেবে, এ দেশে আর একবার মাব খেয়ে দেখুন না, কোন শক্তিটা বেশি?"

"আমি আজ চলি।" সীতানাথজেঠু উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখ গম্ভীর, "মনে রাখিস, ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে না। অহিংসার যুগ অনেককাল আগে শেষ হয়েছে।"

সুদীপও উঠে দাঁড়ালো, "আর, আমি ভাবছি সীতানাথজেঠু, ইতিহাসের পথে, অহিংসার পদক্ষেপ সবে মাত্র ঘটতে শুরু করেছে। হিংসা আজ জীর্ণ দুর্বলের ভাঙা পথের দিগন্তে চলেছে। তার জয় নেই।"

সীতানাথ ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালেন। গঙ্গার পশ্চিম আকাশে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। তার রক্তাভা তাঁর চিন্তিত মুখে। সুদীপও সীতানাথের সঙ্গে বাইরে এলো। সীতানাথ পুব দিকে ঘুরে, রাস্তাব সামনে এগিয়ে চললেন।

"সীতানাথজেঠু, একেবারে ত্যাগ করে যাচ্ছেন না তো?" সুদীপ হাসলো।

সীতানাথ দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে হাসলেন, "এব পরে হয়তো তুই আমার মতো একজন কমিউনিস্টকে, সেই আগের কালের মতো, দেশকে আবার মা বলে ডাকতেও বলবি।"

"তাও না হয় বললেনই।" সুদীপ সীতানাথের গায়ের কাছে এগিয়ে গেল, "এতে আপনাব বিজ্ঞান চেতনা তো অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে না। আপনি তো কোনো ঐশী প্রেমের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন না। এ তো দেশপ্রেমের কথা। আপনি তো মূর্তিপূজা করতে যাচ্ছেন না।"

সীতানাথ দাঁড়ালেন। সুদীপের মুখের দিকে তাকালেন। মুখে তাঁর হাসি! চোখে অনুসন্ধিৎসা! গলার গম্ভীর স্বরে প্রচ্ছন্ন আবেগ, "আমার জ্ঞানের মধ্যে যদি তুই গ্রাহ্য হোস, তবে আবার তোর কাছে আসবো।"

সুদীপ হেসে ঘাড় কাত করলো। সীতানাথ এগিয়ে গেলেন। হেমন্তের শুকনো পাতা ঝরছে। পশ্চিমের আকাশ ক্রমে অধিক লাল হচ্ছে। গঙ্গার আসন্ন সন্ধ্যাস্রোতে রক্তাভা ছড়িয়ে পড়ছে। সুদীপ ঘরে ফিরে এলো। শুকনো ঝরা পাতা ওব পায়ের নিচে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে।